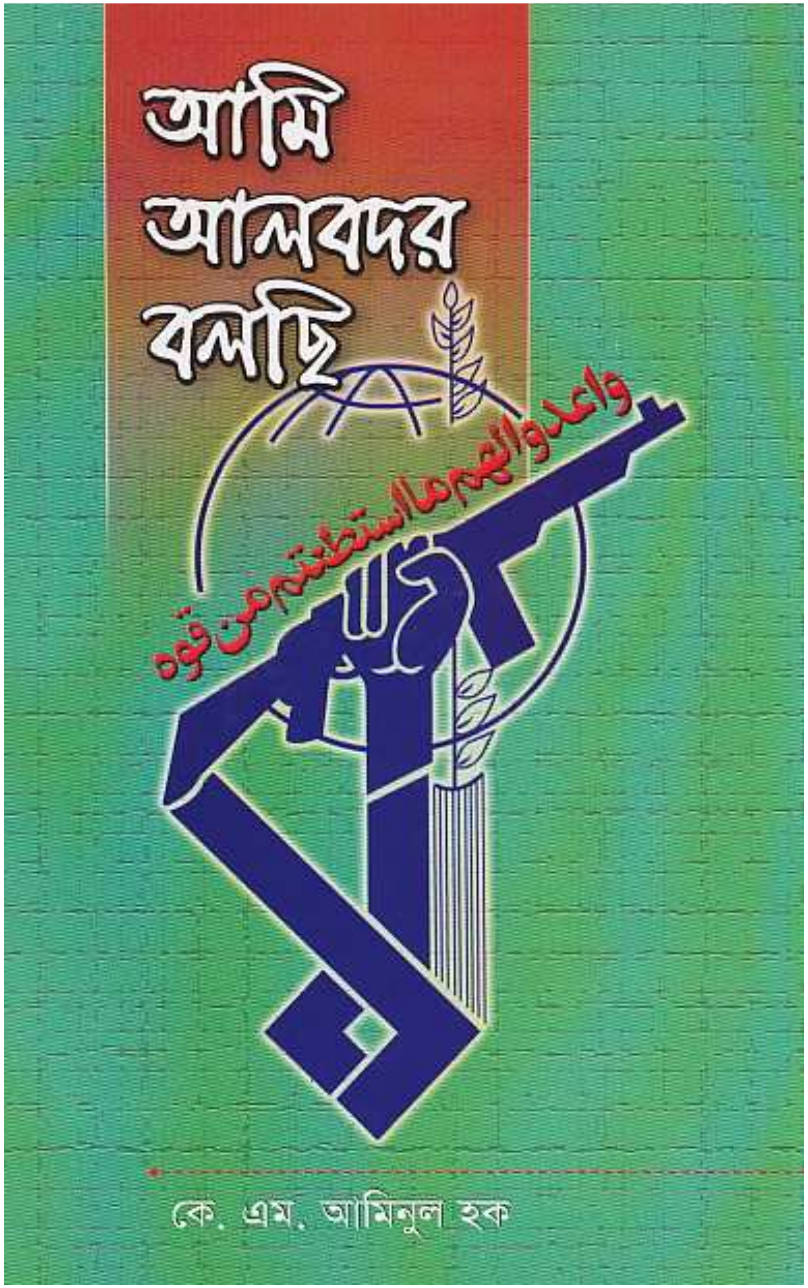

প্রকাশক

কে এম আমিনুল হক

সাবিয়ানগর, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ

সর্বস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ১৯৮৮

দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণ: ১৫ আগস্ট ২০০৮

AMI AL-BADAR BOLCHHI

Written and Published by K M Aminul Hoque

Sabianagar, Austagram, Kishorganj

3rd Edition: 15 August 2008

31 Shraban 1415 BS

eBook Published by

www.storyofbangladesh.com

৭৮৬

“তোমাদের কি হলো যে, তোমরা সংগ্রাম করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর- নারী ও শিশুদের জন্য? যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ যার অধিবাসী জালিম, তা হতে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের সহায় করো।”

(সূরা নিসা : ৭৫)

আওলাদে রাসূল (সাঃ)

শহীদ সাইয়েদ মাহমুদ মাস্তাফা আল মাদানী (রঃ)

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ পার্লামেন্টারিয়ান

ইসলামের অন্যতম দিশারী

শহীদ মৌলভী ফরিদ আহমদ

ডক্টর হাসান- উজ্জ- জামান (সাবেক অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (সাবেক ভিসি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি)

আরব বিশ্বের অবিসংবাদিত হিজবুল্লাহ নেতা বিপ্লবী বীর

হাসান নাসরুল্লাহ এবং চেচনিয়া ফিলিস্তিন ইরাক আফগানিস্তান

ফিলিপিন রহিঙ্গা মুসলমান ও কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী শহীদ এবং ৭১-এর শহীদ মুহাজির ও অগণিত শহীদানের উদ্দেশ্যে

সূচী

ভূমিকা 1
এক 5
দুই 29
তিন 53
চার 64
পাঁচ 94
ছয় 103
সাত 117
আট 132
নয় 160
পরিশিষ্ট- ১ 177
ঐতিহাসিক পটভূমি 177
একাত্তরের ভারতীয় আগ্রাসন কেন? 179
উপমহাদেশ প্রসঙ্গ 185
পলাশী বিপর্যয়ের পশ্চাতে 187
পলাশী নাটকের গ্রীণরুমে 192
ইংরেজদের সাথে বিরোধের সূচনা 195
পলাশীর পরে 202
শতাব্দীকালের প্রতিরোধ যুদ্ধ অতঃপর হতাশা 203
কোম্পানীর রাজস্ব নীতি 207
মহাজনদের অত্যাচার 208

নীলকরদের অত্যাচার 208
লা'খেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 209
কেড়ে নেয়া হল মুসলমানদের মুখের ভাষা 218
শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে দেয়া হল 219
বৃটিশ ও বর্ণ হিন্দুদের উদ্যোগে ধ্বংস হল বাংলার শিল্প 220
বঙ্গ ভঙ্গ ও মুসলমানদের নব চেতনার উন্মেষ 221
আর এক অশনি সংকেত 223
পাকিস্তান প্রস্তাব ও মুসমানদের নবযাত্রা 226
বাংলা খণ্ডিত হল বর্ণ হিন্দু ষড়যন্ত্রে 228
পাকিস্তান দাবীর প্রেক্ষিতে নেতৃবৃন্দ 229
সম্ভাবনাহীন ভুখণ্ড নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু 230
হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা 230
কেথ কেলার্ডের মন্তব্য 231
বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 231
পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ভারতীয় উদ্যোগ 235
প্রাপ্য সামরিক সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত করা হল 235
অর্থ নগদ ৫৫ কোটি টাকার বঞ্চনা 236
দিল্লীর আগ্রাসন পরিকল্পনা 237
হায়দারাবাদ দখল 238
কাশ্মীর দখল 238
ভাগ আন্দোলনের অন্তরালে 239
পূর্ব পাকিস্তান দখলের উদ্যোগ 243
পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার অগ্রগতি 246

বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ 250
ভারতের লাল সংকেত 257
পরিশিষ্ট- ২ 268
জীবনে যা দেখলাম 268
পরিশিষ্ট- ৩ 273
আমার দেশ, আমার স্বাধীনতা 273
পরিশিষ্ট- ৪ 281
কিশোরগঞ্জ জেলা ইতিহাস প্রণয়ণ কমিটির দৃষ্টিতে আমি আলবদর বলছি . 281
পরিশিষ্ট- ৫ 286
ইস্প্যাক্ট ইন্টারন্যাশন- এর (লন্ডন) দৃষ্টিতে 286
ইকবাল ও জিন্নাহ এবং 'আমি আলবদর বলছি' এর মূল্যায়ন 286
পরিশিষ্ট- ৬ 289
মন্তব্যবিহীন উদ্ধৃতি 289
বিজয় হল ছিনতাই 291
স্বাধীনতার প্রশ্ন প্রভাতে ভারতের বেপরোয়া লুণ্ঠন 292
আত্মঘাতী পদক্ষেপ 293
চোরাচালানীরা সংঘবদ্ধ 294
সৌখিন দেশপ্রেমিকদের অর্থনৈতিক শোষণ 294
বাংলাদেশ নয় পাটের রাজা হল ভারত 295
৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার 296
সমকালীন প্রতিক্রিয়া 297
ভারতে জাল নোট ছেপে অর্থনীতি ধ্বংসের চক্রান্ত 299
সেনাবাহিনী ধ্বংসের ষড়যন্ত্র 299

পত্র- পত্রিকার প্রতিক্রিয়া 300
ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের স্বীকারোক্তি 303
বিদেশী পত্র- পত্রিকায় বাংলাদেশের চিত্র 306
গণ জিজ্ঞাসা 309
পূর্ব পাকিস্তানের বিয়োগান্তক পরিণতি 311
পরিশিষ্ট-৭: 320
পরিশিষ্ট- **৮**: 322
পরিশিষ্ট- **৯** 331
শেখ মুজিব ও মীরজাফরের চুক্তির সাদৃশ্য 331
মুজিব- ইন্দিরার গোপন চুক্তি 331
মীর জাফরের চুক্তি 333
পল্টন ময়দানে কাদের সিদ্দিকীর তাণ্ডব 337
আওয়ামী বাকশালী দুঃশাসনের খতিয়ান 341
পরিশিষ্ট- ১০ 344
শেখ মুজিবুর রহমান 344
(ইন্টারভিউ উইথ হিস্টরী ওরিয়ানী ফালাচি) 344

ভূমিকা

আমি আলবদর ছিলাম। একাত্তরের সিদ্ধান্ত আমার নিজস্ব। আমার বিবেকের সাথে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছিলাম। কোন দল কোন গোষ্ঠী অথবা কোন ব্যক্তি এ সিদ্ধান্ত আমার ওপর চাপিয়ে দেয়নি। আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে অথবা কোন কিছুতে প্রলুব্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম একথা সত্য নয়। বন্দুকের নলের মুখে এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি তাও নয়।

২শ' বছরের গোলামীর ইতিহাস, সমসাময়িক হিন্দু চক্রান্ত, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের অতীত কার্যকলাপ, তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের দুরভিসন্ধি সব মিলে ২৫শে মার্চের পর আমার বিবেকে একটা ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে। আমার তারুণ্যকে পরিস্থিতির সুলভ শিকারে পরিণত হতে মন সায় দেয়নি। বার বার মনকে প্রশ্ন করেছি: এদেশে ইট কাঠ দালানগুলো ও অন্যান্য জড় পদার্থের মত আমি নীরব দর্শক হয়ে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকব? এই আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রের শেষ কোথায়? যে হিন্দুস্তান তার নিজের দেশে হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে মুসলমানদের নিধন করছে, সেই ভারত কী স্বার্থে পূর্ব-পাকিস্তানের আট কোটি মুসলমানদের জন্য দরদে উচ্ছসিত হয়ে উঠল?

আওয়ামী লীগের তৎকালীন ধ্বংসাত্মক তৎপরতা ৫৪ হাজার বর্গমাইল একটি ভূখণ্ডকে সেই দেশের মানুষকে দিয়ে পদানত করার ভারতীয় প্রয়াস বলে আমার ধারণা হল। মনে হল এদেশের ৮ কোটি মুসলমানকে দিল্লীর আজ্ঞাবহ সেবাদাসে পরিণত করতে চায় আওয়ামী লীগ। ইসলামী জজবাতের ঘুমন্ত সত্তা আমার মধ্যে জেগে উঠল। আমি সবকিছু জেনে শুনে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার পিতা অথবা পিতামহদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছেচল্লিশের গণরায়ের সপক্ষে হাতিয়ার তুলে নিলাম। সক্রিয় অংশ নিলাম প্রতিরোধ লড়াই-এ। তারপর রুশ-ভারত অক্ষশক্তির সব ষড়যন্ত্রের শেষ পরিণতি হল ১৬ই ডিসেম্বর। চূড়ান্ত বিপর্যয় হল। বিচ্ছিন্ন হল দেশ। এক ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তির গণজোয়ারকে বালির বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি, পারিনি। দেশের প্রত্যেকটি জনপদ রাজপথ গ্রাম আর গঞ্জে দেশপ্রেমিক মানুষগুলো লাঞ্ছিত রক্তাক্ত হল। মীরমদনরা নিক্ষিপ্ত হল মীরজাফরের কারাগারে। আমিও কারা প্রকোষ্ঠে অন্তরীণ হলাম। আমার ৪০ বছর কারাদণ্ড হল। আমি দেখেছি বিচারক নিজেই ছিলেন আমার চেয়ে অসহায়।

এরপর পদ্মা মেঘনা যমুনায় অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। মুজিবের প্রতিশ্রুত ৩ বছরও পেরিয়ে গেল। ভয়ঙ্কর হতাশা, নৈরাজ্য, অর্থনৈতিক সংকট ঘিরে বসল গোটা জাতিকে। গলাবাজি আর সন্ত্রাস দিয়ে বিবেকবান প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা অব্যাহত থাকল। কিন্তু তবু মুজিব ধুমায়িত গণ-অসন্তোষকে ঢাকতে ব্যর্থ হল। পনের আগস্ট সূর্য ওঠার আগেই সুপ্তোত্থিত মোহমুক্ত দেশপ্রেমিক সৈনিকদের গুলীতে মুজিবের বুক বিদীর্ণ হল। তার খুন আর লাশের ওপর পা দিয়েই সম্ভবত সেদিন এদেশে সূর্যোদয় হয়েছিল। বুক ভরা নিঃশ্বাস নিয়েছিল এদেশের কোটি কোটি মানুষ। সেদিন তার ঠ্যাঙারে বাহিনী লাল নীল বিচিত্র বাহিনী তার সমর্থক জালেম লুটেরার দল ভীরু শৃগালের মত লুকিয়ে ছিল অন্ধকার গহ্বরে। সেদিন বাঙালীর চোখে অশ্রু নয় উল্লাসের হাসি দেখেছিল পৃথিবী।

আমরা কারাগার থেকে জাতীয় জীবনের এই নাটকগুলো নীরব দর্শকের মত দেখলাম। বোবা শ্রোতার মত শুনে গেলাম অনেক কিছু। আমাদের কি করণীয় আছে? একাত্তরে আমাদের বিবেক আমাদের সত্তা সব শেষ হয়ে গেছে। আমাদের হাত আছে হাতিয়ার নেই তূন আছে, তীর নেই।

কারাগার ছিল একটি নাট্যমঞ্চ। দৃশ্যপট বদলের সাথে সাথে এই মঞ্চে আসতে শুরু করল নতুন নতুন মুখ। প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, দলনেতা, কর্মী ও অনেকেই। যারা এইমাত্র ক্ষমতাসীন ছিলেন তাদেরও ঠিকানা হল এই কারাগার। কালের সাক্ষী হয়ে আমরা সবকিছু দেখেছি। এই কারাগারে ডান, বাম, মধ্য সবপন্থী নেতা ও উপনেতাদের পেয়েছি তাদের অনেকের সাথে অন্তরঙ্গ আলাপ হয়েছে। স্মৃতি থেকে যতটুকু পেরেছি, আমার এই সাজান স্বরলিপিতে টেনে আনার চেষ্টা করেছি। এর বাইরেও রয়েছে অনেক কিছু। পরবর্তীতে তুলে ধরার আশা রাখি।

অনেক দেরী হয়ে গেছে। কারাগার থেকে বেরিয়ে আমার সামনে নি-িদ্র অন্ধকার ছাড়া অবশিষ্ট কিছু ছিল না। জীবন ও জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। স্মৃতি রোমন্থনের সময় কোথায়? কারাগারের শেষ দিনগুলোতে মোহাম্মদ ফারুক, আব্দুল মালেক ও এ কে. এম শফিউল্লাহ ভাই ডায়েরী সরবরাহ করে স্মৃতিগুলো লিখে রাখার জন্য। নৈরাশ্য অথবা আলস্য, যে কারণেই হোক না কেন সেগুলো ঠিকমত লিখে রাখা হয়নি। তবে স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে এখনও অনেক কিছু। এর কিছুটা এই বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

অনেক দেরী হলেও বইটা প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। অবিশ্য এর জন্য বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশও অপরিহার্য ছিল। বইটিতে আমার মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। আমি লুকোচুরি রাখঢাক অথবা ডিপ্লোম্যাসির আশ্রয় নিইনি।

কাউকে ক্ষুণœ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল আমার বিশ্বাসকে তুলে ধরেছি। আমার বিশ্বাস অহিপ্রাপ্ত অথবা সমালোচনার উর্ধে এমনটি নয়। নিয়মতান্ত্রিক সমালোচনাকে আমি স্বাগত জানাব।

আমার অতীত জেনে শুনে যে মহিলা আমাকে বিয়ে করেছেন সেই আনোয়ারা খন্দকার বেবীর প্রেরণায় বইটা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। পত্র-পত্রিকার পাতায় পাতায় যেভাবে আলবদরকে বর্বরতার প্রতীক হিসেবে দাঁড় করান হয়েছে, এতে ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী নেয়া একজন মহিলার আমার প্রতি বিরূপ ছাড়া অনুরক্ত হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এমন কোন প্রাচুর্যের জৌলুসও আমার ছিল না। আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের একতরফা বিশ্রী প্রচারণায় প্লাবিত সমাজের একজন হয়েও বেবী আমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। শুরু থেকে চাপ দিয়ে আসছে আমার অভিজ্ঞতায় নিরপেক্ষ কিছু লেখার জন্য।

তার ভাষায় 'ইতিহাস তার নিজস্ব গতিধারায় এগিয়ে চলে। একদিন নিরপেক্ষ নির্ভেজাল ইতিহাস লেখা হবে। সেই আগামী দিনের ঐতিহাসিকদের জন্য কিছু তথ্য রেখে যেতে পার।' বেবীর সাধ কতটুকু পূরণ করতে পেরেছি জানি না। তবে আমার বিক্ষিপ্ত কলমের আঁচড় আলোর মুখ দেখতে পেয়েছে তারই প্রেরণায় একথা বলতে দ্বিধা নেই।

বিভিন্ন জনের সাথে আমার বিভিন্ন সংলাপ আমি সঠিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমার এই লেখা কতখানি সুখপাঠ্য ও সমাদিত হবে সেটা আমার জানার কথা নয়। বিজ্ঞ পাঠকদের ওপর আমার বইটির সঠিক মূল্যায়নের ভার দিচ্ছি। বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অনেক তাগিদ পেয়েছি। যারা আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও বিরল সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে অধ্যাপক মাহাতাব উদ্দিন কিশোরগঞ্জ, মীর কাসেম আলী মিন্টু ভাই, বিশিষ্ট ব্যাংকার সুসাহিত্যিক কলামিষ্ট গবেষক আব্দুল মান্নান ভাই, মাসিক নতুন সফর সম্পাদক সাবেক ছাত্র নেতা মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন ভাই কারাগারে থাকা অবস্থায় আমাকে কিছু লেখার জন্য বলতেন তাদের সেই প্রেরণাও বইটি লেখার ব্যাপারে শক্তি যুগিয়েছে। বিশেষজ্ঞ ডাঃ আফসার সিদ্দিকী, সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ হাবিবুর রহমান, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মুস্তাক আহম্মদ, মোঃ কামরুল ইসলাম, মোঃ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার, মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, মোঃ আব্দুল কাহহার, এস ডাব্লিউ ভি ফরিদা ইয়াসমীন, সাবেক ছাত্র নেতা ইমতিয়াজ আহম্মদ খান, সাবেক কেন্দ্রিয় ছাত্র নেতা জাকির হোসেন (মুকুল), আক্তার উজ্জ-জামান, মোঃ এনামুল হক, মুহাম্মদ সামসুদ্দিন,

এস এম দুররুল হুদা, ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল আব্দুস সামাদ সাহেব প্রমুখের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণ জনিত কিছু ভুল-ত্রুটি রয়ে গেল। আশা করি পাঠকগণ সেটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তবু সবরকম ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

১৫ আগস্ট, ২০০৮
আমিনুল হক
সাবিয়া নগর, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ

এক

একাত্তরের ১৭ ডিসেম্বর। কিশোরগঞ্জে মুক্তিবাহিনী ও হিন্দুস্তানী সেনার সম্মিলিত আক্রমণের মুখে প্রচণ্ড প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজাকার, আলবদর, মুজাহিদ ও পুলিশের মৃত্যুকামী সদস্যরা। ১৬ ডিসেম্বরে হিন্দুস্তানের হাতে পাকিস্তানী বাহিনী অস্ত্র সমর্পনের পর যে বিজয় সূচিত হয়েছে, কিশোরগঞ্জের প্রতিরোধ যেন তার কলঙ্কের তিলক। অসংখ্য শেল প্রতিনিয়ত এসে পড়ছে শহরের বিভিন্ন অবস্থানে। দালানগুলোর ইট খসে খসে পড়ছে। হতাহতের খবরও আসছে বিভিন্ন দিক থেকে। গুলী, অজস্র গুলী, বৃষ্টির মত গুলী, তবু কারো দুঃসাহসে চিড় ধরেছে বলে মনে হয় না। প্রতিরোধের প্রচণ্ড নেশায় উন্মত্ত সকলে। কিশোরগঞ্জের এই প্রতিরোধকে বিশাল সমুদ্রের ছোট একটি ঢেউ অথবা বুদ বুদ কোনটি বলব সেটা আমার জানা নেই। ঝঞ্ঝা অথবা ঝড়ো হাওয়ার উন্মত্ততা শেষ হয়েছে নিয়াজীর আত্মসমর্পণের পরেই, অর্থাৎ আগের দিন। কিন্তু কিশোরগঞ্জের ঝড় তখনও। তখনও প্রচণ্ড লড়াই। আমি জানি এর শেষ কোথায়। রসদের পরিমাণও আমার জানা। সরবরাহের সম্ভাবনা আর কোন দিনই আমাদের সামনে আসবে না। আমার জানবাজ সহকর্মীদের সামনে পশ্চাৎ অপসারণ অথবা আত্মসমর্পণের কথা বলবার দুঃসাহস আমার নেই। ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা। এতগুলো জীবনের ঝুঁকি! অন্তহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে আমার আপোষহীন সিপাহীরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। আমি উল্কার মত ছুটে বেড়াচ্ছি এক বাংকার থেকে আর এক বাংকারে, এক ট্রেঞ্চ থেকে আর এক ট্রেঞ্চে, এক অবস্থান থেকে আর এক অবস্থানে। সবার একই ভাষা, সেই ১৪শ' বছর আগের কারবালার ভাষা, যে ভাষায় হযরত হোসেন (রাঃ) প্রতি তাঁর সহগামীরা আনুগত্য ব্যক্ত করেছিলেন। উৎকণ্ঠা কারো নেই। সবার চোখে আর চাওনিতে অব্যাহত লড়াইয়ের দৃপ্ত শপথ ঠিকরে বেরুচ্ছে। আমার মন থেকে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। আমার সহকর্মীদের মৃত্যুকে হাসি মুখে বরণ করার ইচ্ছার মধ্যে আমি হারিয়ে যাচ্ছি। ১৪শ' বছর পর কারবালার নুতন দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আমার মনকে আমি তৈরি করে ফেলেছি।

বেলা গড়িয়ে এলো। সূর্যটা অস্তাচলে। গোধূলির রঙ আমি দেখছি। এ রঙে পৃথিবী এমন করে কোনদিন দেখেছি বলে মনে হয় না। আকাশটা লালে লাল। সূর্যটার বুক বিদীর্ণ হয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আহত সূর্যের গোঙ্গানি যেন রণাঙ্গনে বিমূর্ত। মনে হয় রক্তাক্ত পথ দিয়েই সূর্যোদয় ঘটে। রক্ত-পিছল পথ দিয়ে সূর্যটা অস্তাচলে ঢলে পড়ে।

দুনিয়ার মানচিত্রে পাকিস্তানের অভ্যুদয়, কত অজস্র জীবনের বিনিময়ে। কত খুন আর আগুনের পথ অতিক্রম করে মুসলমানরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২শ' বছরের গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়েছে। মানচিত্রের একটা দিক থেকে পাকিস্তানের চিহ্ন মুছে ফেলতে তেমনি রক্ত ঝরবে এটাই স্বাভাবিক।

মসজিদ থেকে আযান ভেসে আসল। "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ।" আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আমার মন-মানসিকতা আবার যেন শানিত হয়ে উঠল। না, কোন শক্তির কাছে নয় আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করাই আমাদের মঙ্গল। পানি নিয়ে ওযু করতে বসলাম। অন্তহীন ভাবনা। এ জাতির অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করে আমার দু'চোখ ফেটে পানি গড়িয়ে এলো। অশ্র" আর ওযুর পানিতে একাকার হয়ে গেল আমার মুখমণ্ডল। আল্লাহ্র দরবারে হাত তুললাম- 'ইয়া আল্লাহ্, ইয়া মাবুদ, ইয়া যাজা ও সাজার মালিক, সমস্ত জাতিকে কতিপয় উচ্চাভিলাষী রাজনীতিক অন্ধ করে রেখেছে। আমার এ বেগুনাহ কাওমকে রাজনীতিকদের গুনাগারীর সাজা দিও না। তোমার ঐশী আযাব থেকে এদের আশ্রয় দাও।

প্রাণ ভরে নামাজ পড়লাম। তখন প্রত্যেকটি নামাজই মনে হত আমার জন্য শেষ নামাজ। মাগরিবের নামাজের বেশ কিছুক্ষণ পর নেজামে ইসলাম পার্টির প্রধান সর্বজন শ্রদ্ধেয় মওলানা আতাহার আলী সাহেবের টেলিফোন পেলাম। তিনি তার আল জামেয়াতুল এমদাদিয়া থেকে আমাকে তলব করেছেন। আমি মোটেও বিলম্ব না করে তার কাছে ছুটে গেলাম। পৌঁছে দেখলাম মহকুমা অফিসার জনাব আবদুর রহিম, মহকুমা পুলিশ অফিসার ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বসে রয়েছেন। আওয়ামী লীগের মহকুমা সেক্রেটারী অধ্যাপক জিয়াউদ্দিনকে দেখেই আমি ভয়ঙ্কর মানসিক বিপর্যয় অনুভব করলাম। মওলানা আতাহার আলী সাহেব এই অঞ্চলের আধ্যাত্মিক নেতা, তিনি আমাদের অনেকের আপোষহীন প্রেরণার উৎস। তাঁর শত শত অনুগামী এই প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয় অংশীদার। যাই হোক, আমি সালাম দিয়ে তার কোন নির্দেশ, বক্তব্য অথবা পরামর্শের প্রত্যাশা করছিলাম। আমার যেন মনে হচ্ছিল, তিনি কোন এক আপোষ ফর্মূলায় উপস্থিত হয়েছেন। আমি দৃষ্টি অবনত করে বসে থাকলাম বেশ কিছুক্ষণ। মাথা উঁচু করে মাঝে মাঝে দেখছিলাম, মওলানা অপলকে তাকিয়ে রয়েছেন আমার দিকে। তাঁর অশ্র"সজল সকরুণ চাওনি আমাকে বিব্রত করছিল ভয়ঙ্করভাবে। নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, "আমিন, কুদরতের ফায়সালা আমাদের সপক্ষে নেই।

৫৪ হাজার বর্গমাইলের পাঁচ-দশ বর্গমাইল প্রতিরোধের প্রাচীর দিয়ে বিভ্রান্তির জোয়ার আটকাতে পারবে না। আওয়ামী লীগ নেতারা আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, আমি মনে করি রক্তক্ষরণের চাইতে অস্ত্রসংবরণই উত্তম। হক-বাতিলের ফায়সালা আগামী দিনগুলোর জন্য রেখে দাও।" তাঁর এই বক্তব্যে অনেক বেদনা, অনেক অন্তর্জ্বালা আমি চোখ বন্ধ করে দেখতে পেলাম। মওলানা আতাহার আলী সাহেবের নির্দেশকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস আমার নেই। কেননা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তিনি আমাকে ছায়া বিস্তার করে রেখেছেন। তার সহযোগিতায় এবং সৎ পরামর্শে সমস্ত অন্যায় অপকর্মের ভাগাড়গুলোকে আমি নির্মূল করতে পেরেছি। আমার এও বিশ্বাস ছিল যে তিনি কোন অন্যায় অযৌক্তিক পরামর্শ দিতে পারেন না। এ ছাড়াও আমাদের এই বয়সটা আবেগ দ্বারা তাড়িত, আর তিনি এর বাইরে থেকে পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে দেখছেন। আমি তার নির্দেশ মেনে নিলাম সহজভাবে। আমি মোটেও দেরী না করে মওলানা আতাহার আলী সাহেবকে তাঁর নির্দেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম। দেখলাম অধ্যাপক জিয়াউদ্দিন প্রচণ্ড আক্রোশে আমার দিকে চেয়ে আছে। ফিরে এলাম আমার ডেরায়।

স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন অবস্থান থেকে সমস্ত গ্রুপের কমান্ডারকে ডেকে পাঠালাম। পরামর্শে বসলাম। অনেকেই শেষ অবধি যুদ্ধ চালিযে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করল। কিন্তু এর শেষ কোথায়? আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম, রক্তাক্ত পরিণতি ছাড়া এর আশাব্যঞ্জক কোন দিকই অবশিষ্ট নেই। আরও বললাম, মওলানা আতাহার আলী সাহেব যুদ্ধ-বিরতির সপক্ষে সুপারিশ করাতে তাঁর অনুসারী মুজাহিদরা রণেভঙ্গ দিবে। এছাড়াও গুলীর মওজুদ নিঃশেষের পথে। এ নিয়ে হয়তো বা কয়েক ঘন্টা অথবা কয়েকদিন লড়তে সক্ষম হব। কিন্তু তারপর? তারপরও যদি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে কোন বাহিনীর এগিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে যে কোন ঝুঁকি নেয়া সঙ্গত মনে করতাম। বিভিন্ন আলোচনা পর্যালোচনা করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, সময় ও সুযোগমত যে যখন পারে আমার জানবাজ যোদ্ধারা রণাঙ্গন পরিত্যাগ করবে। আমাদের একটা সুবিধা ছিল যা পশ্চিম পাকিস্তানীদের ছিল না। তা হল, গণ আবরণে গা ঢাকা দেওয়ার সুবিধা। যেহেতু আমাদের ভাষা, বর্ণ, পোশাক-আশাক এবং চলাফেরার ব্যাপারে প্রতিপক্ষদের সাথে কোন ব্যবধানই ছিল না। সবাই মোটামুটি যুদ্ধকে এড়িয়ে নিজ নিজ দায়িত্বে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া সত্ত্বেও রাত ১০টা নাগাদ মওলানা আবদুর জব্বার সাহেবের ছেলে ইমদাদুল হক এবং শহীদুল্লাহ আমাকে না জানিয়ে মুজাহিদ, রাজাকার, আলবদর ও শহরের অতি

উৎসাহী মানুষদের নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সপক্ষে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের করে। দেখলাম, ইসলামের সৈনিকদের আত্মোৎসর্গ করার উদ্দীপনা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আমার সহকর্মী অসংখ্য তরুণ-প্রাণের করুণ পরিণতির কথা ভেবে আমার বুক চাপড়াতে ইচ্ছে করছিল। ক্রমশ আমরা অসহায়ত্বের দোর গোড়ায় এগিয়ে চললাম। আমাদের দুর্জয় বন্দুকের নল ধীরে ধীরে বোবা হয়ে গেল। ১৮ তারিখ সকালে ইমদাদুল হক এবং শহীদুল্লাহকে মুক্তিফৌজরা নির্মমভাবে হত্যা করল। অন্যদিকে রাত্রেই আর এক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম, রাজাকার প্রধান মওলানা মহিউদ্দিন আযমী সম্ভবত মুক্তিবাহিনীর সহানুভূতি পাওয়ার প্রত্যাশায় এক অতি উৎসাহী ভূমিকা নিলেন।

আল জামেয়াতুল এমদাদিয়া থেকে মাইক নিয়ে মওলানা আযমী সর্বত্র ঘোষণা দিলেন যে, আগামী কাল মুক্তিফৌজ অমুক অমুক সড়ক দিয়ে প্রবেশ করবে। আমাদের ভাইয়েরা তাদের প্রবেশ পথে কোন বাধার সৃষ্টি না করে অভিনন্দন জানাবে। এবং শহীদি মসজিদের সম্মুখভাগে আমাদের বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করবে। চুক্তিমত কাউকে গ্রেফতার করা হবে না। এমন কি কোন প্রতিশোধ নেয়া হবে না। মওলানা আযমীর এই ঘোষণাও ছিল আমার নির্দেশের বাইরে। মওলানা আযমী হয়তো পরিস্থিতির চাপে বিদিশা হয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্র“তিকে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মক্কা বিজয়ের প্রতিশ্র“তির মত ভেবে বসেছিলেন। কিন্তু এরও পরিণতি শুভ হল না। শহরে ঢুকে মুক্তিফৌজদের প্রথম গুলী যার বুক বিদীর্ণ করল, তিনিই হলেন সেই মহিউদ্দিন আযমী। এ ছাড়াও মওলানা হেদায়েত উল্লাহসহ আরো পাঁচ-ছয় জনের শাহাদতের খবর আমার কাছে এসে পৌঁছল।

ওদিকে রাত্রে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্র“তির প্রেক্ষিতে একটি খসড়া চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হয়। এতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মহকুমা আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ মাযহারুল ইসলাম এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমি স্বাক্ষর দান করি। আমাদের প্রতি ডাক্তার সাহেবের ছিল অন্তহীন সহানুভূতি।

আত্মীয় পরিজন, জামায়াত নেতৃবৃন্দ ও আরো অনেকেই আমার সাথে সাক্ষাৎ করে নিশ্চিত মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। তারা বলেন নিরাপদ আশ্রয়ে আমাকে সরে যাওয়ার জন্য। জাতীয় বৃহৎ স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমার জীবন রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার উল্লেখ করলেন। এ সত্ত্বেও আমার মন সাড়া দিল না মোটেও। কেননা আমার

শত শত জানবাজ সহকর্মীদের অনিশ্চিতের মধ্যে ফেলে যেতে বিবেক সায় দিল না। আমি আমার নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও রয়ে গেলাম।

সকালে এলাকার ৩০জন নেতৃবৃন্দসহ ডাক্তার মাযহার সাহেবের বাসায় সমবেত হলাম। তার চোখে মুখে চিন্তা আর উদ্বেগের ছায়া। কিন্তু ম্লান হেসে বারবার তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন। তার চাওনিতে দুঃচিন্তার স্পষ্টতা দেখে মনে হল সম্ভবত তিনি মুক্তিফৌজদের ওপর ভরসা করতে পারছেন না। কেননা তিনি শহর ঘুরে দেখে এসেছেন, মুক্তিফৌজরা শত শত মানুষকে শহরে ঢুকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করেছে। মনে হল তিনি ভাবছেন, তাকে উপেক্ষা করে তার আশ্রিত ব্যক্তিদের উপর হয়তো বা মুক্তিফৌজ চড়াও হতে পারে। আমি বললাম, "ডাক্তার সাহেব, আমাদের চাইতে সম্ভবত আপনি নিজেই অসহায়ত্ব অনুভব করছেন বেশী। আপনার অনেক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার প্রতিশ্র"তি রাখতে পারবেন না। এর চেয়ে মুক্তিফৌজ চড়াও হবার আগে আপনি আমাদেরকে হিন্দুস্তানী বাহিনীর কাছে সমর্পণ করে দিন।" কিংকর্তব্যবিমূঢ় ডাক্তার সাহেব আমার কথা থেকে যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। আমার কথাগুলো তার পছন্দ হল। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি ভারতীয় কর্ম-কর্তাদের নিকট টেলিফোন করলে সেনাবাহিনী এসে আমাদেরকে তাদের হেফাজতে নিলো। তখন সম্ভবত বেলা ২টা হবে। হিন্দুস্তানী সৈনিকরা আমাদেরকে নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে তাদের হেফাজতখানার দিকে নিয়ে চললেন। পথে মুক্তিবাহিনীর একটি দলের সাথে দেখা হল। তারা সম্মানিত নেতা মওলানা আতাহার আলীর পায়ে ধরে সালাম করলো, এদের অন্যতম ছিলেন ক্যাপটেন মতিউর রহমান। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত মেজর। যাই হোক, ইতোমধ্যে আমরা সরকারী হাইস্কুলে এসে পৌঁছলাম। এখানকার কমনরুমে সেনাবাহিনীর হেফাজতে আমাদের রাখা হল।

আছরের সময় ন্যাপের একটা দলকে আমাদের অবস্থানের দিকে আসতে দেখলাম। এরা প্রত্যেকেই চাদর গায়ে দেয়া। কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল, "আলবদর কমাণ্ডার কোথায়?" আমি বেরিয়ে এলাম। আমার বাহিনীর গ্র"প কমাণ্ডার জাকির ভাইকে ডেকে বাইরে আনা হল। প্রত্যেকের চাদরের মধ্য থেকে লোহার রড বেরিয়ে এলো। শুরু হল লোহার রড দিয়ে নির্মম নির্যাতন। জাকির ভাইয়ের মাথা ফেটে দর দর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। রক্তস্নাত হয়ে উঠলেন জাকির ভাই। আমার উপর চলতে লাগল একই নির্যাতন। একজন আঘাতের পর আঘাত করে ক্লান্ত হলে আর একজন শুরু করে। এভাবে ক্রমাগত নির্যাতন আমার শরীর নেতিয়ে পড়ল। ডান হাতে পেলাম প্রচণ্ড আঘাত। জাকির ভাইয়ের মত আমার মাথা হয়তো ক্ষত-বিক্ষত

হবে এমন আশঙ্কা করে আমি বাম হাতে লোহার রড চেপে ধরলাম। তিন চার জনে টানা-হেঁচড়া করেও ওরা আমার হাত থেকে রড ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হল না। ইতোমধ্যে হিন্দুস্তানী সেন্ট্রী এসে পড়ায় আমি নিষ্কৃতি পেলাম। ওদিকে আর এক দল হলের ভেতর প্রবেশ করে মওলানা আতাহার আলী সাহেবের মাথা ফাটিয়ে দিল। তিনিও নিমিষে রক্তস্নাত হয়ে উঠলেন। আর একজন নির্যাতন চালিয়ে এডভোকেট বদরুজ্জামানের হাত ভেঙ্গে দিল। মুসলিম লীগ নেতা এমপি ও পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব আবদুল আওয়াল সাহেবের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালানো হল। এতে তার ডান হাত ভেঙ্গে যায়। তার সুস্থ হতে অনেক দিন সময় নেয়। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ পৌরসভার চেয়্যারম্যান এবং জনপ্রিয় এমপি। সোলাইকার চেয়ারম্যান তারামিয়া ও তার বড় ভাই বাদশাহ মিয়ার ওপর নির্যাতন যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। উভয়েরই পুরুষাঙ্গ দড়ি দিয়ে বেঁধে সিলিং ফ্যানের সাথে সংযোগ করে সেটা পূর্ণ গতিতে চালিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে তাঁদের আর্তচিৎকার ও আহাজারিতে কারবালার ভয়াবহতা প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁদের প্রস্রাবের সাথে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। মোটের উপর আমরা সবাই সেইসব জাহেল বুজদীল ও কাপুরুষের খেলার সামগ্রীতে পরিণত হই।

রাত এগারটা। ন্যাপের নেতৃবৃন্দকে আমাদের অবস্থানের চারিদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা হান্নান মোল্লা আসগর ভাইয়ের কাছে এসে বলল, "যা করেছেন তার প্রায়শ্চিত্য আপনাদের পেতে হবে।" সম্ভবত হান্নান মোল্লা আসগর ভাইয়ের ক্লাসমেট বলে সে তার উপর নির্লজ্জ আক্রমণ চালাতে পারেনি।

অন্যদিকে মোমেনশাহী জেলা ন্যাপের সহ-সভাপতি কাজী আবদুল বারী ও তার সহকর্মীরা বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করে চিৎকার করে বলতে থাকে, "অষ্টগ্রামের আমিন ও দৌলত মওলানা কোথায়?" হান্নান মোল্লা আমাদের কক্ষ থেকে জবাব দিল 'না' এখানে নেই, এখানকার সকলেই শহরের।' সম্ভবত সে আমাদের চিনতো না। দৌলত মওলানা আমার কানে কানে বললেন- 'আমিন বলে ফেলি যে আমরা এখানে আছি। কাপুরুষের মত লুকিয়ে থাকতে মন চাচ্ছে না।' আমি তাঁকে নিষেধ করলাম। সবাই যেন নির্যাতন দেখে দেখে এবং মার খেয়ে খেয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কাজী বারীরা চলে গেল।

পরে জানতে পারি, অষ্ট্রগ্রামে জনসভা করে তারা জনগণকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। কাল্পনিক স্বর্গরাজ্যের প্রত্যাশায় মাতাল মানুষগুলোর কাছ থেকে আমাদেরকে প্রকাশ্য ফাঁসী দেয়ার সপক্ষে সম্মতি আদায় করেছে।

রাত ১১টার দিকে মওলানা আবদুল হালিম পাকুন্দিয়া ও ক্যাপটেন মতিউর রহমান এলেন। তাঁরা উভয়েই মওলানা আতহার আলী সাহেবকে সহানুভূতি জানালেন। মওলানা আবদুল হালিম সাহেব তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্ভবত মওলানাদের মধ্যে পাকুন্দিয়া সাহেবই ভারতীয় বাহিনীর সহযোগী হয়েছিলেন। কিন্তু কেন, তা আমার জানা নেই। তবে তাঁর প্রতি কারো অশ্রদ্ধাও দেখিনি।

ক্যাপটেন মতিউর রহমান আমার পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বললেন- "দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা সোচ্চার, সে জামায়াত কি করে ইয়াহিয়ার নিপীড়নের সহযোগী হতে পারল!' তাঁর ঐ বক্তব্য থেকে আমার মনে হল জামায়াতের অতীত কর্মকাণ্ডের ওপর ক্যাপটেন মতিউর রহমানের ধারণা স্বচ্ছ। অন্তত একটা ব্যক্তিকে আমি পেলাম, সীমাহীন রাজনৈতিক ধূম্রজালের মধ্যেও যার অন্তরে রয়েছে সচেতন বিবেকের এই ক্ষীণ স্পন্দন। আমি জানি, আজ নয়, সময়ের আবর্তে একদিন বিবেকের এই ক্ষীণ স্পন্দনই বেগবান হয়ে উঠবে। আমি কোন জবাব না দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকলাম। এরপর এলেন ঝউঙ খসরুজ্জামান। তার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৯৭০ সালে আমি যখন ভৈরব কলেজের ছাত্র এবং ভৈরব ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি, তখন ঝউঙ খসরুজ্জামান ভৈরব প্রেসক্লাবের উদ্বোধনকালে প্রধান অথিতির ভাষণ দিতে গিয়ে আলেম সমাজের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বলেন, পাকিস্তান আন্দোলন অথবা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে আলেম সমাজের কোন ভূমিকা ছিল না। শুধু তাই নয়, তিনি আলেম সমাজকে পরগাছা হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালান। আমি প্রেসক্লাবের সদস্য হিসেবে এর প্রতিবাদ জানাই। যাই হোক, তথাকথিত স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে জনাব খসরুজ্জামান কিশোরগঞ্জের ব্যাংকসমূহ লুট করে ভারত পলায়ন করেন।

তিনি আমার বন্দী কক্ষে প্রবেশ করে উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে বলেন- 'আমিন কোথায়?' আমি দাঁড়ালে তিনি বলেন, "দু'পয়সার ইসলামের জন্য জিহাদ করেছিলেন। এখন আমার হাতে পিস্তল থাকলে গুলী করতাম।" মওলানা আতহার আলী সাহেবের উদ্দেশ্যে বলেন- "শিয়ালের কান্না গেল কোথায়? শিয়ালের কান্নায় পাকিস্তান রক্ষা

হল না? ঘৃণা হয়, এদের মুখ দেখতে।" এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জনাব খসরুজ্জামান ছাত্র সংগঠন এনএসএফ-এর সাথে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মোজাফফর ন্যাপের সাথে জড়িত হন।

সেই একই রাত্রে মুক্তিফৌজ আমার ৫শ' টাকা জুতা মাফলার আর হাতঘড়িটা নিয়ে গেল। এছাড়াও যার কাছে যা ছিল সবই তারা জোর করে ছিনিয়ে নিল। সকালবেলা আমরা হিন্দুস্তানী ফৌজদের জানালে তারা সেই সব মুক্তিফৌজদের কাছ থেকে অপহৃত টাকা পয়সা ও জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেয়ার আশ্বাস দেয়। কিন্তু সেসব কোন দিনই আর ফিরে আসেনি। আমরা জানতাম কোন দিন ওসব আর ফিরে আসবে না। তথাকথিত আন্দোলনের শুরু থেকে দিনে দিনে আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে যে লুট করার মানসিকতার সৃষ্টি করা হয়েছে, এমন কোন যাদুর কাঠি নেই যা দিয়ে এ মানসিকতার আমূল পরিবর্তন সম্ভব। অবাঙালীদের সম্পদ লুট করার মধ্য দিয়ে কর্মীদের বিবেককে কেড়ে নেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তারা গ্রাম-গঞ্জের নিরীহ মানুষের সম্পদ লুট করে। লুট করে অগণিত কুমারী মেয়ের ইজ্জত। পক্ষান্তরে আমরা বিশেষ করে আলবদরদের কথা বলছি, সাধারণ কর্মীদেরকে কড়া দৃষ্টির মধ্যে রাখতাম। কোন দুর্বলতা কোন অভিযোগ কোনভাবে এসে পড়লে তড়িঘড়ি এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হত। এমনকি আমাদের চোখের সামনে কারো দ্বারা কোন অঘটন ঘটলে তার প্রতিকার করেছি আমরা নিজেরাই।

যাই হোক, একদিন ছাত্রলীগের ভিপি আফজাল জানিয়ে গেল, তার ভাষায় 'বঙ্গবন্ধু' ফিরে আসলে বিচার করা হবে। কাউকে আর মারা হবে না। তবে লড়াই করলেও আপনাদের ব্যাপারে কোন নোংরামীর দৃষ্টান্ত জানা নেই। অষ্ট্রগ্রামের ফিরোজ সাহেবও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করলেন।

আহতদের আর্তনাদ, দুঃসহ যন্ত্রণা এবং সার্বক্ষণিক মানসিক চাপের মধ্যে একে একে ৩টা দিন পেরিয়ে গেল। আমার মনে হত যেন আমরা ১৬ ডিসেম্বরে মরে গেছি। এখনকার নির্যাতনকে কবরের আযাব বলে আমার মনে হতে লাগল। দলের পর দল এসে আমাদের উত্যক্ত করতে লাগল। জয়বাংলা বলার জন্য চাপ দিতে লাগল। আমাদের কেউ চাপের মুখে সেই ঘৃণিত শ্লোগান উচ্চারণ করেছিল কি না আমার তা জানা নেই। তবে এ সংক্রান্ত একটি মর্মান্তিক ঘটনা আমাকে আজও পীড়া দেয়।

বন্দীদশার তৃতীয় রাত্রে, সম্ভবত ২১ ডিসেম্বরের রাত সেটি। মুক্তিফৌজের একটি দল এসে উপস্থিত হল। আমাদের বন্দী জীবনের সাথী একজন এ্যাডজুটেন্টকে ধরে

নিয়ে গেল আমাদের কাছ থেকে। যাবার সময় কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বিদায় নিলেন তিনি। তার সেই বিদায়ই যে শেষ বিদায় এমনটি ধারণা করেনি কেউ। পরে জানলাম জয় বাংলা বলার জন্য তাকে চাপ দেয়া হয়। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে ক্ষত বিক্ষত করা সত্ত্বেও জয় বাংলা উচ্চারণ করাতে ব্যর্থ হয় নির্মম মুক্তিফৌজেরা। পক্ষান্তরে প্রতিটি বেয়নেট চার্জের সাথে সাথে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদু রাসূল্লাহ (সাঃ) বলতে বলতে তিনি শাহাদাতের ঐশী নেশায় বুঁদ হয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য।

আরও বেশ ক'টা দিন চলে গেল অন্তহীন আযাবের মধ্যে। এরপর দু'জন মুক্তিযোদ্ধা আমার কাছে আসল, একজন সুমুজ আলী আর অন্যজন গিয়াসউদ্দিন। এই গিয়াসউদ্দিন যুদ্ধ শুরু হবার আগে ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী ছিল। তার উপস্থিতি সেই আত্মিক সম্পর্কের টানে কিনা জানিনা; তবে সে আমার জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ও মর্মান্তিক সংবাদ নিয়ে এসেছিল, যেটা আমার না শুনলেই বোধ হয় ভাল ছিল। তার কাছ থেকে জানলাম, আমার ফুফা মধুমুন্সী যিনি ২৫ বছর ধরে কখনো ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কখনো সদস্য হয়ে দেশ সেবা করছেন তাকে হত্যা করা হয়েছে। ভগ্নিপতি আলাউদ্দিন মোল্লাকে এবং তার চাচাত ভাই মুর্তুজ আলী মোল্লাকে গুলী করা হয়েছে। মামা আমান মেম্বার নিহত। ফুফাত ভাই বাদশাহ মিয়াকেও বাঁচিয়ে রাখেনি। অন্য আর এক আত্মীয় জজ মিয়াও আর নেই। এছাড়া আরও অনেক প্রতিবেশীকে নির্মমভাবে হত্যার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে গেল গিয়াসউদ্দিন আমি নির্বাক হয়ে শুনে গেলাম। যেন আমার কানে গলিত লোহা ঢেলে দিল। অসহ্য যন্ত্রণায় আমার দু'চোখ বেয়ে ব্যথার অশ্রু" গড়িয়ে পড়ল। আমার মনে হল সম্ভবত ঘাতকরা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার ধারণা এ হত্যার পেছনে সন্ত্রাসী বদর এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুর্তুজ আলী ও সমুজের সক্রিয় হাত ছিল।

প্রাসঙ্গিকভাবে আমাকে একটা কথা বলতে হয়। গিয়াউদ্দিনের সহযোগী সুমুজ আলী ও বদরের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে ক্রুদ্ধ জনতা তাদেরকে হত্যা করে এবং পরে টুকরো টুকরো করে। পরে আমি লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে এ খবর শুনতে পাই। নিউটনের তৃতীয় সূত্র যেন বস্তুর সীমা পেরিয়ে নৈতিকতায় এসে পড়েছে। এই সূত্রে বলা হয়, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমমুখী ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আল-কোরআনের সূত্রে বলা হয়, 'আমি যদি জালেমকে দিয়ে জালেমকে শায়েস্তা না করতাম তাহলে পৃথিবীটা জুলুমে পরিপূর্ণ হয়ে যেত।'

আমাদের সেনাবাহিনীর হেফাজতে নেয়ার কয়েক মাসের মধ্যে সরকারী স্কুল থেকে পিটিআই-এ স্থানান্তরিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। মুক্তিফৌজ ও যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্টদের মন-মানসিকতায় এমন একটা কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয় যাতে আমাদেরকে শারিরীক মানসিক নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে তারা মানসিক সুখ অনুভব করতে থাকে। তাদের বিবেক আর অনুভূতি এমনই পাথরে পরিণত হয় যে, সাধারণ সৌজন্য ও মহানুভবতা এবং উত্তম চিন্তা-চেতনার একটুও অবশিষ্ট ছিল না। যাই হোক, পিটিআই-এ আমাদের নিয়ে যাবার সময় বন্দীদের দুটো সারিতে দাঁড় করানো হল। একটি সারির সম্মুখে দাঁড়াতে হল আমাকে। অন্যটির সামনে দাঁড় করানো হল শ্রদ্ধেয় মওলানা আতাহর আলী সাহেবকে। আমাদেরকে সরকারী স্কুল থেকে পিটিআই-এর দিকে হাঁটতে বলা হল। মুক্তিফৌজদের ধারণা ছিল,

রাস্তার দু'পাশ থেকে বিক্ষুব্ধ জনতা ক্ষোভ, ঘৃণা, ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উক্তি দিয়ে আমাদের লাঞ্ছিত করবে। কিন্তু সেটা আর হল না। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম এর উল্টো। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের চোখ দেখলাম অশ্রু"সজল। কারো মুখে কোন কথা নেই। এমন কি শিশুরাও বোবার মত দাঁড়িয়ে আছে। এরা ছিল আমারই প্রতিষ্ঠিত শিশু প্রতিষ্ঠান শাহীন ফৌজের সদস্য। আমার মনে হতে লাগল, ১৭৫৭ সালে সিরাজের স্বপক্ষে যারা সত্যিকারভাবে লড়াই করেছিলেন তাঁদেরকেও ইংরেজ ও তার দালালেরা এমনি করে জনতার সামনে দিয়ে নিয়ে গেছে। ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনের সিপাহীদের করুণ পরিণতি দেখতে হয়েছে এদেশের নিরুপায় মানুষকে।

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ। দিনটা ঠিক আমার মনে নেই। কোন এক সকালে দেখলাম কয়েকজন সাবেক ইপিআর অর্থাৎ বর্তমান বিডিআর এর সদস্য আমার কক্ষে এসে আমাকে বলল- আপনাকে ব্যারাকে তলব করা হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে গেলাম। তাদের অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছি। যদিও তারা কেউ আমার গায়ে হাত তুলেনি কিন্তু বিভিন্ন কটাক্ষপাতের অবতারণা করে সারাটি পথ মানসিক যন্ত্রণা অব্যাহত রেখেছিল। অবশেষে স্টেডিয়ামের সন্নিকটে এসে পথচলা ক্ষান্ত হল। আমাকে নিয়ে আসা হল সামরিক বাহিনীর অস্থায়ী ব্যারাকে। একটি কক্ষে লেফটেন্যান্ট কামালের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি দেখলাম কামাল সাহেবের চোখে মুখে ভয়ংকর আক্রোশ আর ক্ষোভের চিহ্ন। মনে হল, কোন বিশেষ মহল থেকে আমার বিরুদ্ধে তার কানে বিষ ঢালা হয়েছে। আমাদের নিয়ে কামাল সাহেবদের মানসিক ভীতিও কম ছিল না। এতক্ষণ পিস্তলটা তার বালিশের কাছে ছিল। আমাকে দেখে তিনি

তড়িঘড়ি হাতে নিয়ে পেছন দিকে সরিয়ে দিলেন। পরে আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন- 'তোমাদের কাউকে হত্যা করা হবে না। স্বাধীনতা যুদ্ধে যেসব ব্রীজ কালভার্ট নষ্ট হয়েছে, আমরা চাই তোমাদের হাতেই সেসব মেরামত অথবা নির্মাণ হোক।' আমি নীরব থাকলাম। এ প্রসঙ্গে আমার অনুচ্চারিত অভিব্যক্তি প্রকাশ না করলেও মনে মনে বলেছিলাম- 'তোমাদের সমস্ত গুনাহর কাফফারা মৃত্যুর দোর-গোড়ায় এসেও আমাদের দিতে হবে, সে আমরা জানি। তোমরা ধ্বংস করবে আমরা গড়ব। তোমরা বিদেশীদের দালালি করবে আর দালাল হিসেবে চিহ্নিত হব আমরা। যুগে যুগে ইসলামের সৈনিকরা সমগ্র জাতির ভুলের মাশুল দিয়েছে তাদের জীবন দিয়ে।'

লেঃ কামাল বললেন, 'তুমি অনেক হত্যাযজ্ঞের নায়ক।' আমি নীরব থাকলাম। কেননা তাদের আবেগের কাছে আমার সমস্ত প্রতিবাদ ও বক্তব্য অরণ্যেরোদন মাত্র। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথায় লেখাপড়া করতে?' বললাম- 'ভৈরবের হাজী আছমত কলেজে।' জিজ্ঞেস করা হল, 'প্রিন্সিপাল তোমাকে জানেন?' বললাম জানেন। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করলেন। সম্ভবত ভাইস প্রিন্সিপাল হানিফ সাহেব টেলিফোন রিসিভ করেছিলেন। তার সাথে আমার প্রসঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা হয়। তিনি কি বলেছিলেন আমি জানিনা। তবে লেঃ কামালের চেহারায় পরিবর্তন হতে আমি দেখেছি। রিসিভার রেখে দিয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন- "আপনি মালেককে চেনেন?" বললাম, 'জ্বি হ্যাঁ, শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রনায়ক তিনি। ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে তাকে শহীদ করা হয়।' আমি লক্ষ্য করলাম তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন। আমাকে সম্বোধন এতক্ষণে 'তুমি' থেকে 'আপনিতে পরিবর্তন হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের প্রথম দিকে আমাকে টুলে বসতে দেয়া হয়। আমি বসিনি, দাঁড়িয়ে ছিলাম এতক্ষণ। কামাল সাহেব চেয়ার এগিয়ে দিলেন। আমি বসলাম। তিনি বলে চলেছেন- 'ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ার সময় আমি মালেককে জানতাম। খুব ভাল ছাত্র, তার মৃত্যুতে আমরাও আহত হই, যদিও আমি ছাত্র ইউনিয়নে ছিলাম। আমি বুঝতে পারি না, কি অন্ধ মোহে আপনারা এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নেমেছিলেন। ৮ কোটি মানুষের গণস্রোত ও প্রচণ্ড গতির সামনে কি করে আপনারা শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই গতি পাল্টে দেওয়ার জন্য, ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হই। অথচ আপনারা লুট করেছিলেন এমনটিও নয়। বৈষয়িক সুবিধাভোগীও আপনাদের বলা যাবে না। আপনারা আলবদরে যারা রয়েছেন তারা চিন্তা-চেতনার ও যোগ্যতার নিরিখে বিচার করলে পেছনের সারি নন। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, আপনারা আজ অন্ধ প্রকোষ্ঠে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন! ' আমি নীরব শ্রোতার মত শুনে গেলাম। এরপর

আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসলেন তিনি। আমার পারিবারিক সমস্ত কিছু জানতে চাইলেন। আমার জবাবে পরিবারের যে ছয় জন নিহত হয়েছেন সে প্রসঙ্গ অনুক্ত রইল না। এরপর কামাল সাহেব বললেন, 'গণবিরোধী ভূমিকা নেয়ার জন্য আপনার সমস্ত পরিবারকে বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। হয়তো বা আপনাকেও আপনার জীবন দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে। আপনার কি মনে হয় না যে আপনি একটা বিরাট ভুল করেছেন?'

আমি বললাম- 'আবেগ-তাড়িত হয়ে আমি কিছু করেছি বলে মনে হয় না। আমি যা করেছি অনেক চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়েই। আমাদের সিদ্ধান্ত সঠিক কি বেঠিক এটা নিরূপনের সময় এখনও আসেনি, আগামী দিনের ইতিহাস আমাদের ভূমিকা কিভাবে নিবে সেটাই বড় কথা। তবে এটা ঠিক, মুসলমান হিসেবে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমার সামনে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না। নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়ার পথও ছিল বন্ধ। একটা পথ খোলা ছিল, ভারতে পাড়ি জমানো। হ্যাঁ সেখানে গিয়েও আমরা বিরাট দায়িত্ব পালন করতে পারতাম। কিন্তু সেটা আমার পক্ষে কোনদিন সম্ভব হতো না। কেননা হিন্দুস্তানী সাহায্যকে আমি ঘৃণা করি। মুসলমানদের সাথে তাদের হাজার বছরের বৈরী মানসিকতার আকস্মিক পরিবর্তন মোটেও শুভ মনে করতে পারি না। ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের দুর্বল করাই তাদের লক্ষ্য। মীরজাফর ইংরেজদের সহযোগিতায় সিরাজের পতন ঘটিয়ে নিশ্চয় মুসলমানদের জন্য, এমনকি তার জন্যও কোন কল্যাণ ডেকে আনেনি। ইতিহাসের একই ভুলের আবর্তে আমি পা রাখতে চাইনি।'

'যখন পরিস্থিতি আমি অবলোকন করছি কোন পক্ষ অবলম্বন না করে, আমি যখন আমার অঞ্চলের মানুষগুলোকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং মুক্তি বাহিনীর নির্যাতন থেকে বাঁচাবার চিন্তা-ভাবনায় নিরত, ঠিক সে সময় কয়েকবার মুক্তি বাহিনী আমার বাড়ীতে হানা দিয়ে আমাকে হত্যার চেষ্টা চালায়। এর ফলে সাম্প্রতিক ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে তৃতীয় কোন অবস্থান নেয়ার পথ আমার জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। কাপুরুষোচিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার মন-মানসিকতা কোনকালেই আমার ছিল না। আমি সঠিক বিচারে মন্দের ভাল হিসেবে সঠিক সিদ্ধান্ত ও সঠিক পথ মনে করে একাত্তরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। এখন আমরা একতরফা প্রচারণার শিকার।'

দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে লেঃ কামাল আমার খাওয়া-দাওয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, 'এ কয়দিন আমি ভাত খাইনি। অসুস্থতার অস্বস্তিতে আমি বিব্রত ছিলাম।

আমার সহযোগী ভাইয়েরা কোথায় কিভাবে বাইরে থেকে খাবার ম্যানেজ করতেন, সেটা আমার জানা নেই। এসব খেয়েই রয়েছি এ কয়দিন।' কামাল সাহেব বললেন- 'আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করি, কি বলেন?; আমি দ্বিমত পোষণ করলাম না। আমাকে বাবুর্চিখানায় পাঠিয়ে দিলেন। আমি খেতে বসলাম। মনে হল আমি কতকাল খাইনি। আর সত্য বলতে কি এ কয়দিন গোস্ত খাওয়াতো দূরের কথা চোখেও সেসব দেখিনি। আমি পরম তৃপ্তিতে খেলাম। ভাতের চেয়ে গোস্ত খেলাম বেশী। এরপর ফিরে এলাম আবারও কামাল সাহেবের চেম্বারে। এসে দেখলাম এখানে কেউ নেই। আমি বসে থাকলাম। কামাল সাহেব ফিরে এসে কিছুটা আমার সাথে সহানুভূতিসুলভ হাল্কা আলাপ শুরু করলেন। ইতোমধ্যে হিন্দুস্তানী বাহিনীর ২ জন অফিসার এলেন। কামাল সাহেব তাদের অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে নিয়ে তাদের সাথে হাসি-মশকারায় অবতীর্ণ হলেন। এক পর্যায়ে আমার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার পরিচয় দিতে গিয়ে 'অনেক হত্যাযজ্ঞের নায়ক আমি'- এ কথা বলতে ভুললেন না। আমার মনে হল ভারতীয় অফিসাররা রাজপুত। তাঁরা কখনো হিন্দীতে কখনো ইংরেজীতে কথা বলছিলেন। তারা আমাকে বললেন- 'বাংলাদেশের হাজার হাজার প্রগতিশীল ছাত্র ভারতে ট্রেনিং নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তা সত্ত্বেও আপনি কেন দেশে রয়ে গেলেন?' বললাম- 'আমি ভারতকে কখনও হিতাক্সক্ষী মনে করিনি।'

তারা বললেন- 'আপনার ধারণা ছিল পাকিস্তান টিকে যাবে এবং পাকিস্তানের কাছ থেকে বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা নেয়ার ব্যাপারে সংঘাতকালীন ভূমিকা আপনার জন্য হবে একটি বিরাট সার্টিফিকেট।' বললাম- 'বৈষয়িক লোভ লালসার বাইরে থেকে আমরা আমাদের ভূমিকা রেখেছি। শুধুমাত্র ঈমানের দাবী আমার কাছে যা ছিল তাই করেছি। এর বাইরে চিন্তা করার কোন অবকাশই আমাদের ছিল না এবং এখনও নেই।'

- আপনি কী করতেন?

- ছাত্র ছিলাম। ছাত্র হিসেবে ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্য ছিলাম।'

- আপনি কতজন লোক হত্যা করেছেন?

- 'রণাঙ্গনে কতজন মরেছে সেটা আমার জানা নেই, আমি প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে ছিলাম না। সার্বিক পরিচালনা করেছি। নিজে গুলী চালানোর অবকাশ আমার ছিল না। তবে

যুদ্ধ চলাকালীন কেউ নিহত হয়ে থাকলে তার দায়-দায়িত্ব আমারই, কেননা আমার নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। কতজন মারা গেছে সেটা আমাদের চাইতে আমাদের প্রতিপক্ষরাই সঠিক বলতে পারবে। লড়াইয়ের ময়দানে হতাহতের ব্যাপারটা কোন বিশেষ ঘটনা নয়।'

তারা বললেন- 'আপনাদের গ্রামে-গঞ্জে এবং মহকুমা শহরে যে প্রাচুর্য আমরা দেখেছি, আমাদের জেলা শহরগুলোতেও তেমন নেই, তা সত্ত্বেও এখানকার তরুণরা বিদ্রোহী হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হল কেন এটা এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারছি না।' আমি এ প্রসঙ্গে নীরব থাকলাম। কামাল সাহেবকে দেখলাম তার দৃষ্টি নিচের দিকে। মনে হল, তাদের জন্য এটা একটা চপেটাঘাত। এরপর কামাল সাহেবের চেম্বার থেকে বিদায়ের পালা। সবাই একত্রে বেরুলাম। লেঃ কামাল আমাকে তার গাড়ীতে উঠতে বললেন। আমাকে আমার সেই অবস্থানে পৌঁছে দিয়ে তারা চলে গেলেন। আমি আমার সেই হল কক্ষে ঢুকে দেখতে পেলাম অনেকের অশ্র"সজল চোখ। মওলানা আতাহার আলী সাহেবসহ আমার সব সহযোগী অধীর আগ্রহে আমার সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে পেয়ে যেন তারা আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তাদের ধারণা ছিল আমাকে আর তারা পাবে না। পাবে সেই এ্যাডজুটেন্টের মত আমার শাহাদতের সংবাদ। এতক্ষণ তারা দোয়া 'ইউনুস' পড়ে আমাকে জীবন্ত ফিরে পাওয়ার জন্য খোদার কাছে কান্নাকাটি করছিল। হয়তো আমার সেই সহযোগী আল্লাহর নির্যাতিত বান্দাদের দোয়ার বরকতে ফিরে আসতে পেরেছি। মজলুমের দোয়া নাকি আল্লাহ সাথে সাথে কবুল করেন। অনেকে এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাদেরকে সমস্ত বিবরণ খুলে বললাম।

আর একদিন এক কালের আমার সহকর্মী বর্তমান মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার গিয়াসউদ্দিন এসে উপস্থিত হয়ে আমার কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করল এবং বাড়ীর খবরাখবর দিল। গিয়াসউদ্দিন এও জানালো যে, আমার মা আমার জন্য কিছু খাবার তাকে দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন আমার পরনের কাপড়। সেসব আমার অবস্থান পর্যন্ত এসে পৌঁছেনি। সে বলল যে, তার সহযোগীরা সব জামা কাপড় নিয়ে গেছে এবং খাবারগুলো খেয়ে ফেলেছে। এজন্য তাকে দুঃখ প্রকাশ করতেও দেখলাম। তাকে বিশ্বাস করেছিলাম। এজন্য তাকে অন্যান্যদের কাছ থেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বলতে গেলে কানে কানে বলেছিলাম, 'তুমি বরং আমার খালু মীর আশরাফ উদ্দিন আহমদ চেয়ারম্যান সাহেবের বাসায় যাও। ওখানে আমার জামা-কাপড় রয়েছে। সে সবের কয়েকটা আমাকে এনে দিলে আমার দারুণ উপকার হবে। তুমি আমার এ কাজটা করেই বরং

বাড়ী যেও। এক জামা-কাপড়ে দারুণ বিব্রতবোধ করছি। নামাজ কালামেও তৃপ্তি পাচ্ছি না।' গিয়াসউদ্দিন সেসব আমাকে এনে দিতে সম্মত হল। কিন্তু সে জামা-কাপড়ের একটিও আজ পর্যন্ত আমার হাতে এসে পৌঁছেনি। আমার স্যুটকূট জামা-কাপড়, জুতা, সেন্ডেল আর গেঞ্জী পরে তারা সদলবলে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু গিয়াউদ্দিনের পরনে সেসব কাপড় আমি দেখেনি। তার ভাষায়-'আমি আর সকলকে এড়িয়ে আপনার জিনিস পৌঁছাতে পারিনি।' আমি অসহায়ের মতো নীরবে তাকিয়ে থাকলাম। সবচেয়ে করুণ ও দুঃসহ নির্মমতার প্রকাশ ঘটাতেও তারা ছাড়েনি। আমার পাশের গ্রামের এক তরুণীর সাথে আমার বিয়ের কথা আমাদের গার্জেন পর্যায়ে মোটামুটি ঠিক হয়েছিল। সেই তরুণীকে একজন মুক্তিযোদ্ধা বন্দুকের নলের মুখে বিয়ে করে এবং সেই বিয়েতে খালুর বাসা থেকে নিয়ে যাওয়া সুটকেসটি উপহার দেয়া হয়। এসব ঘটনাসমূহের অবতারণা করা হয় আমাকে এবং আমার মা ও আত্মীয় পরিজনদের মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার জন্য।

কিছুদিন পর আমাকে কিশোরগঞ্জ জেলে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হয়। সোজা পথ দিয়ে অথবা গাড়ীতে জনমানুষের প্রদর্শনী ছাড়াও আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু সেটা না করে আমাকে কলেজের পাশ দিয়ে বিভিন্ন পথ ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এর একমাত্র কারণ, যেন আমি বিভিন্নভাবে জনতার হাতে লাঞ্ছিত হই। আমি যেন এখন এক খেলার সামগ্রী। আমাকে ঘিরে জনমানুষের ভিড় সৃষ্টি করাই হল পুলিশদের উদ্দেশ্য। কলেজের ছাত্ররা আমার প্রতি বিদ্রƒপাত্মক উক্তি করুক এমনটি চেয়েছিল পুলিশেরা। কিন্তু সেটা হল না। পথিমধ্যে শুধুমাত্র কতিপয় কলেজ ছাত্রীর মন্তব্য আমার কানে এসেছিল। তা হল, 'আলবদরের পান্ডাকে দেখ, নিয়ে যাচ্ছে।' এরা আমাকে জানতো। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের স্বপক্ষে ভাষণ দিতে দেখেছে। কারাগারের সম্মুখে দেখলাম অনেক মানুষের ভিড়। সকলে আমাকে দেখার জন্য সমবেত হয়েছে। আলবদরকে দেখার এমন আগ্রহ দেখে মনে হল, আমি যেন কোন এক ভিন্ গ্রহ থেকে এসেছি। এ দেশ এ মাটির সাথে আমার যেন কোন সম্পর্ক নেই অথবা কোনদিন ছিল না। সম্ভবত পত্র-পত্রিকার উদ্ভট প্রচারণা থেকে মানুষের আগ্রহ এমন তীব্র হয়েছে।

অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্য দিয়ে আমাকে জেলের ভেতরে পা রাখতে হল। ভেতরে ঢুকিয়েই অফিসিয়াল কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই আমাকে একটা সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। আমার মনে হল গোটা দেশটা একটা কারাগার। সেই করাগার থেকে ছোট, ছোট থেকে অতি ছোট কারাগারে প্রবেশ করলাম,

আওয়ামী লীগের ঔদ্ধত্বের কাছে অসহায় কারা কর্তৃপক্ষের মেহেরবানীতে। এখানে আমাকে নিয়ে দাঁড়াল ৭ জন। অথচ খুব বেশী হলে স্থান সংকুলান হয় ৩ জনের। এখানে যারা ছিল, যদিও এরা মানুষ কিন্তু তাদের চাল-চলন, আলাপ আলোচনা ও তাদের সমস্ত অভিব্যক্তি থেকে মনে হত এরা নর্দমার কীট। গনোরিয়া সিফিলিসের রুগী এরা। সারাক্ষণ তাদের আলাপ আলোচনায় সারা জীবনের অপকর্মের ফিরিস্তি একে অপরের কাছে অকপটে প্রকাশ করছে। এদের সাথে আলাপ আলোচনা অথবা কোন রকম কথা বলার আগ্রহ কোন সময়েই আমার জাগেনি। আমি ৬টি লোক সাথে পেয়েও একান্ত একা। নির্লিপ্ত হয়ে সারাক্ষণ বসে অথবা শুয়ে কাটাতম, আমার জীবন মৃত্যু যার হাতে, সেই মালিকের রহমত কামনা করে। পরে জেনেছিলাম, এই অন্ধ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করানোর মূলে ছিলেন আমারই মত ২জন বন্দীর বিভ্রান্তিকর প্রচারণা। তারা হচ্ছে শান্তি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সাবেক মহকুমা অফিসার ও মুসলিম লীগ নেতা বাদশাহ মিয়া। তারা কারা কর্তৃপক্ষ ও আওয়ামী লীগের করুণা ও রহমতের প্রত্যাশায় আমাকে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। তারা ধারণা দিয়েছিল, সমস্ত অপকর্মের নায়ক আমি। অথচ তাদের প্রকোষ্ঠে আর একজন থাকতেন এডভোকেট সাইদুর রহমান আরো অনেকে। তারা আমাকে নিয়ে কোন খারাপ ধারণা ব্যক্ত করেননি। বরং আমার প্রতি ছিল তাদের গভীর মমতা।

ছয় জন কারাসঙ্গী থাকা সত্ত্বেও আমি একা। আমার একাকীত্ব আমাকে নিমগ্ন করেছে পুরোপুরি। আমার ফেলে আসা বিক্ষিপ্ত স্মৃতিগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা করছি। আর আত্মবিশ্লেষণ করে চলেছি সারাক্ষণ। মনের পর্দায় ভেসে উঠছে. . . .

সত্তরের নির্বাচন শেষ। রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেশটা যেন দুটো ভাগ হয়ে গেল। একদিকে উগ্র আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ অন্যদিকে ইসলামী সমাজতন্ত্রের ইউটোপিয়া। দুটোরই অবাস্তব কাল্পনিক স্বাচ্ছন্দের প্রতিশ্র"তি আর চোখ ঝলসানো প্রাচারণার তোড়ে সমগ্র জাতিটা দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জাতির অনাগত ভবিষ্যতের ভাবনা যাদের তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল নির্বাচনের রায় ঘোষণার পর তারা নির্বাক হয়ে পড়ল। অতি আশায় উচ্ছল কোটি কোটি মানুষ হল প্রত্যাখ্যাত। এই প্রত্যাখ্যান পর্যায় স্বাভাবিক পথ ধরে হয়েছে এমনটি বলা যায় না। আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের পোষা গুণ্ডাদের দ্বারা আমাদের সহকর্মী বহু পোলিং এজেন্টকে পোলিং বুথ থেকে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের দৃশ্য এর চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল বলে আমার জানা নেই। এমনটি হবে এটা অনেকেই আঁচ করেছিল অনেক আগে থেকে। ঢালাও পয়সার বিনিময়ে এবং পোষা গুণ্ডাদের উগ্র মানসিকতার প্রকাশ

ঘটিয়ে জাতির বিবেককে কেনার সামর্থ্য আওয়ামী লীগ অর্জন করেছিল। বেশ কিছু আগে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ভাষণ দেয়ার সময় টাকা সংগ্রহের জন্য শত শত ড্রাম বসান হয়েছিল। এ থেকে কত টাকা সংগ্রহ হয়েছিল। সেটা বলা হয়নি। তবে এর অছিলায় কোটি কোটি টাকার হিন্দুস্তানী মদদ জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবের হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য। এটা অনেকেই টের পেয়েছিলেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছু বলবার হিম্মত ছিল না অনেকের।

এ প্রক্রিয়া কোন তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া নয়। এর শুরু অনেক আগে থেকে। বলতে গেলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে এর মূল উদগাতা আওয়ামী লীগ অথবা শেখ মুজিব কেউই নয়। এর নেপথ্যে যাদের কালো হাত সবচেয়ে সক্রিয় ছিল সেটা হল কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক সংগঠনগুলো। আর এ ব্যাপারে সর্বাত্মকভাবে সুযোগ সৃষ্টি করেছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তানের প্রতিশ্র“ত আগামী দিনগুলোকে নিয়ে শুরু হয় প্রসাদ ষড়যন্ত্র। যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে উপমহাদেশের মানচিত্র ভেঙে খণ্ড-বিখণ্ড হয়, পাকিস্তান সৃষ্টির পর সেই দ্বিজাতীয় তত্ত্বকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অস্বীকৃতি জানানোর প্রয়াস অব্যাহত থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনা লগ্নে কোটি কোটি ইসলামী জনতার উদ্দেশ্যে যে বাণী সম্প্রচারিত করা হয়েছিল সেটা হল কায়দে আযমের ভাষায়, 'আমাদের নতুন শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন নেই। ১৪শ' বছর আগে এটি রচিত হয়েছে। আমরা তার প্রতিফলন ঘটাব মাত্র।' পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সেটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়, এরও কারণ রয়েছে। জনগণের আবেগ ও মন-মানসিকতা ইসলামিক হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব যাদের হাতে এসে পড়ে, তারা হচ্ছেন নবাব, জমিদার ও গোলামী মনোবৃত্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত তথাকথিত এলিট গোষ্ঠী। তাদের মন-মানসিকতায় ইসলামী চেতনার ক্ষীণতম আলো বিরাজ করলেও ইসলামী জীবন-বোধ সম্বন্ধে তাদের অন্তঃকরণে সটিক ধারণা অনুপস্থিত ছিল। এর ফলে যা হবার তাই হয়েছে। ইসলামী জনতার দাবী হয়েছে উপেক্ষিত। তাদের আন্দোলন ও বক্তব্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে ধর্মীয় উন্মাদানা বলে এমনকি তাদেরকে পাকিস্তান বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে বিষোদগার করা হয়েছে বার বার।

আলেমদের মধ্যে অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা মওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মওলানা মাদানীর কাতারে টেনে এনে ইসলামের অগ্রনায়কদের ভাবমূর্তিকে খাটো করার জন্য তাদেরকে পাকিস্তানের শত্রু ও ভারতের দালাল হিসেবে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে এদের বিরুদ্ধে গুণ্ডাও লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে প্রকৃত পাকিস্তান বিরোধীরা এক পা এক পা করে নেপথ্য যবনিকা থেকে রাজনৈতিক মঞ্চে এগিয়ে আসতে শুরু করে।

জামায়াত যখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের দাবীতে গণআন্দোলন শুরু করার আয়োজন-উদ্যোগ নেয় তখনই ছাত্রদের মাধ্যমে ৬ দফা রাজনৈতিক ময়দানে আনাগোনা শুরু করে। পঁয়ষট্টির যুদ্ধে পাকিস্তানের কাছে মার খেয়ে হিন্দুস্তান পিছন দিক থেকে এ জাতিকে ছুরিঘাত করার চেষ্টা নেয়। ৬ দফা আওয়ামী লীগ প্রণয়ন করে থাকলেও প্রকৃত পক্ষে এটা আসে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র‍্যাডের টেবিল থেকে সময় মত আগরতলা ষড়যন্ত্রের রহস্য ও উদঘাতি হয়। আওয়ামী লীগ তখন ময়দান থেকে বিচ্ছিন্ন। শুধু মিজানুর রহমান চৌধুরী ও আমেনা বেগম আওয়ামী লীগের নিভু নিভু বাতি জ্বেলে রেখেছিলেন কোন মতে।

ছাত্রদের মধ্যে র‍্যাডের এজেন্টরা ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করে। তখন রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাদের সহায়ক শক্তি ছিল ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি। ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে এরা সিদ্ধহস্ত। গণআন্দোলন যখন তুঙ্গে, যখন আইয়ুব খানের সাথে বোঝাপড়া হবে, এ সময় ১১ দফাকে আকস্মিকভাবে গণআন্দোলনের জোয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। বামপন্থী সাংবাদিকতার সুবাদে ১১ দফা ব্যানার হেডিং-এ সবক'টি দৈনিকে প্রকাশ পেতে থাকে। এতে ছিল আওয়ামী লীগের ৬ দফা আর বাকীটা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রোগ্রাম। রুশ-ভারত ষড়যন্ত্র হাত ধরে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। এই মোর্চা থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী উঠল। এ দাবীও গণজোয়ারে ছেড়ে দেয়া হল। ফলে ধিকৃত ষড়যন্ত্রের নায়কের মুক্তির দাবীটা জনগণের আওয়াজে পরিণত হতে দেরী হল না। জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দল এটাকে এড়িয়ে যেতে পারল না। পরবর্তীতে ষড়যন্ত্রকারী ভারতের দালাল পরিণত হল জাতীয় হিরোতে।

আল্লাহ আসন্ন বিপদের লাল সংকেত দিয়েছে সময় মত এবং বার বার। তা না হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে মালেক ভাইয়ের মত চরিত্রবান ও সেরা ছাত্রের শাহাদাত

সে সময় হল কেন? অথচ এই আসন্ন ঝড়ের সংকেত বুঝল না ইসলামপন্থীরা। তারা সংঘবদ্ধভাবে বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ব্যর্থ হল।

সত্তরের ১৮ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে ইসলামী জনতার রক্ত ঝরার পরও ইসলামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না। ওটাও ছিল আসন্ন ঝড়ের সংকেত। আমি পল্টনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছি কি ভয়াবহ দৃশ্য! একটা কারবালা যেন। শত শত মানুষকে রক্তাক্ত হতে দেখেছি। শহীদও হয়েছে কয়েক জন। অথচ ষড়যন্ত্রকারীরা রাত্রে মাইক যোগে প্রচার করেছে, 'নিরস্ত্র জনতার ওপর জামায়াতে ইসলামী গুণ্ডাদের নির্লজ্জ হামলা।' কি বিচিত্র এদেশ সেলুকাস!

এইভাবে আওয়ামী লীগ তাদের সুপরিকল্পিত প্রচারণা দিয়ে জনতার বিবেককে ধীরে ধীরে অন্ধতার দিকে টেনে নিয়ে চললো। সরকার নিরপেক্ষতার আবরণ দিয়ে তার চোখ দুটোকে বেঁধে রাখলো। আওয়ামী লীগের কালোহাত প্রশাসনকে পর্যন্ত স্পর্শ করলো। সরকারের নীরবতার সুযোগে হিন্দুস্তান আওয়ামী লীগের মাধ্যমে পাকিস্তানে যা কিছু করতে চেয়েছিল তার সবটাই নির্বিঘ্নে করতে পেরেছে। এতে মদদ দিয়েছে- সরকার, মদদ দিয়েছে ভুট্টো, মদদ দিয়েছ অন্যান্য সব ক'টি দল। বলতে গেলে পরোক্ষভাবে জামায়াতে ইসলামীও।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ফ্যাসীবাদী কায়দায়। দুই দিকে দুই জাহেলিয়াতী শক্তি মাথা তুলে দাঁড়ালো। মুজিব-ভুট্টো স্পস্ট বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে জনগণকে নিয়ে চললো এক ভয়ঙ্কর সংকটের দিকে। ইয়াহিয়া মুজিবের ষড়যন্ত্র অনুধাবন করল। কিন্তু ভূট্টোকে আন্দাজ করতে ব্যর্থ হল। রাজনীতিতে শুরু হল অরাজকতা। মুজিব-ভূট্টো যা চেয়েছিল দেশ সে অবস্থায় এসে উপনীত হল।

অপরাধ করতে করতে আওয়ামী লীগের দুঃসাহসিকতা সীমা ছাড়িয়ে গেল। যখন হত্যাযজ্ঞ শুরু হল অবাঙালীদের ওপর, যখন জাতীয়তাবাদের হাতিয়ার গর্জে উঠল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকদের লক্ষ্য করে, তখন সরকারের টনক নড়ল। তখন যমুনার পানি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। গোটা দেশে তখন কারবালা সংঘটিত হয়ে গেছে। প্রায় প্রতিটি অবাঙালী বসতি উজাড় হয়ে গেছে। এটাও ছিল হিন্দুস্তানী পরিকল্পনা। অবাঙালী ও ইসলামপন্থীদের হত্যাযজ্ঞের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান বাহিনীর নির্বিচার নিপীড়ন শুরু হলে স্বাভাবিকভাবে বাঙালীরা হিন্দুস্তানে পলায়ন করবে। তারপর সেখান থেকে পাকিস্তানকে পাকিস্তানী দিয়েই ভেঙে টুকরো করা যাবে।

একই সূত্র থেকে একই পরিকল্পনার পথ ধরে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এগুতে লাগলো। ভূট্টোর দোসর টিক্কা খানের সামরিক অপারেশন ভয়াবহতা সৃষ্টি করলো। দুষ্কৃতিকারী আর প্রকৃত অপরাধীরা ততক্ষণে সীমান্তের ওপারে। নিরীহ সাধারণ মানুষেরা সহানুভূতির বদলে পেল সামরিক অপারেশনের ভয়বাহতা।

এক ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা নিয়ে তখন আমি গ্রামের বাড়ীতে। এখান থেকে প্রকৃত পরিস্থিতি আঁচ করতে পারছি না। সম্পূর্ণ অন্ধকারে আমি বিদিশা। দেশের ভবিষ্যত নিয়ে দারুন উদ্বিগ্ন। এক নীল নক্সার শিকার হয়ে আমরা দেশের ৮কোটি মানুষ কী সাধ করে হিন্দুস্তানের পায়ের তলে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি!

হিন্দুস্তানের মদদ কি পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে? এ প্রশ্ন আমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছি বার বার। এখন আমরা কি করতে পারি? অশান্ত উদ্বেল দেশটাতে কিভাবে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে? এমন শত শত প্রশ্ন, শত শত সমস্যার পাঁকে যেন আমি হারিয়ে যাচ্ছি।

আমার এ উদাস উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে মা দারুণ বিব্রত বোধ করেছিলেন। মা এক সময় আমাকে বললেন- 'তুমি এভাবে বাড়ীতে বসে থাকলে পাগল হয়ে যাবে। যাও বাজারের দিক থেকে ঘুরে আসতো।' মার কথায় আমি দ্বিমত পোষণ করলাম না। আমি বাজারের দিকে পা বাড়ালাম। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে চলছি আঁকা বাঁকা মেঠো পথ ধরে। সবকিছু শূন্য মনে হচ্ছে। খাঁ খাঁ করছে সবকিছু। দু'পাশে কড়োই গাছ ঝিম ধরে আছে। ঝিম ধরে আছে বিশ্বপ্রকৃতি। এত পরিচিত এই পথঘাট, এই এত আপন আমার এ গ্রামটা। এই মাটি, এই ভূখণ্ড যেখানে আমি লালিত হয়েছি, যেখানকার সৌন্দর্য সুষমা পান করে আমি বেড়ে উঠেছি। মাটির সোঁদা গন্ধ আর মউলের সুরভী শুঁকে শুঁকে আমি জীবনটাকে উপলব্ধি করেছি। এই গ্রামবাংলার সাথে আমার কি নিবিড় সম্পর্ক অথচ আমি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। ষড়যন্ত্রের রাজনীতির কাছে সুস্থ রাজনীতি বিপন্ন। জগতশেঠ আর মীরজাফরের রাজনীতির কাছে মীরমদনের রাজনীতি ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে।

হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম অষ্টগ্রাম বাজারে। এসে ঢুকলাম ভূঁইয়াবাড়ীর চা স্টলে। এখানে লোকজন কম মনে হল না। জমজমাট চা বেচাকেনা চলছে। কিন্তু চেনা মুখ চোখে পড়ছে না আমার সবই যে অপরিচিত মুখ। আমি ভাবছি আমার মানসিক অবস্থা কি সব মানুষকে অপরিচিত করে দিয়েছে? নাকি এরা সব নবাগত! আমি এমন একটা ভাবনার মধ্যে রয়েছি এমন সময় দেখলাম, আমার এক পরিচিত মুখ

কাজী বারী। মোমেনশাহী জেলা ন্যাপের সহ-সভাপতি। কোন এক সময় তার কর্মী ছিলাম আমি। অন্ধতার ঘোর কাটলে আমি অবস্থান নিই তার বিপরীত বলয়ে। আমাকে দেখেই কাজী বারী সদম্ভে বললেন- 'কি আমিন, তোমার সিনা তো বেশ চওড়া হয়ে গেছে।' তার কথাটা শুনেই আমার চেতনা ফিরে আসলো। আমি এখন স্পষ্ট বুঝলাম, এ অপরিচিত মুখগুলো এখানে কেন? বুঝলাম আমি আমার অজান্তে শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়েছি। ঘটনার আকস্মিকতায় একটা তাৎক্ষণিক বিহবলতা আমার মধ্যে এলেও আমি নিজেকে সামলে নিয়ে একটুখানি চাতুরির আশ্রয় নিলাম। বললাম, 'বারী ভাই যে'। চায়ের দোকানীর উদ্দেশ্যে বললাম- 'বারী ভাই আর আমার জন্য লাগান ২ কাপ চা। বিস্কুটও দেন, আমি এক্ষুণি আসছি।' কাজী বারী আমার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা আঁচ করতে পারল না। আমি কেটে পড়লাম। কিন্তু সমস্ত বাজারটা আমার কাছে মনে হতে লাগলো আমার শত্র"। মনে হচ্ছিল সবাই যেন আমার পিছে ধাওয়া করছে। আমি ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে চলছি। চলার পথে দেখলাম হাফেজ আবদুল হাইও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। চাপা কণ্ঠে বললেন- 'এখানে কেন। তাড়াতাড়ি সরে যান। ইপিআর, আওয়ামী লীগ আর কমিউনিস্টরা বাজারে ক্যাম্প করেছে। মওলানা আব্দুল গণি খান সাহেবের বাড়ীর সকলকে হত্যা করেছে। এদের টার্গেটে আপনিও আছেন। বাড়ীতেও থাকবেন না।' বাজার একটু আড়াল হলে আমি দৌড় দিলাম আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে।

বাড়ী এসেই বাবা-মাকে নিয়ে বসলাম। পরিস্থিতির সমস্তটাই বিশ্লেষণ করে বললাম- 'আমি নীরব দর্শকের ভূমিকা নিলেও এরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। এ অবস্থায় আমি কী করতে পারি?

বাবা বললেন- 'কোন বুজদীলের মৃত্যু মুসলমানের নয়। তোমাকে আল্লাহর রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছি। যে কোন মূল্যে আল্লাহর পথে থাকাই উত্তম।' মা বললেন- 'এই পরিস্থিতিতে তোমার যা ভাল মনে হয় তাই করো। তোমার পথ আগলে রাখতে চাই না।'

আমার সে রাত্রে ঘুম নাই। আমি সারা রাত ঘুরে ঘুরে আমার বন্ধু বান্ধব ও নিজস্ব লোকদের সাথে যোগাযোগ করলাম। দেখলাম সবাই আমার মতই চিন্তা করছে। ভারতীয় প্রচারণার ধূম্রজালে এরা কেউ আটকেনি। নিজস্ব চিন্তার পরিসর দিয়ে সবাই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে।

রাত ভোর হয়ে এল। ফজরের নামাজ শেষ করে বাবার কাছে বিদায় নিলাম। আমাকে অনিশ্চিতের মধ্যে ছাড়তে বাবার অন্তর কাঁদছিল। আমি তার মুখে দেখেছি হাসি কিন্তু সে হাসির আড়ালে কি দারুণ বেদনা লুকিয়ে আছে, একমাত্র পুত্র হয়ে সেটা অবশ্যই আমি উপলব্ধি করি। মা'র চোখ দেখলাম অশ্র"সজল। সূর্য উঠার আগেই আমি গ্রাম ছাড়লাম। কখনো হেঁটে, কখনো নৌকায়, আমি এসে পৌঁছলাম ভৈরব।

২৫ মার্চের পর এই প্রথম পা রাখলাম ভৈরবে। এখানে আগের সেই প্রাণচাঞ্চল্য নেই। কেমন যেন স্থবির মনে হল। প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা এই ভৈরব যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। একটা প্রচণ্ড ঝড় যেন বয়ে গেছে এই ভৈরবে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে আমি এগিয়ে চলছি। চকবাজারে এসে থমকে দাঁড়ালাম। হাজী সবদের আলী সাহেবের দোকানের ভেতরে ঢুকতেই হাজী সাহেব আমাকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন, "ওদের বাঁচাতে পারলাম না। মনসুরের বাবা-মা ভাই-বোনকে বাঁচাতে পারলাম না। ওরা সব শেষ।"

আমি তার কথা বুঝলাম না। অনেক জিজ্ঞাসা নিয়ে হতবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছি। তিনি বলে চলছেন, 'এখানকার সব অবাঙালীকে হত্যা করা হয়েছে। মনসুরের বাবা, মা, ভাই বোন সহ ৫শ' বিহারীকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিয়ে হত্যা করেছে। মনসুরকে আমার দোতালায় লুকিয়ে রেখে বাঁচিয়েছি।' আমার চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে এলো। মনুসর আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, ডিগ্রীর ছাত্র। আজ সে এতিম সর্বহারা। আমার ভেতরের মানবিক সত্তা জেগে উঠল। আমার অন্তরের ঘুমন্ত সিংহ গর্জে উঠল যেন। এইসব জুলুম অত্যাচার আর অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার শপথ নিলাম। বিভিন্ন সূত্রে আমি জানলাম, এসব অমানবিক হত্যাযজ্ঞের নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমান, মোজাফফার ন্যাপের লেঃ রউফ (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ নং আসামী), অধ্যাপক মতীন ও আওয়ামী লীগ নেতা সিদ্দিক মিয়া। এদের ব্যাপারে আমি চিন্তা করলাম হিন্দুস্তানের প্ররোচনায় এরা কি করে পারলো মুসলমানদের খুনে তাদের হাত রঙীন করতে। কি করে পারলো অবোধ শিশুদের বেয়নট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করতে। তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হল আমার মনে।

খাঁটি সরিষার তেল আর ঘি বিক্রি করতেন আমাদের সফি ভাই। আমাকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। বললেন, 'আমিন ভাইয়া আমার বেঁচে থেকে আর লাভ

নেই। আমার আত্মীয় পরিজন সকলকে শেষ করে দিয়েছে ওরা।' আমি স্থির থাকতে পারছিলাম না। আমার শপথ আরও প্রচন্ড হয়ে উঠলো।

ভৈরবে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে আমি সংক্ষিপ্ত একটা ট্রেনিং নিলাম। ইতোমধ্যে সুযোগ-সন্ধানীরা সেনাবাহিনীর আশেপাশে ভিড় জমিয়েছেন। এরাও দেখলাম মোজাফফর ন্যাপের লোকজন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের শয়তানী প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে আমি প্রতিবাদী হয়ে উঠি। আমার ব্যাপারে সুযোগ সন্ধানী তোষামোদকারীরা সেনাবাহিনীকে ভ্রান্ত ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে। এরপর ভৈরবকে আমার জন্য নিরাপদ মনে করলাম না।

আমি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া চলে এলাম। এখানে সংগঠনের অন্যতম নেতা মুহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে আমার উন্নত ট্রেংনি এর ব্যবস্থা করে দিলেন। ট্রেনিং শেষ করে এখানে বেশ কিছু দিন অবস্থান করি। ইতোমধ্যে আমি বাড়ীর টান অনুভব করতে থাকি। বাবা-মা'র সান্নিধ্য পাবার জন্য প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। একদিন কুমিল্লার গোয়ালনগর ইউনিয়ন কাউন্সিলের কলিমউদ্দিন চেয়ারম্যানের সাথে গ্রামের বাড়িতে রওয়ানা হলাম।

আমার ধারণা ছিল এর মধ্যে হয়তো অষ্টগ্রামে পাকিস্তানী বাহিনী অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এসে শুনলাম এখানকার অবস্থা আগের মতই। সশস্ত্র ইপিআর, আওয়ামী লীগ আর বামপন্থীদের চারণভূমি এই অষ্টগ্রাম। গ্রামে আমার আসার সংবাদ ইতোমধ্যে বিদ্রোহীদের ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে। এ খবর জানলাম দেলোয়ার মাষ্টার অর্থাৎ দিলু ভাই এর চিরকুটে। আমার হিতাকাক্সক্ষী এবং আমার বিরোধী আওয়ামী লীগের লোকেরা সবাই এসে আমার বাড়ীতে ভিড় জমিয়েছে। সবার কৌতূহলী চোখ আমার দিকে। আমার আসন্ন পরিণতি দেখার জন্য সবাই যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমি আমার দুর্বল অবস্থান আর ভয়াবহ অবস্থা আঁচ করলাম। কিন্তু তাৎক্ষণিক কী করতে পারি! এর মধ্যে হয়তো সশস্ত্র পতিপক্ষরা আমার উদ্দেশে রওয়ান হয়ে গেছে। এত চোখ ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকানো সম্ভব নয়। হিতাকাক্সক্ষীদের অনেকে জিজ্ঞাসা করছে আমি কেন এলাম। আমার দুর্বলতার প্রকাশ না ঘটিয়ে সকলকে শুনিয়ে জোরে জোরে বললাম- 'আমি আমার প্রস্তুতি না নিয়ে এমনি এসেছি, আমি কি এমনই গাধা। দাওনা ওদরে আসতে।' আমার চোখে মুখে ভীতি নেই, নির্বিকার অভিব্যক্তি। আমার এ কথায় সম্ভবত কাজ হয়েছিল। প্রতিপক্ষরা তাৎক্ষণিক আমাকে

আঘাত হানার সাহস করেনি। ওরা থমকে ছিল। আমার দিক থেকে কোন আঘাতের প্রতীক্ষা করছিল হয়তো বা। তাতে আমি বেশ সময় পেয়ে গেলাম।

আমি তড়িঘড়ি আমার নিকটতম আত্মীয়দের সহযোগিতায় গোপনে নৌকাযোগে অন্যত্র সরে যাই। আমাদের নৌকা যখন মাত্র মাইল খানেক পথ অতিক্রম করেছে ঠিক সে সময় আমার সশস্ত্র প্রতিপক্ষরা আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে।

পরবর্তীতে, যারা আমাকে স্থানান্তরে সহযোগিতা করেছিলেন তাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করা হয়েছিল, যদিও তাদের প্রাণে মারা হয়নি। নিপীড়নের শিকারে পরিণত হয় মওলান আবদুল মোমেন ভাই, ভাগ্নে জামালউদ্দিন ও আর একজন প্রতিবেশী।

এরপরে আমার সব ধরণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য পুরোপুরি নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলি। অষ্টগ্রামের সাবিয়ানগর থেকে কুলিয়ার চর হয়ে কিশোরগঞ্জে এসে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারপর আমাদের সমমনা বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে আমি আলবদর বাহিনী গঠন করলাম। ইতোমধ্যে রাজাকারদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে জুলুম হয়েছে এমন অভিযোগও আসছিল। আলবদর গঠন করে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সবরকমের অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলাম জনগণের মধ্যে ভীতি ও সন্ত্রাসের ব্যাপ্তি ঘটেছিল, সেটাও অল্প কয়দিনেই কেটে গেল। জনগণের আস্থা ফিরে এলে আমরা গণ সমর্থন পেতে থাকলাম। কিন্তু এসব হল অনেক পরে এসে। শুরু থেকে এ সুযোগ না আসাটা জাতির জন্য ছিল চরম দুর্ভাগ্য।

দুই

কিশোরগঞ্জ জেলের ধারণ ক্ষমতা ২শ' জনের বেশী নয় অথচ ৭শ' লোককে সেখানে রাখা হয়েছে। এখানকার অস্বাস্থ্যকর ও অস্বস্তিকর পরিবেশে সকলেই হাঁপিয়ে উঠেছিল। এখান থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজছিল সকলে। কিন্তু নিরুপায়। কারা প্রকোষ্ঠে মাথা কুটে মরা ছাড়া কোন পথ আছে কি? তবু সবখানে ফিসফিস, কানে কানে কথা, নীরব গুঞ্জরণ। উপায় বের করার প্রচেষ্টা চলছে যেন। একদিন তারা মিয়া ও কতিপয় তরুণ আমাকে জানালেন কারাগার ভাঙবার সিদ্ধান্ত। তারা যে পথ ও পদ্ধতির কথা বলল তাতে সেটা অসম্ভব বলে মনে হল না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'বেরিয়ে কোথায় যাবেন?' জবাব পেলাম, 'বাইরের মুক্ত আলো বাতাসে।' বললাম- 'সেটাতো বড় কারাগার বরং এখানে ভাল আছেন, নিরাপদে আছেন। বাইরে অরাজক রাজ্য, ভয়ংকর সন্ত্রাস আর ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। কারাগারের বাইরে বাংলাদেশে আমরা নিরাপদ নই মোটেও। অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর করে এখানেই থাকার চেষ্টা করুন। এখানকার অখাদ্য খেয়ে হলেও, মানবেতর পরিবেশে থাকতে মন না চাইলেও এটাই আপাতত আমাদের বিরাপদ আশ্রয়।' এরপর সম্ভবত জেল ভাঙার পরিকল্পনা তারা বাতিল করে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কথাটা গোপন থাকেনি। মুখে মুখে শেষ পর্যন্ত কারা কর্তৃপক্ষের কান পর্যন্ত পৌঁছে। তাদের এই ধারণা জন্মে যে, এসব পরিকল্পনার মূলে রয়েছি আমি, অতএব এখান থেকে আমাকে সরানো জরুরী। একদিন আমাকে একজন কনস্টেবল এসে তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি নিতে বলে এবং আমাকে জানায় এ কারাগার থেকে স্থানান্তরিত করার জন্য উপর থেকে হুকুম এসেছে। আমি তৈরি হলাম। আরও ৩ জন আমার সহগামী হলেন এমপি লোকমান হেকিম, সাবেক গভর্নর শহীদ আবদুল মোনয়েম খানের নাতি আলী আনোয়ার খান এবং এনএসএফ নেতা আবুল কামেশ ভাই।

বিকেল ৪টা নাগাদ কিশোরগঞ্জ জেল থেকে বের করা হল। হাঁটিয়ে নেয়া হল স্টেশন পর্যন্ত। এখানে পুলিশরা আমাদের ৩য় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে নিতে চাইল কিন্তু আমরা যেতে চাইলাম না। শেষ পর্যন্ত ১ম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে নিয়ে আসা হল দেখা গেল এখানে অনেক চেনা মুখ। আমাদের জন্য সাধারণ সৌজন্যবোধে সিট ছেড়ে দিলেও তাদের কথাবার্তা আলাপ আলোচনায় আমাদের প্রতি নিন্দাসূচক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। আমরা নীরব দর্শক হয়ে বোবার মত বসে থাকলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন আসলো। আমরা ট্রেনে উঠলাম। পুলিশেরা আমাদের মার্জিত ব্যবহার ও আচার

আচরণের কারণে ট্রেনের মধ্যে আমাদের হাতের বেড়ী খুলে দিল। ট্রেন ছাড়লো। আমরা কিশোরগঞ্জ ছেড়ে চলেছি। ভাল লাগছিল না মোটেও। এই মাটি এই আকাশের নিচে সর্বোত্তম কোরবানীর স্পৃহা নিয়ে প্রচণ্ড গোলাগুলীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেসেছি। কত আত্মোৎসর্গকারী সহযোগীদের তাজা রক্ত এ মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। এই মাটি এই পবিত্র মাটি ছেড়ে আমাকে যেতে হচ্ছে সাধ করে নয়। নিজের প্রতিতো এখন আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। আমার ইচ্ছা অনচ্ছিার কবর হয়েছে ১৮ ডিসেম্বর। তবু বললাম, মনে মনে বললাম, 'খোশ রহো আহলে চামান মাইতো চামান ছোড়কে চালে।'- হে বাগানবাসী তোমরা আনন্দে থাক। আমিতো এই সাজানো বাগিচা ছেড়ে চলেছি।

তখন সুবেহ সাদিক। শম্ভুগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছল। ময়মনসিংহ থেকে মাত্র ৩ মাইল দূর ট্রেন আর এগুবে না। কেননা সামনের সেতু ভাঙা। যুদ্ধকালীন সময়ে সেটা ভেঙে দেয়া হয়। এবার পায়ে হাঁটা পথ। এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছি। সামনে নদী পার হলাম। সমস্ত আকাশটায় সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস। রাত্রির অন্ধকার পালানোর পথ খুঁজছে। আমি ভাবছি আমাদের জাতির ভাগ্যে পালাবদলের এমন মুহূর্ত কি কোনদিন আসবে না! ইসলামের সূর্যটা কারবালার রক্তাক্ত পথ ধরে, সেই যে বিদায় হয়েছে, তারপর অন্ধকার। কখনো নিবিড়, কখনো আধো আলো। কখনো জোনাকীর আলো জ্বেলে অথবা দীপশিখা দিয়ে যুগের অন্ধকার বিদূরিত করার প্রয়াস প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু আজও মুসলিম বিশ্বে ইসলামের সূর্যোদয় হয়নি। ওযু করলাম কালের সাক্ষী প্রবহমান নদীর নির্মল পানিতে। তারপর উন্মুক্ত আকাশের নিচে শিশির ভেজা দূর্বাঘাসের সবুজ গালিচায় নামাজ পড়লাম। দোয়া করলাম প্রাণ ভরে।

পূর্বাচলে সূর্যটা ধীরে ধীরে উঁকি মারছে। অনেকদিন পর অবারিত আকাশের নিচে প্রশান্ত নির্বিরোধ পরিবেশে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করলাম। তখন পৃথিবীটা পাখির কাকলিতে মুখর হয়ে উঠছে। মনে হল, এটা প্রকৃতির পক্ষ থেকে সূর্যটাকে অভিনন্দন জানানোর প্রয়াস। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই। এমন কি মসজিদ ফেরা কোনও মুসল্লিও চোখে পড়ল না। আর তেমন চোখে পড়ার কথাও নয়। মসজিদে যাতায়াতকারী মুসলমানদের অধিকাংশ তো কারাগারে। আর যারা বাইরে রয়েছে তারা পলাতক। এ কারণে মুসল্লিদের সংখ্যা নগণ্য হওয়া স্বাভাবিক। আর ওদিকে মুক্তবাংলার তথাকথিত ফৌজরা নিশাচর হয়ে উঠেছে। এদের অধিকাংশের তো এখন ঘুমানোর সময়। অতএব পথঘাট জনশূন্য। আমরা মনে করলাম এও আল্লাহর মেহেরবাণী।

ইতোমধ্যে আমরা শহরের মধ্যে এসে গেছি। তখন ইতস্তত দোকান পাঠ খুলছে। কিন্তু সবারই চোখ আমাদের দিকে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। হয়তো ভাবছে, এমন প্রত্যূষে এরা কারা? আমার সাথীরা দেখতে শরীফ, সভ্য এবং নম্রতার প্রতীক। এদের ব্যাপারে পুলিশি তৎপরতা তো শেষ হয়েছে অনেক আগে। তাদের বিস্ময়ে হতবাক হওয়া স্বাভাবিক। এই সাত সকালে পুলিশের বেষ্টনীতে যারা এসে থাকে তারা তো আমাদের মত নয়। তেমন মস্তানি সুরত আমাদের কারো ছিল না।

আমরা পুলিশদের বললাম, 'আমাদের হাতের বেড়ী পড়িয়ে দিন। তা না হলে আপনাদেরকে কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে।' তারা ইতস্ততঃ করলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের কথা মত কাজ করল।

হাঁটতে আছি। কিছু কিছু মাসুম বাচ্চা বই নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম মক্তবে কোরআন পাঠ করতে যাচ্ছে। আমার মনে হ'ল এসব ছোট্ট শিশুদের বুকে টেনে নিয়ে বলি- 'আমরা আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করে তোমাদের জন্য এক নিরাপদ ভবিষ্যত রচনা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য দিয়ে জাতির ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনো।'

জেল গেটে এসে পড়লাম, দাঁড়িয়ে থাকতে হল বাইরে। কেননা তখন অফিসার নেই। এখন আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা না ঘরকা না ঘাটকা। অনেক্ষণ পরে অফিসাররা আসার পর আমাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। ঢুকেই দেখলাম পিডিপি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট মওলানা মুসলেহ উদ্দিন। তিনিও আমাদের মত একজন কারাবন্দী। তিনি পিডিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে আমাদের মত দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁকেও আজকের এই দুর্ভাগ্যকে বরণ করতে হয়েছে। তাকে দেখেই আমি সালাম দিলাম। তিনিও আমাকে পেয়ে দারুণ খুশী হলেন।

বাইরে থেকে নতুন যারা আমদানী হয় তাদের তদারকীর দায়িত্বে ছিলেন কিশোরগঞ্জ মহকুমা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জনাব মোশাররফ হোসেন সাহেব। আপাতত আমি তার হেফাজতে। আমি ভাবলাম মোটামুটি সময় আমার ভালই কাটবে। এখন আমি আমদানী খাতায় রয়েছি। নবাগতদের স্কুলে রাখা হত। স্কুল কেন বলা হত আমার জানা নেই। সেসব জানবার আগ্রহও আমার ছিল না। দুই রাত্রি আমাদেরকে সেখানে থাকতে হয়। মোশাররফ সাহেবের ওপর সবাই বিরূপ। বিরূপ হওয়া স্বাভাবিক। যা দেখলাম তাতে আমিও সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কারাগারে যে খাদ্য সরবরাহ করা হত সেটা একে তো নিম্নমানের এবং পরিমাণে কম। তা সত্ত্বেও সেই

স্বল্প পরিমাণ খাদ্যে কর্তা অর্থাৎ মোশাররফ সাহেব নিজের অতিরিক্ত ভাগ বসাতেন। এছাড়া স্বল্প পরিসর একটি কক্ষ। সেখানে প্রায় ২শ' লোক। পালা করে শোয়ার জায়গাও মেলে না। এতদসত্ত্বেও তাকে আমি দেখেছি, একটা বিরাট স্থান দখল করে তিনি রয়েছেন তার একার জন্য। আমি অবাক হলাম। জামায়াতে ইসলামীর মত আদর্শবাদী সংগঠনের নেতৃপর্যায়ের হয়েও তিনি কিভাবে এমন নির্মম, এমন নিষ্ঠুর হতে পারলেন? আমার সেদিনই মনে হল খোদার তরফ থেকে আমাদের জন্য এমন জিল্লতি নির্ধারিত হওয়ার এ সবই কারণ। কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষের তৎপরতা খোদার নিশ্চয়ই পছন্দ হয়নি। এর ফলে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের আবেগ-তাড়িত হয়ে, জীবনের সমস্ত কিছু কোরবানী দিয়েও দেশটাকে টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে অনেক অমানুষ এসেও মানুষের সাথে মানবিক আচরণ করতে থাকে। তার কারণ, সবার ভাগ্য এখানে এক সূত্রে গাঁথা। এমন এক স্থানে এসে মোশাররফ সাহেব যে আচরণের প্রদর্শনী করেছেন তাতে তার মত লোকেরা ক্ষমতাসীন হলে জাতির ভাগ্যে দুর্বিপাক ছাড়া কিছুই মিলবে না। তার সাথে এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে আমার মন চাইল না। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তার ব্যাপারে আমি জামায়াত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তা সত্ত্বেও তিনি এখন কিশোরগঞ্জ জামায়াতে ইসলামীর নেতা। এ দেখে মনে হল, আমীর মোয়াবিয়া যেন আমীরুল মোমিনীনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

যাই হোক, ২দিন পর আমাকে জেল সুপার মোফাখখারুল ইসলাম সাহেবের দপ্তরে তলব করা হল। আমি তার সম্মুখে উপস্থিত হতেই আমার দিকে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর যে আচরণ করলেন তা হল, তিনি যেন বিচারকের আসনে সমাসীন আর আমি এক অসহায় খুনের আসামী। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কয়টা মানুষ হত্যা করেছো?" তার প্রশ্নের ধরনে ভীষণ বিরক্তি অনুভব করলাম। জবাবও দিলাম একটু বাঁকা করে। বললাম- 'জবাবটা আমি আদালতে যথাসময়ে দেব। কারা কর্তৃপক্ষের কাছে নয়।' জবাব শুনে তিনি গর্জে উঠলেন। বললেন, 'তেজ তো এখনো কমেনি। জানো আমি কী করতে পারি?' জমাদারকে ডাক দিলেন। ডাক শুনে জমাদার এসে উপস্থিত হলে বললেন- 'এর পায়ে জুতো কেন?' জমাদার কাশেম আমাকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর জুতা খুলিয়ে আবার আমাকে আনা হল তার সামনে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী করতাম? বললাম- 'কলেজে পড়তাম।' তিনি বললেন- 'চেহারা সুরত তো ভদ্র ঘরের বলে মনে হয়। কিন্তু খুন-খারাবীর ফিরিস্তিও তো কম নেই।' বলে গেলেন নিজের

মনে, তারপর কাগজে কি লিখলেন সেটা আমার জানার কথা নয়। আমাকে স্কুল থেকে আনা হল হাজতী ওয়ার্ডে।

ওদিকে আদালতে আমার বিরুদ্ধে দায়েকৃত মামলার শুনানী শুরু হয়েছে। একই মামলায় আমাকে এবং মওলানা কুতুবউদ্দিন সাহেবকে আদালতে হাজির হতে হচ্ছে প্রত্যেক দিনই। আমার স্বপক্ষে মামলা পরিচালনা করেছেন এডভোকেট সাত্তার ও তাহেরউদ্দিন সাহেব। বাদী পক্ষে রয়েছে সরকারী পিপি, আওয়ামী লীগের এমপি এডভোকেট আবদুল হক। তিনি আলবদরের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষিপ্ত। তার দাপট তখন আদালতের স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে অশালীন ঔদ্ধত্যের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আমার স্বপক্ষের এডভোকেটকে স্বাভাবিকভাবে মামলার জেরা করতে দেয়া হয়। কিন্তু তিনি খানিকটা ভীত। কেননা আমার স্বপক্ষে তার বক্তব্য না জাতি তাকেও আসামীর পর্যায়ে টেনে আনে।

বিচারক তাঁর আসনে নির্বাক। ভীত-বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এমপি আবদুল হকের গর্জনে তার আসনটা কেঁপে উঠেছিল কিনা জানিনা, তবে রায়টা আমার বিপক্ষে দিতে সম্মানিত বিচারক বাধ্য হয়েছেন। তার কারণ ২০ বছর কারাদণ্ডের রায় শোনার পর যখন আমি 'আলহামদুলিল্লাহ' উচ্চারণ করি তখন তিনি অসহায়ের মত সকরুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর যখন হাতে কোমরে বেড়ী দিয়ে পুলিশেরা আমাকে কাঠগড়া থেকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত, তখন আমার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন- 'আপনি হাইকোর্ট করলে খালাস পাবেন।' তখন অবশ্য পিপি এডভোকেট আবদুল হক আদালতে ছিলেন না। এই একই মামলায় মওলানা কুতুবউদ্দিন সাহেবের ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এখন তিনি সিলেটে দরগা মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

আমাকে কারাগারে ফিরিয়ে আনা হল। এসে দেখলাম সকলে আমার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। ইতোমধ্যে প্রহসনমূলক বিচারের রায় তাদের কাছে পৌঁছে গেছে। আমাকে পেয়েই তারা অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে কোরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি তুলে ধরি 'ফাইন্নামায়াল উসরে ইউসরা, ইন্নামায়াল উসরে ইউসরা'- কষ্টের পরেই স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের পরে আছে স্বস্তি। আরও বললাম, 'মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে।' এই মেঘ এই আবর্ত একদিন কাটবেই, এখন প্রয়োজন ধৈর্যের। আল্লাহ এ পরীক্ষাই নিতে চান আমাদের কাছে।

এবার আমাকে অলংকার পরানোর পালা এল। বিচার প্রহসনে প্রমাণিত হয়েছে আমি খুনী। আমি এক দুর্ধর্ষ আসামী। আমাকে তো শিকল পরাবেই। কারাগারের ভাষায় ডাণ্ডাবেড়ী। সাড়ে সাতসের ওজনের সবচেয়ে ভারীটাই পরান হল আমাকে। এরপর আমাকে আনা হল জাহান্নাম থেকে হাবিয়ায়। অর্থাৎ সাধারণ ওয়ার্ড থেকে ফাঁসীর সেলে। সবচেয়ে মারাত্মক আসামীর জন্য এটি তৈরী। কারাগারের ভেতরে একটা ছোট্ট অন্ধকার প্রকোষ্ঠ, আমার স্থান হল এখানে। এখানে আমি একা, একান্ত একাকী। প্রকোষ্ঠের দরজা তালাবদ্ধ। এর পরেও একটি দরজা, সেখানেও তালা। তদুপরি সশস্ত্র সেন্ট্রী। আমাকে ঘিরে পুলিশী তৎপরতা দেখে আমার মনে হল, জেমস বন্ডের ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়ক আমি।

অন্ধ প্রকোষ্ঠে নির্লিপ্ত একাকী আমি। ভাল লাগছে, বড্ড ভাল লাগছে আমার। এখানে আমি যেন একান্তভাবে খোদার অস্তিত্বকে অনুভব করছি। অন্তর দিয়ে আমি ডাকছি তাঁকে। আমি যেন হৃদয়ের অনুভূতি ঢেলে তাঁকে স্পর্শ করছি। মনে হল আমার মালিকের নিবিড় সান্নিধ্য পেলে অনন্তকাল ধরে এই অন্ধ কুঠরীতে মোটেও কষ্ট হবে না আমার। আমার মওলার ইচ্ছার সাথে আমার ইচ্ছা একাকার হয়ে গেছে। আহ্, কি সুখ আমার! এখন আমার মনে হচ্ছে জ্বলন্ত লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে ইব্রাহিম (আঃ) হয়তো এর চেয়ে বেশী সুখে পেয়েছিলেন। লালনের ভাষায়, এ মরণ যে সুখের মরণ।

আবার আদালত আওয়ামী লীগের আদালত, মুজিব প্রশাসনের আদালত। সেই একই স্টাইল। সেই একই বিচার প্রহসন। আবার ২০ বছর। আওয়ামী লীগের এমপি এডভোকেট আবদুল হক বিচারকের ওপর ভর করেছেন। জ্বীনের আছরপ্রাপ্ত রুগীর মত মাননীয় জজ সাহেব এমপি আবদুল হক সাহেবের রায়টাকে প্রকাশ করলেন মাত্র। আমার মন মস্তিষ্কে এই রায়ের কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বলে মনে হয় না। হিন্দুস্তানী কূটচক্রের আবেষ্টনীতে যে প্রশাসন বাঁধা, সে প্রশাসন নিজেই তো অসহায়। প্রভুর মনোরঞ্জের জন্য ইসলামী চেতনার মানুষগুলোকে তারা বিপন্ন করবে এমন প্রত্যাশার বাইরে আমি কখনও কিছু ভাবিনি। আমার ফাঁসী হলেও অস্বাভাবিক মনে হত না। ৪০ বছর কারাদণ্ড বলতে গেলে খোদার এটা এক মেহেরবানী। ২শ' বছর আগে এমনি প্রহসন হয়েছিল মুর্শিদাবাদের আদালতে।

কারাগারের ভেতরে কারাগার। তার ভেতরে একটা ছোট্ট অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রেখেও আমাকে সাড়ে সাত সের ওজনের ডাণ্ডাবেড়ী থেকে মুক্ত করা হল না। নিদারুন

অস্বস্তির মধ্যে আমাকে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত ঘর্ষনের ফলে আমার পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হল। ডাণ্ডাবেড়ী থেকে মুক্ত হবার আবেদন করলাম। তাও নাকচ হল। অন্ধ কুঠুরীর নি-িদ্র অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখার অন্তহীন পিপাসা আমার অন্তরে জেগে উঠল। সে আলো মুক্ত পৃথিবীর সূর্যরশ্মি নয়। অক্ষমতার জন্য যে দীপশিখার ভার বহন করতে আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, পর্বত অস্বীকৃতি জানায় সেই কালামে পাক আল কোরআনের কিছু আলো চাই। আমার এই আবেদন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করলেন। তফসীরের জন্য নিয়োগ করা হল মুফতি মওলানা আবদুল হান্নান সাহেব (সিলেট) কে। মুফতী আল্লামা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম সাহেব (ময়মনসিংহ), মওলানা ইলিয়াস খাঁন (কিশোরগঞ্জ ইটনা) যথারীতি ১৯ নং ওয়ার্ডে সকাল-বিকাল দরসে কোরআন, দরসে হাদিসের বয়ান কারাবাসের শুরু থেকে করে আসছিলেন। পরবর্তীতে তাফসীর ক্লাসে যোগ দিলেন আমার সাথে অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, অধ্যক্ষ খলিলুর রহমান, বিগচান খান (শহীদ আবদুল মোনয়েম খান-এর ভাইস্তা), সেলিম দারোগাসহ আরও ৩ জন কারাবাসী পুলিশ অফিসার। এরা দালাল আইনের আসামী।

অন্ধ প্রকোষ্ঠে কারাবাসের দুটো বছর পেরিয়ে গেছে। অনেক দিন পর আমার আহত মানসিকতায় আনন্দের ছোঁয়া সকাল থেকে অনুভব করছি। কিন্তু কেন? আমি তখনও বুঝে উঠিনি। মনে হচ্ছে কি যেন আমি পেতে চলেছি। অনেক তপস্যা অনেক সাধ্য সাধনার পর হেরার গুহায় মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অন্তঃকরণে কিছু পাওয়ার পূর্ভাবাস পেয়েছিলেন। যা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে বিহ্বল করেছিল। আমার আবেগে তেমন আনন্দের আতিশয্য অনুভব করছি।

বেলা ১১টা। একজন সেন্ট্রী তালা খুলে জানাল- 'ভিজিটিং রুমে আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য লোক এসেছে। আপনি আমার সাথে আসুন।' আমি বিশাল বিস্তৃত অন্তহীন মরুতে একনাগাড়ে পথচলা পরিশ্রান্ত তৃষ্ণাবিধূর মুসাফির। সামনে অদূরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে মরুদ্যান-ওয়েসিস, আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি কাঁপছি, বালির সমুদ্রে পা আটকে যাচ্ছে বার বার। আমাকে আনা হল ভিজিটিং রুমে। আমার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী কিছু পেলাম। অনেক পাওয়ার আনন্দে আমি উদ্বেল, বিস্ময়ে বিমূঢ়, মুখের ভাষা মূক হয়ে গেছে। আমি দেখছি আমার পরম পাওয়াকে। আর হৃদয় দিয়ে গেলাসে গেলাসে পান করছি স্বর্গীয় সুখ। মা, আমার মা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আড়াই বছরের তৃষ্ণা আর চব্বিশ বছরের জমাট বাঁধা গভীর মমতা নিয়ে অশ্র"সজল চোখে ডাণ্ডাবেড়ী পরানো তাঁর সন্তানকে

গভীর আগ্রহে তিনি দেখছেন। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই নির্বাক। ফেলে আসা দুঃসহ দিনগুলোর সমস্ত ক্লেদাক্ত ব্যথা মা-সন্তান উভয়েই ভুলে গেছি। নীরবতা ভঙ্গ করে আমি ডাকলাম 'মা! মাগো।' এবার মায়ের চোখে অশ্র"র ঢল নামল, ফোঁটা ফোঁটা অশ্র"র অক্ষর সাজিয়ে মা যেন আমার অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আর্শীবাদের ফিরিস্তি লিখে চলেছেন। কাঁদছে মায়ের সাথে আসা আমার বিধবা বোন কাঞ্চন। তার কত আদর মমতা আর আশীর্বাদের স্পর্শ আমার গায়ে লেগে আছে তার হিসেব নেই।

আমি আবার ডাকলাম, মা। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি ভুল করেছি মা?' মায়ের স্পষ্ট জবাব- 'না।' বলতে থাকলেন - 'আর এটাই আমার বড় সান্ত্বনা। অন্তহীন ব্যথার দুঃসহ বোঝা নিয়ে আমি বেঁচে আছি এই ভেবে যে, আমার সন্তান কোনদিন অন্যায় অপকর্মে জড়ায়নি। হক আর বাতিলের সংঘাতে আমার কলিজার টুকরা আমার সন্তান হকের স্বপক্ষে জানবাজি রেখেছে। মানুষ এখন সব বুঝে। আমি দোয়া করি হকের স্বপক্ষে তুমি যেন চিরদিন মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পার। আল্লাহ যেন তোমাকে সার্বক্ষণিক ধৈর্যের তাওফীক দেয়। বাতিলের ধ্বংসস্তূপের ওপর হক আর ইনসাফের ঝাণ্ডা একদিন উড়বেই।'

মা আমার কাছে আরো কাছে এসে আমাকে স্পর্শ করে বললেন, 'বাবা আমার বুকটা শূন্য হয়ে আছে। শূন্য হয়ে আছে আমার বাড়ী-ঘর। তোমার ঘরের চারপাশে এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। তোমার কুকুরটাকেও ওরা হত্যা করেছে। তোমার বন্ধুরা এখন আর আসে না। অন্তহীন একাকীত্ব নিয়ে আমি একা তোমার মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন গুনছি। আর তোমার জন্য সবকিছু আগলে আছি।' মাকে বললাম- 'মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর তাফহীমুল কোরআন আর হাকীকত সিরিজের যে বইগুলো আছে, কেউ এলে তার হাতে পাঠিয়ে দিও।' মা এগুলো অনেক যত্ন করে মুক্তিফৌজের দৃষ্টির বাইরে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিলেন। মার সাথে সাক্ষাতের কিছুদিন পর আমার চাচাত ভাই খন্দকার বজলুর রহমানের হাতে বইগুলো পাঠিয়ে দেন। এই বইকটিকে পুঁজি করে আমরা কারাগারে সাংগঠনিক কাজ শুরু করি।

একদিন মামা জনাব হাজী আঃ হাসিম সাহেব মোমেনশাহী কারাগারে এলেন আমার সাথে দেখা করার জন্য। তিনি সদ্য মক্কা থেকে ফিরেছেন। হজ্জে যাওয়ার আগে তিনি চিঠিতে আমার প্রতি গভীর মমতার কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে, আল্লাহর

ঘর খানা-এ-কাবায় তিনি আমার জন্য দোয়া করবেন। আমার প্রতি তার প্রাণের গভীরে যে তীব্র অনুভূতি রয়েছে সেটা আমি জানতাম। এই মামা এবং তার স্ত্রী, আমার মামীর স্নেহমমতার ছায়া পরিবেষ্টিত ছিল আমার শৈশব। কৈশোর- যৌবনেও আমি তাদের স্নেহ-বঞ্চিত হইনি। রাজনৈতিক শঠতার শিকার হয়ে অন্ধ জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা আমি ধিকৃত হলেও আমার জন্য মামা-মামীর ছিল অপরিসীম দোয়া। আমার কারণে মামাকে লাঞ্ছিত হতে হয়, এমন কি তাকে হত্যা করার জন্য বধ্যভূমিতে নেয়া হয়। তার উদ্দেশ্যে গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু খোদার মেহেরবানীতে সবকটি গুলী কুদ্রতিভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। পরবর্তীতে তার গুণগ্রাহী প্রতিবেশী, মুক্তিফৌজ ও অন্যান্য মানুষের চাপে তাকে তার হত্যাকামীরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

কারাগারে আমার সাথে দেখা হতেই তিনি বললেন- 'এখনও তুমি ফাসীর প্রকোষ্ঠেও তোমার পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী। এটা থাকার কথা নয়। আমি তো খাস করে তোমার জন্য দোয়া করেছি। আমি ভেবেছিলাম। এসেই অন্তত তোমাকে ডাণ্ডাবেড়ী মুক্ত দেখব।' তখন তিনি আমাকে ডাণ্ডাবেড়ী মুক্ত না দেখলেও সময়ের স্বল্প ব্যবধানে আমি এ থেকে মুক্ত হই এবং অন্যান্য অসুবিধাগুলোও আমার দূর হয়। মামার পরহেজগারীর তুলনা হয় না। তিনি জামায়াতকে রাজনৈতিক সমর্থন দিতেন। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি ছিল তার অবিচল আস্থা।

একদিন শুনলাম ঢাকা থেকে কারাগারসমূহের ডিআইজি জনাব কাজী আবদুল আওয়াল সাহেব আসবেন। চারিদিকে মোটামুটি সাজ সাজ আয়োজন। এসেও পড়লেন একদিন। কারা পরিদর্শন করতে করতে অবশেষে আমার সেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সাথে আছেন জেলার এবং সব কয়জন ডেপুটি জেলার ও অন্যান্য অফিসার।

আমি সালাম দিলে তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য জমাদার কাশেম মুখ খুললেন। বললেন, 'স্যার এই যে আমিন। এই জেলের সবচেয়ে বড় টেরর। খুনের আসামী স্যার, বহু মানুষ খুন করেছে। ২টা কেসে ৪০ বছর জেল হয়েছে স্যার। এখানে এই সেলে আমরা খুব কড়া নজরে রেখেছি স্যার।" ডিআইজি সাহেব শুনে গেলেন কেবল। খুব খুশী হলেন এমনটি মনে হল না। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলেন- 'কি করতেন।' বললাম- 'ভৈরব কলেজে পড়তাম।' গভীর মমত্ববোধ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাইকোর্ট করেছেন?' বললাম- 'না'। আবার প্রশ্ন- কেন? বললাম- 'যারা করতে পারতেন তাদের অনেকে শহীদ

হয়েছেন। বাকী যারা রয়েছেন তারা পলাতক। তবে কেউ কেউ আশ্বাস দিলেও তারা তেমন কিছু আমার জন্য করেনি।' তিনি বললেন- 'আপনি তো ভেতর থেকেই করতে পারতেন।' বললাম- 'তা হয়তো পারতাম। কিন্তু বাইরের আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে সময় পেরিয়ে গেছে।' ডিআইজি দুঃখ প্রকাশ করলেন আর জিজ্ঞেস করলেন- 'আপনার কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে কি? বললাম অসুবিধাতো সবটাই। তবে সবচাইতে বড় অসুবিধা হচ্ছে এই ডাণ্ডাবেড়ী। এ নিয়ে নামাজ কালামও স্বস্তির সাথে পড়তে পারছি না।' ডিআইজি জেলারদের উদ্দেশ্যে বললেন- 'জেলার সাহেব! বেড়ীটা খুলে দিবেন।' জেলার আমিনুর রহমান সাহেব প্রত্যুত্তরে বললেন- 'স্যার অসুবিধা আছে।' ডিআইজি এ ব্যাপারে কোন পুনরুক্তি না করে শুধু বললেন, 'ঢাকা পাঠিয়ে দিন।' ডিআইজি সাহেব চলে গেলেন। সপ্তাহ গড়িয়ে গেছে। একদিন জানলাম আমাকে, মোঃ ইউছুফ আলী ভাইকে ঢাকা জেলে স্থানান্তর করা হবে। মোঃ ইউসুফ আলীও আলবদরের সদস্য ছিল। তারও ২০ বছর কারাদণ্ড হয়। তারিখটা '৭৪-এর ১৭ জানুয়ারী। বেলা ১০টায় আমাদেরকে কারাগার থেকে বের করা হল। বেরিয়ে দেখলাম সংগঠনের কে এম মঞ্জুর এলাহী ভাই সহ নবীন কর্মীরা আমাদেরকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। সিপাহীরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বললেন, 'কাছে কোন আত্মীয়-স্বজন থাকলে তাদের বাসা বেড়িয়ে যেতে পারেন। তখন সংগঠনের ভাইয়েরা আমাদের মৃত্যুঞ্জয় রোডে জামায়াতে ইসলামীর একজন রুকন নোয়াখালীর রব সাহেবের বাসায় নিয়ে এলেন। সেখানে খাওয়া দাওয়া করলাম, খোলামেলা অনেক আলাপ আলোচনা হল। জানলাম মুজিবের বেসামাল অবস্থা। গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভীতি সঞ্চার করে যতদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে। একাত্তরে যে হাতগুলো মুজিবকে জীবন্ত ফিরে পাওয়ার জন্য দোয়া করেছিল সেই হাতগুলো খোদার কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, অভিসম্পাত দিচ্ছে খুনী মুজিবকে।

বিকেলে স্টেশনের দিকে রওয়ানা হলাম। ট্রেন আসতে তখনও দেরী। অনেক পরিচিত মানুষ অনেক চেনামুখ চোখে পড়ছে। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছিলাম। পুলিশরা আমার পাশেই বসা। দেখলাম একটা তরুণ ছেলে আমার দিকে এগিয়ে এল। এসে জিজ্ঞেস করল 'আমিন দা, আমাকে চিনছেন?' অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। আমার অতীত স্মৃতি রোমন্থন করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু না আমার পরিচিত কোন আদলের সাথে এ চেহারার মিল নেই। বললাম- 'নাতো ভাই, আপনাকে তো চিনছিনা।' তরুণটি আহত হল যেন। একটু কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল-'আমি কোমল

রায়।' বললাম- 'বেশ জোয়ান হয়ে গেছতো! আর বলোনা ভাই এ কয়টা বছর যে ধকল গেছে আমিতো আমাকেই ভুলে গেছি। কিছু মনে করো না।' কোমল আমাকে ভাল ফুটবল প্লেয়ার হিসেবে জানে। ও আমার দারুণ ভক্ত ছিল এককালে। সে নিজেও ভাল খেলোয়াড় হওয়ার জন্য কসরত চালাত। জিজ্ঞেস করলাম।- 'খেলাধুলা চলছে তো তোমার?' বলল- 'চলছে, কিন্তু সেই আগের মত কি আছে দাদা। এখন সবাই যার যার তার তার। মানুষ যেন সব কেমন হয়ে গেছে।'

বলতে ইচ্ছে হল, এখনি কী হয়েছে! কেবল তো শুরু। অথচ আমাদের রক্ত লোলুপ ধর্মোন্মাদ ও মৌলবাদী যুদ্ধাপরাধী বলে চিহ্নিত করার জন্য প্রতিপক্ষরা কতইনা প্রচার চালাচ্ছে। আমরা জাতীয় আদর্শ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুশীল করার চেষ্টা করি, এটাই আমাদের অপরাধ। কোন হিন্দু অথবা অন্য কোন সংখ্যালঘু এমনকি কেউ আছে যে হলপ করে বলতে পারে, আমরা তাদের সাথে অসামাজিক অথবা অন্য কোন খারাপ আচরণ করেছি? এটা প্রচারণা। শুধুমাত্র মিথ্যা প্রচারণা। ভারতের তথাকথিত প্রগতিশীল বাবু ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এদেশের অভিজাত হিন্দুরা তাদের গোয়েবলসীয় প্রচারণার দ্বারা এদেশের হিন্দু সমাজকে অশান্ত উদ্বেল করে তুলেছে। এদের বিরূপ করে তুলেছে মুসলমানদের ওপর। এদেশের মাটিতে বসবাস করেও গণমানুষের সাথে একাকার হতে পারছে না এরা। আর এদেরকে উত্তেজিত করে এবং এদের মনমানসিকতায় কাল্পনিক ভীতির সঞ্চার করে হিন্দুস্তানের মদদপুষ্ট কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক চক্র তাৎক্ষণিক ফায়দা নেবার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরাই কৃত্রিম দরদ, মমত্ববোধ আর পৃষ্ঠপোষকতার আবরণে সামগ্রিভাবে হিন্দুদের জন্য কাঁটার শয্যা রচনা করছে।

ট্রেন এসে গেল। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় উঠলাম। দেখলাম সেখানে আরও কিছু পুলিশ অফিসার আগে থেকেই বসেছিলেন। তারা আমার পরিচিত, এক সময় খুব কাছাকাছি ছিলাম আমরা। যখন কিশোরগঞ্জের পুরো দায়িত্বটা ছিল আমার উপর, তখন তাদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তারা আমাকে জানে। জানে আমার ভেতর-বাহির। আমাকে দেখেই হাসিমুখে অভিবাদন জানালো। খুনের আসামী আমি, আমার কোন এক সময়ের পুরনো সহযোগীদের কাছে পেয়ে বেশ ভাল লাগল। মনে পড়ল আমার সংগ্রামী দিনগুলোর বিক্ষিপ্ত স্মৃতি। এরাও তো হিন্দুস্তান যেতে পারত। কিন্তু না, ভুল করেও ওদিকে পা বাড়ায়নি। জাতীয় ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিণতির কথা ভেবেই সম্ভবত তারা এমনটি করেনি। উৎকোচ সংক্রান্ত পুলিশদের স্বাভাবিক অসংযমী আচরণের বহিঃপ্রকাশ যুদ্ধকালীন ৯ মাস তাদের মধ্যে দেখিনি।

তারা যা কিছু করেছেন নেহায়েত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। তারা আমার সাথী পুলিশদের বলে দিলেন যাতে আমার কোন অসুবিধা না হয়। বললেন- 'তোমরা যদি আমিন সাহেবকে সত্যি খুনের আসামী মনে করে থাক তাহলে ভুল করবে। উনি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের এক নিষ্ঠুর শিকার আমরা তাকে দেখেছি অত্যন্ত কাছে থেকে, আমরা তাকে জানি। তোমরা ছেড়ে দিলেও উনি পালাবেন না।' পুলিশরা জবাব দিল, "স্যার, মানুষ নিয়েই তো আমাদের কারবার, প্রকৃত ক্রিমিন্যাল চিনতে কি আমাদের ভুল হয় স্যার। উনাকে জিজ্ঞেস করুন, তার সাথে কোন বেয়াদবী করেছি কিনা?'

রাত তখন ১১টা এসে পৌঁছলাম কমলাপুর স্টেশনে। কালের সাক্ষী এই কমলাপুর স্টেশন। স্টেশনের সেই আগের জৌলুস নেই। জেল্লা ফিকে হয়ে গেছে। লাবণ্যের কোথায় যেন ঘাটতি মনে হচ্ছে। আরও দেখলাম, শত শত ছিন্নমূল মানুষ। কঙ্কালসার মানুষগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে-বসে আছে। জীবন যুদ্ধে পরাজিত মানুষের ভিড় এখানে। শেখ মুজিবের প্রতিশ্র"ত গণমানুষের কল্পিত সোনার বাংলা'র বিবর্ণ চেহারা দেখে আমি আহত হলাম দারুণভাবে। এই স্টেশন, এশিয়ার বৃহত্তম স্টেশন। শেখ মুজিব গংরা যাকে বড় দালাল হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন, যুদ্ধকালীন সময়ে যিনি কোন ভূমিকা না রাখা সত্ত্বেও রুশ-ভারত চক্রের হাতে নির্মম ভাবে শহীদ হয়েছিলেন, সেই সাবেক গভর্নর শহীদ আবদুল মোনয়েম খানের অবদান এই স্টেশনটি। কালের আবর্তে এই স্টেশনই মুজিবের তথাকথিত সোনার বাংলার ছিন্নমুল মানুষগুলোর শেষ আশ্রয়স্থল।

স্টেশন থেকে রিক্সাযোগে মতিঝিলের দিকে এগুলাম। মতিঝিল এজিবি কলোনীতে রয়েছেন আমার ভগ্নীপতি সার্ভে অফিসার জনাব জসিমউদ্দিন আহমেদ। বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। কড়া নেড়ে কোন সাড়া পাচ্ছি না। পরে আমার নাম বলাতে এবং ভেতর থেকে গোপন সতর্ক পর্যবেক্ষণের পর দরজা খুললেন। পরে জানলাম রাজধানী ঢাকা সন্ত্রাস, ডাকাতি আর রাহাজানীর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এসব অপকর্মের নেটওয়ার্ক জাতির পিতার উত্তরসূরী জাতীয় রতœ শেখ কামালকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। আল-কোরআনের একটি আয়াত মনে পড়ল- 'প্রত্যেক জিনিসই তার উৎসের দিকে ফিরে যায়।' শেখ মুজিবের সোনার বাংলা চোরের খনিতে পরিণত হয়েছে; তার ভাষায়- 'আমি ডানে তাকালে চোর, বামে তাকালে চোর, যেদিকে তাকাই সেদিকেই চোর।' আয়নার সামনে দাঁড়ালে কি দেখেন তা অবশ্যি তিনি বলেননি। যাইহোক, মানুষ সন্ত্রাস ও ভয়ঙ্কর ভীতির মুখোমুখি।

রাত হলে মানুষ ঘর থেকে বেরুতে চায় না আর একটু বেশী রাত হলে দরজা খোলার তো প্রশ্নই উঠে না।

দীর্ঘ চার বছর পর দুলাভাইয়ের সাথে আমার দেখা ইতোমধ্যে বুড়িগঙ্গায় কত পানি গড়িয়ে গেছে। বিবর্তনের গতিধারায় কত মানুষ কতভাবে পাল্টে গেছে। কিন্তু আমার ফুফাত বোনটা যেন আগের মতই সেই মমতার মূর্ত প্রতীক। বিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি তাঁর মধ্যে। বড় ভাল লাগল। মাত্র দুটি বছর অথচ দুটো যুগ পর যেন আমরা এমন কাছাকাছি এসেছি। তাও একটি মুহূর্তের জন্য। আবেগের আতিশয্যে বোন-দুলাভাই দু'জনে একইভাবে উদ্বেল। মাত্র একটি মুহূর্ত, এর মধ্যে কত কথা, কত আদর-আপ্যায়ন, কত আলাপ আলোচনা। বড় ভাল লাগল। রাত ১২টা বিদায় নিলাম।

রওয়ানা হলাম টিকাটুলীর দিকে। উদ্দেশ্য চাচা-মামার বাসা। চাচা খন্দকার মোহাম্মদ ইসমাইল ফুডের ডেপুটি ডাইরেক্টর। ডেকে তুললাম। চাচা আমাকে পেয়ে কি দারুণ খুশী চাচার স্নেহ মিশ্রিত সংলাপে বাবার স্নেহসুলভ আচরণের কথা মনে পড়লো। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। পিতার সহোদরকে মনে হল যেন আমার সেই হারানো পিতা, আমার সম্মুখে বসে আছেন। প্রাণ খুলে আলাপ করলাম। মনে হল কতকাল মহাকাল পেরিয়ে এসে এমন প্রাণের স্পর্শ পেলাম আমি। পাশে মামার বাসা। মামা সফিউদ্দিন আহম্মদ সাহেব অবসরপ্রাপ্ত সিও (ডেভ)। তিনিও এলেন। আত্মীয় পরিজনদের উচ্ছ্বসিত স্নেহের বারিধারায় আমার আত্মা সিক্ত হয়ে উঠল।

রাত গভীর। সময়ের পরিসর স্বল্প অথচ এরই মধ্যে রান্না হয়ে গেছে। আমার সাথী পুলিশদের সাথে নিয়ে খেতে বসলাম । কি যে ভাল লাগছে। মাতৃত্বের গন্ধ মিশে আছে এ রান্নায়। চাচী নিজ হাতে রান্না করেছেন। মা চাচীতে পার্থক্য আর কতটুকু! বাড়ীর রান্না, দারুণ খেলাম। তৃপ্তিতে মন প্রাণ ভরে গেল। চাচা চাচী দু'জনের সাথে কথা বললাম। এত সময় ধরে এমন করে কোনদিন তাদের সাথে মুখোমুখি আলাপ করিনি। ফজরের আযান তখনও হয়নি। তবে বাকীও তেমন নেই। এবার বিদায় নেয়ার পালা। চাচাও আমাদের সাথে বাইরে এলেন। চাচার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে কণ্ঠ জড়িয়ে এসেছিল, বাষ্পরুদ্ধ ছিল তার শেষ কথাগুলো।

পথে বেরিয়ে পড়লাম। বেশ কিছু পথ হাঁটতে হল। তারপর রিক্সা পেয়ে গেলাম। এসে পৌঁছলাম কেন্দ্রীয় কারাগারে। পথেই ফজরের আযান শুনেছি। নামাজের সময় আসন্ন। অজু করলাম। নামাজ পড়লাম পুলিশ ব্যারাক মসজিদে। আত্মীয় পরিজনদের

সান্নিধ্য পাওয়ার আনন্দের রেশ রয়ে গেছে বলে সফরে ক্লান্তি কাহিল করতে পারছে না। ভোরের নির্মল হাওয়া উল্লসিত হয়ে দালানে দালানে ঠোকর খেয়ে ফিরছে। আর মাঝেমাঝে কারো সাজানো ফুলের বাগান থেকে সুরভী ছিনতাই করে দস্যু বাহরামের মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে সবার মধ্যে। হাসনাহেনার আতরদানি নিঃশেষ হয়নি তখনও। খু-উব ভাল লাগছে আমার। মনে হচ্ছে এই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি গান ধরি। 'ঐ দূর দিগন্তে ডাক এল, ডাক এল, ডাক এল। স্বর্ণ ঈগল পাখা মেল, পাখা মেল, পাখা মেলরে।' স্বর্ণ ঈগলের ডানায় অফুরন্ত শক্তি থাকলেও পা তো শেকলে বাঁধা।

আমি বাহির থেকে কারাগার দেখছি, যেমন করে গোরস্থান দেখে মানুষ। জীবনে চল্লিশটি বছর এখানেই কাটবে আমার। অবশিষ্ট আর কতটুকু থাকবে আমার জন্য। হয়তো একদিনও নয়। কারাগারকে গোরস্থান মনে করা আমার জন্য অযৌক্তিক নয়। একটু পরেই আমি কেন্দ্রীয় কারাগরের বাসিন্দা হব। অতএব বাইরের চলমান পৃথিবীটাকে একটু ভাল করে দেখে নিই। হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখতে চাইলাম। সাথী পুলিশদের কোন আপত্তি ছিল না। ওতে ওরাও আমার সাথে সাথে হাঁটছে। হেঁটে হেঁটে ঘুরলাম নামিজউদ্দিন রোড, চকবাজার, বখশিবাজার, উর্দু রোড। দেখলাম এত ঝড়ের মধ্যেও উর্দু রোড তার অস্তিত্ব ঠিকই বজায় রেখেছে। জিন্নাহ্ এভিন্যু বঙ্গবন্ধু এভিন্যু হয়েছে। ইকবাল হল জহুল হক হল হয়েছে। পাকমোটর বাংলামোটর হয়েছে। কেবল মাত্র উর্দু রোড বাংলা রোড হয়নি, হয়তো বা এটা আওয়ামী লীগের হিসেবের বাইরে রয়ে গেছে।

দেখলাম জেলখানার আশেপাশে অনেক মানুষের ভিড়। এরা সব ঢাকার কুট্টি। আমাদেরকে এই সাত সকালে শেকল বাঁধা অবস্থায় ঘোরা-ফেরা করতে দেখে অনেকে এগিয়ে এল। আগ্রহ সহকারে জানতে চাইল। বললাম সবকিছু। জনতা উত্তেজিত, সবার মধ্যে পুঞ্জীভুত ক্ষোভ। বলল- 'আমাদের খাজা খায়রুদ্দিন সাহেবকেও শালা হিন্দুস্তানের দালালরা আটকে রেখেছে ভাইজান, চিন্তা করবেন না কিছু। শালারা বেশি দিন আটকে রাখতে পারবে না। আপনাদের আমরা জেলের দরজা ভেঙে বের করে নিয়ে আসব।'

পুলিশরা একটু ভয় পেয়ে গেল। এ অবস্থায় আর এদের কাছাকাছি আমরা দু'জনকে রাখা সমীচীন মনে করল না। আমরা দু'জনকে সাথে নিয়ে উত্তেজিত জনতার কাছ থেকে সরে গেল। বুঝলাম, হাওয়া বদলাতে শুরু করেছে। আবারও ঘুরলাম। ঘুরে ঘুরে দেখলাম সবকিছু। এক ফাঁকে নাস্তাও করলাম।

শেষ বারের মত এক কাপ করে চা খেয়ে কারাগারের প্রধান ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কারা কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করা হল বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতরে পা রাখলাম। আমাদের সাথী পুলিশরা তাদের কাগজপত্রের কাজ সেরে বিদায় নিল। যাবার আগে শেষবারের মত আমাদের সালামত কামনা করে আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে গেল। এবার আমাদেরকে নিয়ে আসা হল কেস টেবিলে। এখানে আমাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হল। কেস টেবিলের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে কেস টেবিলের চীফ রাইটার কামরুজ্জামান ভাই এসে আমাদের সাথে কুলাকুলি করলেন। এক মহান ভ্রাতৃত্বের আবেগ অনুভূতি লক্ষ্য করলাম। আমরা একই আন্দোলনের শরিকদার। এরপর এলেন তাহের ভাই, সৈয়দ মোহাম্মদ নূরুল হক ভাই ও আজহারুল ইসলাম ভাই। সবারই একই অনুভূতি। এই অনুভূতি দেখে আমার মওলানা আবুল কালাম আযাদের একটি লেখার কথা মনে পড়ল। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন- 'সুদূর মিশরেও যদি কোন মুসলমানকে ফাঁসী দেয়া হয় আর তার দাগ যদি হিন্দুস্তানের মুসলমানদের গলায় না দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে ইসলামী অনুভূতি বেঁচে নেই।' এত বড় একটা ঝড়, এত বড় একটা পট- পরিবর্তনের পরেও আমাদের ইসলামী উখুওয়াতে চিড় ধরেছে বলে মনে হল না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কামরুজ্জামান ভাই বর্তমান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ- এর কেন্দ্রীয় নেতা।

কেস টেবিলে কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দেয়া হল। পা দুটো দারুণ হাল্কা অনুভূত হল। পা মাটিতে রাখতেই পৃথিবীটার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কিছু অভাব মনে হল। আসলে সাড়ে সাত সের ওজনের বোঝা কমে যাওয়ার জন্যই এমন মনে হচ্ছিল। সদ্য হাঁটতে শেখা বাচ্চাদের মত বিক্ষিপ্ত হাঁটলাম কিছুক্ষণ। এরপর কামরুজ্জামান ভাই আমাকে ১০ সেল ডিভিশনে পৌঁছে দিলেন। এখানে এসে দেখলাম শ্রমিক নেতা রুহুল আমিন ভূঁইয়া, জাসদের আকরাম ও মেসবাহ, বর্তমান মন্ত্রী পরিষেদের সদস্য (এরশাদ মন্ত্রীসভা) সিরাজুল হোসেন খান; নারায়গণগঞ্জ মুসলিম লীগ নেতা হাজী রফিক, কালীগঞ্জের শাহজাহান চেয়ারম্যান এবং সাবেক ওসি ইউসুফ চৌধুরী আগে থেকে এখানে অবস্থান করছেন। আমি নিজেই তাদের সাথে পরিচয় করে নিলাম। বিভিন্নমুখী স্রোত এক মোহনায় এসে আমরা একাকার। ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শী মানুষ আমরা এক পরিবারের মত এখানে অবস্থান করছি। সেলের ২০ জনের এক চুলায় রান্না, একই রকম খাওয়া দাওয়া, কোন রকম বিরোধ- অন্তর্বিরোধের চিহ্ন এখানে নেই। অথচ এই মানুষগুলো বাইরের মুক্ত আলো বাতাসে

পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। একে অপরের উপর মারমুখো। কিন্তু কেন? এই কেন- র জবাব আমি খুঁজে পাই না। তবে মনে হয় বাইরের পৃথিবীতে এসে মানুষের স্বতন্ত্র সত্তার বিলোপ ঘটে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন নেপথ্য সূত্রে বাঁধা পড়ে। ফলে দৃশ্যপটের আড়াল থেকে বাইরের শক্তিসমূহ সূতোর টান দিয়ে নাচাতে থাকে সকলকে। সুস্থ স্বাভাবিক মানসিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে লিপ্ত হয়। আল্লাহর পথে ফিরে আসা ছাড়া এই সংঘাত, এই রক্তপাতের অবসান কোন দিনই হবে না।

বর্তমান সরকারের মন্ত্রী সিরাজুল হোসেন খান আমাদের সাথে ৬ মাস কাটিয়েছেন। তিনি ডারউইনের বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। তার মাথায় তখন গিজ গিজ করছিল সমাজতন্ত্রের তত্ব। সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে তার বিবেক অন্ধ ছিল। শয়নে- স্বপনে, বিশ্রামে- জাগরণে সব সময় সমাজতন্ত্র। সমামজন্ত্রের ভূত যেন তার ওপর ভর করেছে। আমাদের মধ্যে যারা অগ্রজ, যারা লেখাপড়া আর পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে তার চেয়ে খাটো নয়, তারা কারাবাসের অফুরন্ত অবসরে তার মাথার সেই ভুত ছাড়ানোর তদবীর করত। কিন্তু সেই তদবীরের ফলে সমাজতন্ত্রী ভূত তার মাথায় আরও পাকাপোক্ত হয়েছে কিনা জানিনা তবে চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে তাকে একই অবস্থানে দেখেছি। বিবর্তনবাদ তার মাথায় এসে স্থির হয়ে গেছে। আর কোন ক্রমবিকাশ ঘটছে না। মেজাজের ভারসাম্য তার ছিল না। এটা সম্ভবত তার স্বাস্থ্যগত কারণে। তবে আমার সাথে তার সম্পর্কটা সখ্যতার পর্যায়ে ছিল। আদর্শের দিক দিয়ে আমাদের সাথে তার মিল না থাকলেও আওয়ামী লীগ ও ভারত বিরোধী মনোভাবের দিক দিয়ে ছিলেন আমাদেরই মত একই অবস্থানে। বর্তমানে তার রাজনৈতিক অবস্থান যাই হোক না কেন অতীতে তার ত্যাগ ও তিতীক্ষার ইতিহাস আছে।

একদিন দেখলাম, আল্লামা দেওয়াল হোসেন সাঈদী কারাগারে এলেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ। খুলনার কোন এক জলসায় তার মুনাজাতকে কেন্দ্র করে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পাবনার মনসুর আলী তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর প্রতি ক্যাপটেন মনসুর আলীর আক্রোশ অনেক আগের। পাবনা সবসময় ছিল আওয়ামী লীগের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। অনেক দেশপ্রেমিক মুসলমানের রক্তে পাবনা আওয়ামী লীগ কর্মীদের হাত রাঙা। সেই সন্ত্রাসী পাবনায় আওয়ামী লীগের আধিপত্যের ভিতকে নাড়াতে সক্ষম হন দেলওয়ার হোসেন সাঈদী। এজন্য তাঁকে তাঁর জীবনের মারাত্মক ঝুঁকি নিতে হয়। তাঁর সুললিত কণ্ঠের বিপ্লবী তফসীরের মাধ্যমে তিনি আওয়ামী লীগের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে আওয়ামী লীগ বিরোধী চেতনার লাভা ঢালতে সক্ষম হন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর ক্যাপটেন মনসুর সেই সুযোগটা নিতে ভুল করেননি।

আমি এবং সাবেক এনএসএফ প্রধান সৈয়দ নেসার নোমানী সবরকম চেষ্টা চালিয়ে দেলোয়াল হোসেন সাঈদীকে ১০ সেল ডিভিশনে আমার সেলে থাকার ব্যবস্থা করলাম। তার মত চিন্তাশীল এবং প্রভাবশালী মানুষকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের সাথে রাখা মোটেও সঙ্গত হয়নি। কিন্তু না রাখলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুরের ক্ষোভ আর জিঘাংসা নিরসন হয় কী করে? সাঈদী সাহেব আমাদের সেলে আসাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হল। তার সাহচর্যে থেকে কোরআন হাদিসকে আরও বিস্তৃত জানার সুযোগ হল। সকাল বেলা ফযরের নামাজের পর ১০ সেল ডিভিশনের সকলেই তার সাহচর্য নেবার চেষ্টা করতেন। তফসীর ছাড়াও তিনি ইসলামের বৈপ্লবিক দিক নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার অবতারণা করতেন।

দেলওয়ার হোসেন সাঈদী সাহেবের নিকট-সাহচর্যে তাঁর সাথে আমার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সুবাদে একদিন প্রস্তাব করলাম-সাঈদী ভাই, আমরা তো বাতিলের সাথে সংঘাতের মুখোমুখি। এ সময় মস্তিষ্ককে সংবেদনশীল রাখলেই শুধু চলবে না শরীরটাকেও সবল আর ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন করা দরকার।' উনি বললেন- 'তাতো ঠিকই। আমি মজলিসি মানুষ হয়ে বিপদ হয়েছে। তাছাড়া সফরে সফরেই আমার সময় কাটে। শরীর দেখব কখন।' আমি বললাম-'এর মধ্যেই সময় করতে হবে। তা না হলে বাতিল শক্তির কাছে আপনি সহজলভ্য বস্তুতে পরিণত হবেন।' তিনি একমত হলেন। আমি ব্যায়ামের প্রস্তাব দিলে তিনি রাজীও হলেন। সময় ঠিক হল, বাদ মাগরিব। এই সময় বেছে নেয়ার কারণ, সেলগুলো তালাবদ্ধ হলে নিরিবিলি পরিবেশ পাওয়া যায়। ব্যায়াম অনুশীলন শুরু হল। আমি তো যথারীতি করেই থাকি। সাঈদী ভাই আমাকে অনুসরণ করলেন। পরপর একই নিয়মে চললো কয়দিন। কিন্তু তারপর! তারপর তিনি শয্যাগত। ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া। ভীষণভাবে, দারুণ শরীর টাটানি, হাত পা ফুলে একাকার। নাড়াচড়া তার জন্য কষ্টদায়ক হয়ে উঠল। পরদিন সকালে আমার সেলে তার ভক্তদের ভিড়। সবার জিজ্ঞাসা, হুজুরের হলোটা কি? সাঈদী ভাই লা-জবাব। সিপাহসালারের এমন দুরবস্থা সত্যি পীড়াদায়ক। সাঈদী ভাই লজ্জায় কাউকে কিছু বললেন না। শেষে কেউ যদি বলে বসে, বুড়ো বয়সে ভীমরতি! ব্যায়াম-ট্যায়াম তো উঠতি বয়সের ছেলে-ছোকরাদের জন্য! যদিও সেটা সত্যি নয়। সাঈদী ভাইয়ের কষ্ট দেখে আমি নিজেকে অপরাধী মনে করলাম। তার শারীরিক অবস্থা ঠিক হতে সময় লাগল বেশ কয়দিন। এরপর ব্যায়ামের ধারে কাছে যেতে সাঈদী ভাই সাহস করলেন না।

এর আগে মালেক ক্যাবিনেটের মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় ১০ সেলের সামনে একটি পরিত্যক্ত ঘর জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নামাজের জায়গা হিসেবে চালু করেন। একই সাথে তফসীর ক্লাসের ব্যবস্থা হয়। শুরুতে পালাক্রমে মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, মওলান মোহাম্মদ মাসুম, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ তফসীর করতে থাকেন। সেখানেই আমরা প্রত্যেক দিন বিকালে সাঈদী ভাইয়ের তফসীর শোনার আয়োজন করি। ব্যায়াম ঘটিত অসুস্থতার কারণে কয়েকদিন বন্ধ থাকলেও আবার যথারীতি চালু করা হয়। একদিন তফসীর প্রদানকালীন সময়ে অফিস রাইটার এসে মওলানার হাতে তার ছাড়পত্র দিলেন। মওলানা আনন্দের আতিশয্যে আর তফসীর করতে পারলেন না। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে গেলেন। মুক্ত আলো বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য তার এত তাড়া। চলে গেলেও তিনি আমাকে ভুলেননি। পরে এক সময় আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন।

কারাগারে সাঈদী ভাইকে ঠাট্টাচ্ছলে বলতাম, 'সাঈদী ভাই, কারাবাসের পর তো আপনি আলেমদের মধ্যে শীর্ষে এসে যাচ্ছেন। তখন তো এই অধম কারাসঙ্গীদের কথা আপনার মনে থাকবে না।' কোন জবাব দিতেন না। শুধু হাসতেন, লাজ বিনম্র হাসি।

পাকিস্তান আমলে আমরা তাকে কেউ জানতাম না। বায়াত্তরের জাহেলিয়াতের অন্ধ তমসায় গোটা দেশ ছেয়ে গেলে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ইসলামের মশাল হাতে নিয়ে দেশের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত উল্কার মত ছুটে বেড়িয়েছেন। বন্দুকের নলের মুখে ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ করেছেন। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রে ভাসছিল কেবল মাত্র সাঈদীর ছোট্ট একটি ডিঙ্গা, বৈঠা হাতে তিনি উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে ইসলামের ছোট্ট কিস্তী নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন। মিনারে মিনারে আযান দিয়ে সম্মোহিত জাতির চেতনা ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু যখন তন্দ্রার ঘোর থেকে গোটা জাতি জেগে উঠল তখন আর সেই নকীব সাঈদী ময়দানে নেই। কি এক অন্ধ মোহে বিপ্লবের পথ পরিহার করেছেন। আয়েশী জীবন যাপনের মধ্যে দিয়েই তিনি আল্লাহর কাছে নাজাত প্রাপ্তির সহজ পথ সন্ধান করছেন।

জেল থেকে বেরুবার বেশ কিছু পর অষ্ট্রগ্রাম ও বাজিতপুরে ইসলামী সম্মেলনের জন্য দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশে আমি ও সাবেক গভর্নর শহীদ মোনয়েম খানের ছেলে কামরুজ্জামান খান ভাই টেলিফোনে যোগাযোগ করে তাঁর বাসায় উপস্থিত হই। ভেতরে ঢোকার সময় দেখলাম সুন্দর একটা কোরআনের

আয়াতের স্টিকার লাগানো। যেসব ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে বিলি করা হয়। আমন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হলে আমি সাগ্রহে ইরানের বিপ্লব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি। জবাবে তিনি বলেছিলেন ইরান বিপ্লব নির্ভেজাল ইসলামী বিপ্লব। আমি ইরান সফরের সময় ঘুরে ঘুরে দেখেছি। বলতে গেলে ইরানের বিপ্লবকে বাজিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি। যে কোন স্থানে বেড়ানোর সুযোগ ইরান আমাকে দিয়েছিল। আমি সর্বস্তরের জনগণের সাথে মিশেছি, তাদের সাথে কথা বলেছি, তাতে মনে হয়েছে, জনগণের অন্তর থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পর্যন্ত ইসলাম একটা বিপ্লব সাধন করেছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি যে কোন দিক নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিপ্লবের ছোঁয়া একইভাবে লেগেছে।' সেদিন তাঁর এই উপলব্ধিটা দারুণভাবে ভাল লেগেছিল। ইরান থেকে নিয়ে আসা শতাব্দীর সফল ইসলামী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাঈদী সাহেব ছড়িয়ে দিতে পারতেন। নির্যাতিত মানুষের সিনায় সিনায় ছড়িয়ে দিতে পারতেন নতুন বিপ্লবের ফয়েজ। কোটি কোটি তন্দ্রাচ্ছন্ন আত্মার অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর যথেষ্ট ছিল। দেশের নিগৃহীত নিষ্পেষিত জন-মানুষের ঢল রাজপথে নামাতে পারতেন এই দেলওয়ার হোসেন সাঈদী। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই জাতির; কোন এক নেপথ্য হাওয়ার স্পর্শে বিপ্লবীকণ্ঠ সাঈদীর চোখেই এখন তন্দ্রার ঘোর।

একদিন দেখলাম মেজর (অবঃ) জয়নাল আবেদীন কারাগারে এলেন। আওয়ামী লীগের বিরোধী ভূমিকা নেয়ার জন্য তার এ কারাবাস। তিনি আমাদের কাছাকাছি ২৬ সেল ডিভিশনে থাকতেন। মুক্তিযুদ্ধে তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তিনি শেখ মুজিবর রহমান, আওয়ামী লীগ ও হিন্দুস্তানের কট্টর সমালোচক। প্রাসঙ্গিকভাবে সর্বশেষ মুগল সম্রাট বাহাদুরশাহের গজলের একটি কলি মনে পড়লো- 'সবকুছ লুটাকে হুঁশমে আয়ে তো কিয়া কিয়া- সবকিছু হারিয়ে চেতনা এলে আর কী হবে'? মীরজাফরের সহযোগী মীর কাসিম তার জীবন দিয়েও বাংলার সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবু আহত বিবেক তাদের তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। মেজর (অবঃ) জয়নাল আবেদীনের মত তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের তূনের তীর বুমেরাং হয়ে তাদের বুকেই এসে বিঁধছে। সেই যন্ত্রণায় অস্থির তারা। কিন্তু তাদের সেই দুঃসাহসিক হাত এখন শূন্য। তাদের দুর্জয় হাতিয়ার এখন কুচক্রীদের অস্ত্রাগারে। মুক্তিযোদ্ধা হয়েও মেজর (অবঃ) জয়নাল আবেদীন কারাগারে সেল প্রকোষ্ঠে। মওলানা মতিন ও জয়নাল আবেদীন সাহেবের পাশাপাশি ২৬ সেল ডিভিশনে অবস্থান করেন। তাদের অপরাধ একই। মীরজাফরের বিরুদ্ধে মীর কাসিমের ভূমিকা নিয়েছেন তারা।

মওলানা মতীন আওয়ামী পঞ্চম বাহিনীর কৃত্রিম দেশপ্রেম আর গণসমর্থনের বহর দেখে এক সময় অন্ধমোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তার আশৈশব লালিত চেতনা বিসর্জন দিয়ে তথাকথিত মুক্তির জন্য নিবেদিত হয়ে ওঠেন। হতে পারে তিনি এটাকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সহজ পথ বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের হত্যাযজ্ঞের রাজনীতি, ব্যাপক দুর্নীতি ও দিল্লী নির্ভর আদিম স্বৈরাচার দেখে তার মোহভঙ্গ হয়। তিনি আবার ফিরে আসেন তার উৎস-মূলে। মেজর জয়নাল আবেদীনের সাথে সীরাত কমিটি গঠন করে নির্বাসিত ইসলামী চেতনাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন কার্যকারণে মোহগ্রস্ত হয়ে অথবা চাপের মুখে কৌশলগত কারণে অথবা হাল্কা চেতনায় বিভিন্ন বলয়ে আবর্তিত হলেও তাকে ঘিরে রয়েছে ইসলামী মূল্যবোধ।

দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর বিদায়ের পর আমি কর্তৃপক্ষের অনুমিত নিয়ে জামায়াতে ইসলামী নেতা ও শহীদুল্লাহ কায়সার সংক্রান্ত হত্যা মামলার আসামী জনাব আবদুল খালেক মুজমদার ভাইকে আমার সেলে নিয়ে এলাম। পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একঘেঁয়ে অলস মুহূর্তগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস হয়তোবা। আবদুল খালেক মজুমদার একাত্তরের যুদ্ধকালীন সময়ে ঢাকা সিটি জামায়াতে ইসলামীর একজন দায়িত্বশীল নেতা ছিলেন। একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে কারাগারে তার আচার আচরণ, তার সন্ত্রস্ত অনুভূতি, তার প্রলুব্ধ চেতনা, তার স্বজনপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ আমাদের যথেষ্ট আহত করেছে। অন্য কোন সংগঠনের নেতা তেমন কোন ঘটনার অবতারণা করলে আমার মনে তেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো না এবং সেটা স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু একটা মৌলবাদী সংগঠনে দীর্ঘ দিন ধরে বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও ভারসাম্যমূলক জীবনবোধ বিকাশ ঘটানোর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালু থাকা অবস্থায় তার নেতার অধঃপতিত মানসিকতা দেখে আমার পীড়িত হওয়া স্বাভাবিক। এটা তাকে খাটো করার জন্য নয়, এই বাস্তবতার নিরিখে তিনি স্বয়ং এবং আরও শত শত নেতা ও কর্মী দিক-নির্দেশনা পাবে। তা না হলে এসব দুর্বলতাকে লুকিয়ে রাখার অর্থ হবে আমি জেনে শুনে একটা বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করলাম।

১০ সেল ডিভিশনে আমার সেলে আমার সাথে তিনি থাকতে শুরু করলেন। তফসীর ক্লাস পুনরায় চালু হল। আমার খুব ভাল লাগছিল একজন আলেমকে আমার সাথে পেয়ে। তিনি আমার সাথে ১০ সেল ডিভিশনে থাকলেও তার অফিসিয়াল যোগসূত্র তৃতীয় শ্রেণীর সাথে রয়ে যায়। কয়েদী অবস্থায় তিনি বড় চৌকার ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন। শিক্ষিত মানুষ বলে জেল কর্তৃপক্ষ তাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন।

একদিন দেখলাম ১০ সেল ডিভিশনে ২০ জনের জন্য রান্না করা ২০টা মাছের মাথা নিয়ে একজন মেট হাজির। জিজ্ঞেস করলাম- 'কে পাঠিয়েছে?' জবাব পেলাম- 'ম্যানেজার সাহেব।' এতে আমার ডিভিশনে দারুণ প্রতিক্রিয়া হল। আমার মোটেও ভাল লাগেনি। তৃতীয় শ্রেণীতে এমনিতেই খাদ্য সংকট, তরিতরকারী মাছ-মাংসের দারুণ অভাব। তাদের বঞ্চিত রেখে খালেক ভাই কোন মানবিক তাগাদায় ২০টি মাছের মাথা আমাদের সেল ডিভিশনে পাঠালেন বুঝলাম না। তাও যদি এখানে তেমন খাদ্য সংকট থাকত তাহলে সেটা মেনে নেয়া যেত। অনেকে আবার টিপ্পনি কাটলেন, 'এরা আবার ইনসাফ কায়েম করবে?' এরা মানে তো আমরা। আমিও তো জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট। কথাটা আমার অসহ্য মনে হল। লজ্জিত হলাম। ইকবালের সেই বাণী মনে হল- 'যদি মজদুরের হস্তগত হয় কর্মের কর্তৃত্ব তাহলে পাথর কাটার মধ্যে প্রকাশ পাবে আদিম স্বৈরাচার।' তাকে আমি সাধারণ শ্রেণীর মনে করতাম না বলে দুঃখ পেলাম বেশী। শুধু সস্তা বাহবা নেয়ার জন্য তিনি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সাধারণ কয়েদীদের বঞ্চিত করেছেন।

রাত্রে ঘুমাতে এলেন। তার উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। চুপ করে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমরা যে সাধারণ কয়েদীদের বঞ্চিত করা উপহার সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি এটা তিনি টের পেয়েছেন। প্রসঙ্গ আমি তুললাম। বললাম- 'আপনার বিবেক বলে তো একটা কিছু থাকা উচিত। থাকা উচিত আপনার দূরদর্শিতা এখানে প্রত্যেকটা মানুষ সংবেদনশীল। আপনার প্রতি এখানকার সকলের কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এক নিমিষে সেটা ধ্বংস করে দিলেন। আপনার এ হাল্কা চেতনাবোধ আন্দোলনের ওপর কত বড় আঘাত করে, আপনার এটা বোঝা উচিত ছিল। অথচ সংগঠনের সব মানুষই এমন নয়। কত হাজার হাজার মানুষ দৃষ্টির আড়ালে কত বড় বড় কোরবানী দিচ্ছে। তাদের কৃতিত্ব আর কোরবানীগুলো হয়তো ভেসে উঠবে না। কিন্তু আপনাদের এই ত্র"টিগুলো দুর্গন্ধ হয়ে ভেসে বেড়াবে।' আর বললাম, 'যা কিছু করবেন একটু ভেবে চিন্তে করবেন। আপনাদের উপদেশ দেয়া তো সাজে না।'

পাবনা আটঘরিয়ার মওলানা বেলাল আমাদের সংগঠনেরই একজন। তিনি একাত্তরে তথাকথিত চেতনার শিকার। প্রথম শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন তিনিও। ১০ সেল ডিভিশনের এক কোণে আমার সাক্ষাতে আবদুল খালেক মুজমদারের উদ্দেশে রাগতভাবে বললেন, 'আপনি সংগঠনের একজন নেতৃস্থানীয় লোক হয়ে কন্ট্রাকটরের কাছ থেকে কি করে টাকা নিলেন? ঐ টাকা কি আপনাকে তারা বকশিশ দিয়েছে? এতে কি সাধারণ

কয়েদীদেরকে তাদের হক থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না? আপনি বলুন হলপ করে বলুন যে কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে আপনি টাকা নেননি? আবদুল খালেক মুজমদারকে নীরব থাকতে দেখেছি। দেখেছি রাগে দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় বিমূঢ় হতে। আবারও আমি খালেক ভাইকে সংগঠনের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সংযত হতে বললাম। প্রতিবাদী কণ্ঠে বেলাল ভাইকে বললাম, এ নিয়ে আর এগুবেন না।'

আমি জানিনা তার পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট তাকে এত নীচু হতে বাধ্য করেছিল কিনা। যে একটা ঝড়, যে একটি অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকটের মোকাবিলা করতে হয়েছিল দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে তাতে এর চেয়ে নীচু স্তরেও যদি কোন মানুষ নেমে থাকে তাহলে কতটুকু সে দায়ী হবে? তবে এসব কর্মকাণ্ড যে সংগঠনের ওপর দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এটুকু বলার অপেক্ষা রাখে না।

সবচাইতে বেশী আমি ঘৃণা করতাম তার কাপুরুচিত অভিব্যক্তি। আমি মনে করি একজন মুসলমান জীবনের সংকটে অথবা কোন দুর্বল মুহূর্তে অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু বুজদীল হতে পারে না। যখন কেউ মনে করবে পুরস্কার ও শাস্তি দানের মালিক আল্লাহ এবং কিসমত যখন নির্ধারিত হয় উপরে, জিন্দেগীর ফায়সালা যখন আসে লওহে মাহফুজ থেকে তখন একজন ঈমানদার মুনাফেক ও কাফেরদের পদচারণায় ভীতসন্ত্রস্ত হবে কেন? অথচ তাকে দেখেছি কারাগারের নিভৃত কোণেও তটস্থ থাকতে। হতে পারে আগে যে অমানুষিক জুলুম আর অত্যাচার তার ওপর হয়েছে তা থেকেই তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে এই ভীতি।

কারাগারে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে আমাকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করছে। তাদের সাথে আমার বিরোধ শুধুমাত্র আদর্শগত। আমি জেলখানায় দাওয়াতী ও তরবিয়াতী প্রোগ্রাম বলতে গেলে ভালমত চালু করেছি। খালেক ভাইয়ের উচিত ছিল আমার পাশে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়ানো। অথচ আমি তাকে তেমনভাবে পাইনি। বরং আমার আবেগ আর অনুভূতিকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন- কারাগারে আমার অবস্থান থেকে একটু পিছু হটে আসতে। একটা ঘটনা থেকে বোঝাযাবে কারাগারে কিভাবে তিনি সন্ত্রস্ত থাকতেন। একদিন আমি তিন রাস্তার এক মোড়ে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বলছি। বলছিলাম- আওয়ামী লীগ আমাকে টার্গেট করে তাদের ষড়যন্ত্র -জাল বিস্তার করেছে। ডিআইজি পর্যন্ত আমাকে নিয়ে বহু অভিযোগ উত্থাপন করেছে। এতে শান্তি বিঘিœত হবার আশংকায় ডিআইজি হয়তো এখান থেকে আমাকে অন্য কোন জেলে পাঠিয়ে দিবেন। যেটা আওয়ামী লীগ চায়। এমনটি হলে

তারা সফল হবে। আমরা হব ব্যর্থ। আমাদের মিশনও হবে ব্যর্থ। আমাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। 'আপনি তো আমাদের নেতৃস্থানীয়। বাইরের সাথে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা ম্যানেজ করা যায় কিনা?' তিনি কি বলতেন জানিনা। দূর থেকে জাসদের শ্রমিক নেতা রুহুল আমিন ভূঁইয়াকে দেখে আড়ালে সরে গেলেন। বুঝলাম ভীতি তাকে পেয়ে বসেছে। আমাদের সাথে তার কোন যোগাযোগ রয়েছে অথবা আমাদের জন্য কোন অনুভূতি রয়েছে এমনটি প্রতিপক্ষের কাছে ধরা পড়–ক তিনি তা চাইতেন না।

রুহল আমিন ভূঁইয়া চলে যাওয়ার পর তিনি আবার এলেন। আমি তাকে বললাম- 'প্রাচীরের আড়াল হয়ে কি পরিচয় লুকাতে পারবেন? আমাদের বিরুদ্ধবাদী হয়ে তাদের সহানভূতি পাবেন? সহানুভূতি পাবার কোন সম্ভাবনা থাকলে মিথ্যা মামলায় আপনাকে ওরা জড়াতো না। নেতার এমন আচরণের প্রকাশ ঘটলে কর্মীরা তো দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্তত আপনার কাছে আমি এমনটা আশা করি না। কাপুরুষতা আর বুজদিলীর নাম হিকমত নয়।' তিনি লা-জবাব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

ওদিকে মেজর (অবঃ) জয়নাল আবেদীন সাহেব একটি বই লেখায় হাত দিয়েছেন। তিনি মনে করলেন আবদুল খালেক মুজমদার তার সহযোগী হলে তার কাজে সুবিধা হবে। তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমার কাছ থেকে খালেক সাহেবকে তার নিজের সান্নিধ্যে টেনেনিলেন। আলবদরের ডেরা থেকে তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর পক্ষপূটে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে খালেক ভাই যেন হাফছেড়ে বাঁচলেন।

আবুবকর সিদ্দিকের জন্য আমার দুঃখ হত সবচেয়ে বেশী। পনের ষোল বছর বয়সের উঠতি তরুণ। কৈশোর পেরিয়ে কেবলি যৌবনে পদার্পণ করেছে। জীবন নিয়ে সূক্ষ্ম স্বপ্ন দেখারও সময় মেলেনি তার। সিদ্দিক ছিল বাগিচার এক প্রান্তে ফোটা যেন একটা ফুল। দল মেলার সাথে সাথে উত্তপ্ত বাতাস এসে পাঁপড়িগুলো ঝলসে দিল। সে তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল এমন নয়। নেতৃত্বের ভিতকে মজবুত করার জন্যও তার সংগ্রাম ছিল না। ঐশ্বর্যের প্রয়োজনে অথবা ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য রক্ত-পিছল পথে পা বাড়িয়েছিল- এ কথাও বলা যাবে না। তার সংগ্রামী ও সংঘাতময় জীবনের পশ্চাতে রয়েছে মহান জাতীয় প্রেরণা। পাকিস্তানের অস্তিত্বের ওপরই নির্ভর করছে উপমহাদেশের মুলসমানদের ইজ্জত ও আযাদী, এই ছিল তার বিশ্বাস। সিদ্দিক কিছুতেই হিন্দু মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত সমকালীন চেতনার প্রবাহমান ধারায় অবগাহন করতে চায়নি হাজার বছরের বৈরিতা যাদের সাথে,

মুসলমানদের রক্তে যাদের হাত রাঙা তাদের আশ্রয় শিবিরে যেতে চায়নি সিদ্দিক। বরং হিন্দুস্তানী আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল হাতে। নেহায়েত দেশ-প্রেম ও জাতীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য হারাতে হল তার মা ও বোনকে। বাংলাদেশ হওয়ার পর মুক্তিফৌজ তার ঘরে হানা দেয়। তাকে না পেয়ে তার মা ও বোনকে গুলী করে হত্যা করে। পরবর্তীতে কতিপয় মুক্তিফৌজের হাতে ধরা পড়ে সে। ছোট অল্প বয়সী সিদ্দিকের ওপর ভয়াবাহ নির্যাতন চালিয়ে তারপর কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

কারাগারে থাকাকালীন সবাই সিদ্দিককে আদর করতো। সবারই ছোট ভাই যেন ও। তার আব্বা প্রথম দিকে কারাগারে তার সাথে দেখা করার জন্য নিয়মিত এলেও নতুন করে বিয়ে করার পর আর তেমন আসত না। সিদ্দিকের সকরুণ চাহনি আমাকে দারুণভাবে বিব্রত করত। তার হাসির আড়ালে অন্তহীন বেদনা রয়েছে বোঝা যেত স্পষ্টই। দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় সিদ্দিকের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। এই স্বল্প বয়সী তরুণ, স্বাভাবিকভাবেও যার এমন কারাভোগের কথা নয়, তাকে ৭টি বছর কারাপ্রকোষ্ঠে দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয়। আটাত্তর সালে সিদ্দিক মুক্তি লাভ করে। এমনিভাবে কত শত দেশপ্রেমিক সিদ্দিক গুলীতে নিহত হয়েছে অথবা কারাপ্রকোষ্ঠে মৃত্যুর সাথে লড়াই করেছে তার হিসেব এখনো বের হয়নি।'

তিন

ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন খারাবী সংঘটিত হয়েছে। একই সময়ে ৭টি খুন। সেই হত্যা মামলার আসামী হয়ে আসলেন জনাব, শফিউল আলম প্রধান। তিনি মুসলিম লীগ নেতা ডেপুটি স্পিকার দবির উদ্দিন প্রধানের ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি খুন সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ তার সাথে হয়েছে। তা থেকে যতটুকু মনে হয়েছে, কোন এক নেপথ্য ইঙ্গিতে ছাত্রলীগে ভাঙনের ছোঁয়া লাগে। ক্রমে একের ভেতর দুই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটিতে প্রকাশ্য শেখ মণির মদদ। অন্যটির গাইডেন্স আসে অন্যতম আওয়ামী নেতা তোফায়েলের টেবিল থেকে। শেখ মণির মদদপুষ্টরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই শুধু নয়, সমস্ত শহরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তাদের হিংস্র নখর থেকে কোন ছাত্র এমন কি মেয়েরাও নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারে না। কিন্তু তবু তাদের কর্মকাণ্ড নির্বিরোধ হতে পারছে না। কারণ অন্য গ্র“পটির নেতৃত্বে রয়েছেন শফিউল আলম প্রধান। তার অবস্থান একেবারে হাওয়ার ওপর, তাও নয়। প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়ে তিনি তার গ্র“প নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে শেখ মুজিব পর্যন্ত অভিযোগ পৌঁছে। কিন্তু শেখ মণির প্রভাব তখন এত তীব্র যে তা থেকে মুক্ত হয়ে শেখ মুজিব ও তার প্রশাসন সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে মণি-সমর্থক ছাত্রলীগের মস্তানদের দুঃসাহস, ঔদ্ধত্য আরও ভয়ঙ্কর ও সীমাহীন হয়ে ওঠে। তারা প্রতিপক্ষ প্রধান গ্রুপের উপর মরণ-ছোবল দেবার নীলনক্সা তৈরী করে। কিন্তু কুদরতের ফায়সালা ভিন্ন রকম। মণি গ্রুপের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে ৭টা লাশ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে লুটিয়ে পড়ে।

কারাগারে আমার সাথে প্রধান ভাইয়ের সম্পর্ক অল্প কয়দিনের মধ্যে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। তার ভারত বিরোধী চেতনা আমাদের মতই মজবুত। মনের প্রসারতা ছিল ব্যাপক। পাঠ্য বিষয়ের বাইরেও ছিল তার পদচারণা। তিনি ইসলামের উপর লেখাপড়া করেছেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদের লেখার দারুণ ভক্ত। কারাগারে তার অফুরন্ত অবসরে মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সাহিত্যের সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিত হন। প্রায় এক ডজন সহযোগী

তারই মত মন-মানসিকতা সম্পন্ন। যদিও তখন পর্যন্ত তাদের মাথা থেকে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের প্রতিমা পুরোপুরি অপসারিত হয়নি। তবু বলব, এরা ভাগ্যাহত জাতির সম্পদ।

জনাব, অলি আহাদ হিন্দুস্তান বিরোধী একটি বলিষ্ঠ বিবেক, একটি সংগ্রামী চেতনা, একটি সোচ্চার কণ্ঠ। এক পর্যায়ে তাকেও পেলাম আমরা। সিনেমার পর্দার মত যেন একে একে অনেক নায়ক মহানায়ক আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। আমি যেন কালের সাক্ষী হয়ে সবকিছু অবলোকন করছি। দিল্লী হনুজ দূরাস্ত। চল্লিশ বছর অনেক দূর। এক বির্তনশীল ইতিহাসের দ্রষ্টা হিসেবে কারাগারে অন্ধ প্রকোষ্ঠেও আমার ভাল লাগছে।

এনএসএফ নেতা সৈয়দ নেসার নোমানীর সাথে অলি আহাদ ভাইয়ের আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নোমানী আমাকে নিয়ে গেলেন অলি আহাদ ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। আমার অতীত ইতিবৃত্ত টেনে আনার প্রসঙ্গে আহাদ ভাইকে অনেক কিছু বললেন। আরও বললেন, 'রুশ-ভারত বিরোধী আন্দোলন যদি সত্যি আপনারা করেন, যদি ভারতীয় আগ্রাসন রুখতে চান, তাহলে আমিন ভাইয়ের মত হাজার হাজার নির্ভীক ও বলিষ্ঠ কর্মীর প্রয়োজন হবে। আর এরা হচ্ছে যাঁচাই করা নির্ভেজাল। ইতিহাসের গতিধারায় পরীক্ষিত। হিন্দুস্তানের নুন খাওয়া মানুষদের নিয়ে আন্দোলন করতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু হিন্দুস্তানী আগ্রাসন প্রতিরোধ করার মত শক্তিশালী ব্যুহ রচনা করতে পারবেন না। নোমানী অলি আহাদ ভাইকে গভীর সখ্যতার দাবি নিয়ে আরও বললেন- 'কারাগার থেকে বেরিয়ে যেসব শক্তি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে মাথা কুটছে তাদেরকে বের করার দুঃসাহসিক কাজে হাত দিতে হবে আপনাকে।'

অলি আহাদ ভাই মুখ খুললেন, তার ছোট্ট একটা জবাব- 'ভেতর বাইরের পার্থক্য খুব একটা বেশী নেই নোমানী। তবু তোমার কথা মনে থাকবে।'

অলি আহাদ ভাই এক পর্যায়ে আমাকে ন্যাপ নেতা জনাব মশিউর রহমান যাদু মিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনিও ২৬ সেল ডিভিশনে অবস্থান

করেছেন। শেখ মুজিব এবং হিন্দুস্তান বিরোধী ভূমিকা নেয়ার জন্য তাঁর ঐ একই কারাবাস।

তখন যাদু মিয়া রৌদ্রকরোজ্জ্বল বারান্দায় বসে ছিলেন। পাশে এক বাটি চা, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছেন! হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তিনি আমাকে সিগারেট দিয়ে আপ্যায়ন করতে চাইলেন। আমি ক্ষমা চেয়ে নিলাম। কেননা আমি তাতে অভ্যস্ত নই। মনে মনে ভাবলাম জাতীয় নেতারা তাদের অবচেতনে এমনি করে নিজেরা বিষ খান এবং গোটা জাতিকে বিষ গিলিয়ে থাকেন।

মশিউর রহমান তার স্বভাবসুলভ আচরণে আমার প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বললেন- 'তোমাদের ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। বাতাস উল্টো বইছে। জেল থেকে বেরিয়ে আমরা ব্যাপক গণ-আন্দোলনে নামব। ঐ জালেম মুজিবের তখতে তাউস ভেঙে আমরা খান খান করে দেব। এদেশের মাটিতে হিন্দুস্তানের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, তোমরা দেখে নিও। কারাগার থেকে বেরিয়ে যে অরাজক রাজ্যে যাবে, সেটা কারাগার থেকেও ভয়ঙ্কর। নির্বিচার হত্যা, জুলুম, রাহাজানি দিয়ে দেশপ্রেমিক যুবশক্তিকে ধ্বংস করে দিল বদমায়েশটা। সংগ্রাম থেমে থাকবে না, জুলুমের মধ্যেই প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। তোমরা বেরিয়ে আগ্রাসনমুক্ত এদেশের আলো বাতাসে মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে পারবে। মুজিব তার নাটকের শেষ দৃশ্যে এসে গেছে। তার আশা এবং আশ্বাসে জাতীয় জীবনের নি-িদ্র অন্ধকারে যেন একটু খানি আলো রশ্মি দেখলাম। মনে মনে দোয়া করলাম- 'আল্লাহ, তাঁর উক্তিগুলো সত্যে পরিণত হোক।'

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাসদের আ. স. ম রব ও মেজর জলিলকে দূর থেকে দেখতাম, কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসভবন অবরোধের ঘটনায় তারা জেলে আসেন।

জাসদের ব্যাপারে আমি ছিলাম একেবারে নিস্পৃহ। যদিও সাংগঠনিকভাবে মুজিব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপক প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছিল তাদের কার্যকলাপে। কিন্তু তবু যেন সংগঠনটিকে রুশ-ভারত অক্ষশক্তির সেকেন্ড লাইন বলে আমার মনে হত। অনেক বুদ্ধিজীবিই জাসদ সম্বন্ধে এমন ধারণা

পোষণ করতেন। অনেকেই মনে করতেন ভারত বিরোধী এবং মজিব বিরোধী সংগ্রামী যুবশক্তিকে চিহ্নিত করার জন্য জাসদের আন্দোলন ছিল ভারতের নেপথ্য প্রয়াস। এই ভারতীয় নীলনক্সার সুপরিকল্পিত ফাঁদে পা দিলেন মেজর জলিল সম্ভবত তার অজান্তে। একই ছিদ্রে দুই বার হাত রাখলেন তিনি। তার দেশপ্রেম ও সদিচ্ছার প্রতি আমার সন্দেহ নেই। ভারতীয় শোষণ ও বাংলাদেশী সম্পদের নির্বিচার লুণ্ঠনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠ সক্রিয় প্রতিরোধকারী। এর জন্য আমার শ্রদ্ধাও তার প্রতি যথেষ্ট ছিল।

জাসদের কর্মধারায় একীভূত হওয়ার কারণে তার সদিচ্ছা এবং সংগ্রামী চেতনা অপশক্তির শিকারে পরিণত হয়। তাকে অনুসরণ করে দেশের অগণিত যুবকের শক্তি ও সামর্থ্য 'কনশাস ক্রিমিনাল' সিরাজুল আলম খানের উদ্ভট বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বেদীতে অসহায়ের মত বলি হয়েছে। জাতীয় স্বার্থ এবং আদর্শ বিরোধী অভীষ্ট অর্জনের জন্য জাসদের নেপথ্য নায়কেরা এবং আসম আব্দুর রব স্বয়ং দেশপ্রেমিক মেজর জলিলের ভারত বিরোধী ইমেজ চাতুরীর সাথে ব্যবহার করেছেন। এই সরলতা এবং দুর্বলতার জন্য মেজর জলিলের প্রতি সেদিনও আমার ছিল অনেক বেদনা মিশ্রিত চাপা ক্ষোভ। এ কারণে তার সাথে আলাপের ইচ্ছে হতো না।

সময়ের আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে মেজর জলিল আজ একটি নতুন পথ পেয়েছেন। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। মেজর জলিলের আজকের এই নতুন পরিক্রমা সঠিক সন্দেহ নেই। কিন্তু বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে। প্রবহমান সময়ের গতিধারায় তার সেই শক্তি, সেই হিম্মত আজো কি তার মধ্যে রয়েছে? হয়তো বা নাই, তবু দুঃসাহসিক সিন্দাবাদ মেজর জলিলকে আমি কবি ফররুখের ভাষায় বলব -

'আজকে তোমার পাল ওঠাতেই হবে
ছেড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি
তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে।'

আসম আবদুর রবের সদম্ভ অভিব্যক্তিকে আমি ঘৃণা করতাম একাত্তরের আগে থেকে। মালেক হত্যার নেপথ্যেও তিনি ছিলেন। আদিম স্বৈর মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ তার প্রতিটি বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন তিনি বলেন, 'আমি মুজিবকে জাতির পিতা ঘোষণা দিয়েছিলাম, আমিই আবার প্রত্যাহার করে নিলাম।' এ যেন ছেলের হাতের মোয়া।

এদেশের সচেতন যুব-শক্তি আগামী দিনের জাতির জন্য কল্যাণ আনতে পারত। কিন্তু এই আসম আব্দুর রব তাদেরকে বিপথগামী করে অপঘাতে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের ঘাড়ে পা রেখে নিরাপদ আখের গুছিয়ে নেয়। কর্মীরা পরিণত হয় হত্যাকারী আর লুটেরাতে। একই আন্দোলনের নেতা হয়ে মেজর জলিল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপন্ন, আর আসম আবদুর রব একজন পুঁজিপতি। এ কারণেই তেলে-জলে মিশ খায়নি।

রবের ওপর আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ আর ক্ষোভ পুঞ্জীভুত হয়েছিল সেদিন, যেদিন কারাগারে শিক্ষক মতিউর রহমান একটা ছোট্ট ঘটনা বলতে কেঁদে ফেলেন।

কারাগারে আসম আবদুর রব আইন বিষয়ে পরীক্ষা দেন। টেবিলে প্রকাশ্যে বই রেখে পরীক্ষার খাতায় লিখছিলেন। মতিউর রহমান সাহেব ছিলেন ইনভিজিলেটর। তিনি বললেন, 'রব সাহেব একটু রয়ে-সয়ে আমাদের বাঁচিয়ে যা হয় করুন।' শিক্ষক মতিউর রহমান সাহেবের এই আবেদনটুকু রব সাহেব বরদাস্ত করতে পারেনি। বই ছুড়ে মতিউর রহমান সাহেবকে মেরেছিলেন এবং যা তা বলে ঘাড় ধরে রুম থেকে বের করে দেন। এই ঘটনার পর তার ওপর আমার কোন ভাল ধারণা আর অবশিষ্ট রইল না। তাছাড়া কারাগারেই সৈয়দ নেসার নোমানীর কাছে শুনেছিলাম এই রবেরাই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ পার্লামেন্টারিয়ান এবং ইসলামের অন্যতম দিশারী মৌলবী ফরিদ আহমদকে নিশংস এবং পৈশাচিকভাবে হত্যা করে।

১০ সেল ডিভিশনে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালাক্রমে ডিভিশন প্রিজনারদের পরিচালনা করতে হতো। এবারের পালা আমার। একদিন সুবেদার এসে সংবাদ দিলেন, চার জন নেতা এসেছেন। জানলাম খাজা খায়ের উদ্দিন, সবুর খান, এডভোকেট শফীকুর রহমান, এডভোকেট ইউসুফ চৌধুরী, মুজিবী দুঃশাসনে এদের দ্বিতীয় দফা কারাবাস। দেখলাম সুবাদার দারুণ খুশী। আনন্দের আতিশর্য্যে বলে চলেছে- 'বঙ্গবুন্ধ দালালদের রেহাই দিলেও তারা কিন্তু চুপচাপ ছিল না। ষড়যন্ত্র করছিল। ষড়যন্ত্র করবি, কর এবার। বোঝ, মজাটা। বঙ্গবন্ধুর চোখ কঠিন চোখ। ফাঁকি দেয়া এত সহজ? শালা, সময় মত হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে।' আমি একটু রেগেই বললাম- 'আর কিছু বলার আছে?' প্রসঙ্গ এড়িয়ে তিনি বললেন- 'আমিন সাহেব, জেলার সাহেব বলে দিলেন- এখান থেকেই আপনার নেতাদের খাবার দিতে হবে।' বললাম- 'ঠিক আছে হবে।' রাজী হলাম আমি। খাবার তৈরী ছিল। একজন ফালতুকে ডেকে চার জনের প্রয়োজনীয় খাবার পাঠিয়ে দিলাম। একটু পরে আমিও হাজির হলাম। নেতাদের মুখ দেখে যদি বাতাসের ভাব বোঝা যায়, এই আশা নিয়ে তাদের সবার সাথে আলাপ হল। আমাকে আন্তরিকভাবে সানন্দে গ্রহণ করলেন তারা। একান্ত আপন জন মনে হল। সবুর খান তার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে একটা বড়সড় কলা এনে দিলেন। প্রত্যেকেই মুরুব্বীর মত অনেক উপদেশ, অনেক সান্ত্বনা দিয়ে আমার মন-মানসতাজা রাখার চেষ্টা করলেন। তাদের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে আমার দারুণ ভাল লাগল। পিতা ও সন্তানের যেমন একটা আত্মার যোগ তেমনই অনুভব করলাম এদের পেয়ে। হাল্কা বালসুলভ কোন কথা নেই, অবকাশ নেই বাচালতার। কথা হচ্ছে, আলাপ আলোচনা ঠিকই হচ্ছে। কিন্তু গুরুত্বহীন কোনটিই নয়। তারা বললেন, "তথাকথিত দালাল আইনের আওতামুক্ত হয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে ভাগ্যহত এই জাতিকে দুর্বিপাক থেকে টেনে তোলার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করতে থাকি। একাত্তরের পটভূমিতে দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র আর প্রচারণার তোড়ে অবলুপ্ত জাতির বিবেক ঘাটে ঘাটে ঠোক্কর খেয়ে স্বাভাবিক চেতনায় ফিরে এসেছে। এ সময় শুধু প্রয়োজন নির্ভীক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আর সময়োচিত সঠিক পরিকল্পনা। আমরা এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই আসতে হলো কারাগারে।'

খাজা খায়েরউদ্দিন বললেন- 'আমি এই দেশ, এই বাংলার মাটিতে আর নয়। আমাকে শূন্য হাতে যেতে হলেও কারামুক্তির পর এদেশ থেকে হিজরত করব। এদেশ আর সেই দেশ নেই। মুর্শিদাবাদ হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদের দেশপ্রেমিক সম্মানী ব্যক্তিত্বগুলো যেমন মুনাফেক গাদ্দারের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল, তেমনি দুশো বছর পর আজ আবার এদেশের হাওয়ায় মুর্শিবাদের গন্ধ।'

বললাম, 'আপনারা আমাদের নেতা। গোটা জাতিকে হিংস্র হায়েনার মুখে রেখে আপনি দেশ ছাড়বেন কি করে?'

খাজা সাহেব বললেন, 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নিম্নতম মর্যাদাকেও যেখানে স্বীকার করা হয় না, সেখানে কোন বিবেকবান মানুষ থাকতে পারেন না, আমিন। এই দেখনা, রক্ষীবাহিনী আমার বাড়ীতে চড়াও হলে আমি বেরিয়ে এলাম। গায়ে আমার গেঞ্জী। আমাকে একটা কথাও বলতে দেয়া হল না। বেগম সাহেবা আমার জামা আনলেন, সেটি পর্যন্ত গায়ে দিতে দিল না। এছাড়াও ওদের অশ্রাব্য অশালীন আচরণ আমাকে দারুণভাবে আহত করেছে।' তিনি আরও বললেন- 'এজাতির সৌভাগ্য ফিরে আসবে কিনা জানিনা তবে এদেশের মানুষকে যুগ যুগ ধরে তাদের ভুলের কাফফারা আদায় করতে হবে।' তিনি অবশ্যি আমাকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে, 'আমাকে এক সময় তোমার কেস নাম্বারটা দিয়ে দিও। আমি জেল থেকে বেরিয়ে তোমার এবং আমাদের আর যারা আছেন তাদের জন্য চেষ্টা করব।'

এক সময় এডভোকেট শফিকুর রহমান বললেন, 'আমার কি মনে হচ্ছে জান? শেখ মুজিব আমাদের চেয়ে বেশী অসহায়। তার ইচ্ছা সদিচ্ছা যাই থাকনা কেন, তার করার কিছু নেই। হিন্দুস্তানী চক্রের কাছে তার হাত-পা বাঁধা। তার চারপাশে রুশ-ভারতচক্র এমন ব্যুহ রচনা করে রেখেছে যে তার থেকে তিনি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে তার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সন্ত্রাস আর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে কোন শাসক না চায়? কিন্তু চাইলেই সেটা করা সম্ভব নয়। এটা করলে মুজিব যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা ধসে পড়বে। আর সেও

নিক্ষিপ্ত হবে ধ্বংসের অতল গহ্বরে। সেনাবাহিনী ময়দানে নামিয়ে সে চেষ্টাও তো করেছিল। কিন্তু বাধ্য হয়ে তাকে সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হয়। এর চেয়ে বড় কথা হিন্দুস্তান বাংলাদেশকে এক অরাজক পরিস্থিতির দিকে টেনে আনতে চাচ্ছে এবং সেটা সুপরিকল্পিতভাবে। হিন্দুস্তানের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাও বাংলাদেশকে দৈন্য, দুরদশা ও অরাজকতার দিকে নিয়ে যেতে চায়। রুশ-ভারত চক্র থেকে দেশটাকে মুক্ত করা মুজিবের পক্ষে সম্ভব নয়। মুজিব আস্ফালন, তর্জন গর্জন এবং গালভরা বক্তব্য যা কিছুই করুক না কেন ইন্দিরার চোখের দিকে চোখ রেখেই সেটা করতে হয়। বলতে গেলে মুজিব একটা রোবট, এর রিমোট কন্ট্রোল ইন্দিরার হাতে।'

সুদীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পরিক্রম করা এই চারজন নেতার সাথে আলাপ আলোচনার সময় আর একজন জনপ্রিয় নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীর কথা মনে পড়েছিল বার বার। জাতির এমন ক্লান্তিলগ্নে তার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। দুর্ভাগ্য আমার যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এমন সময় স্থান্তরিত হলাম যখন তিনি পরপারে। তাকে দেখার এবং তার সাথে আলাপ আলোচনার সাধ অপূর্ণই রয়ে গেল।

চট্টগ্রামের শার্দুল ফজলুল কাদের চৌধুরীকে ক্ষুদ্র সেল প্রকোষ্ঠে রেখেও হিন্দুস্তানের শিখণ্ডী মুজিব তার আসনকে নিরাপদ ভাবতে পারেনি। সম্মোহিত বাংলার মুসলমানদের চেতনা ফিরে আসাতে এবং হিন্দুস্তান বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধতে শুরু করলে হিন্দুস্তান তার এক নীলনক্সা বাস্তাবয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি ছিল ভারত বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসমূহকে দুনিয়ার আলো বাতাস থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেয়া। আমার ধারণায় এ ষড়যন্ত্রের প্রথম শিকার হলেন ফজলুল কাদের চৌধুরী। তার অতীত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যা হিন্দুস্তানী নেতাদের স্মৃতিতে আঁকা ছিল। এ ছাড়াও গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর নথিপত্রের সমকালীন রিপোর্ট অনুযায়ী হিন্দুস্তান বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সমূহের মধ্যে ছিলেন তিনি শীর্ষে।

তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ফেডারেশনের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। বৃটিশ এবং হিন্দুদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে বৃটিশ ভারতের মুসলিম তরুণদের

সুসংগঠিত করতে সক্ষম হন। সে সময় সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে চট্টগ্রামে সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে মুসলমানদের একক একটি প্লাটফরমে টেনে আনতে সক্ষম হন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে চট্টগ্রামে মুসলমানদের নিরঙ্কুশ বিজয় তার সাংগনিক দক্ষতারই ফসল।

১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার এবং অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। '৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি আদমজী জুট মিল শ্রমিক ও জাহাজ শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেন। পূর্ব পশ্চিম বৈষম্যের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সোচ্চার। কিন্তু এর জন্য হিন্দুস্তানের পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে হবে এমন ধারণার বিরুদ্ধেও ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠ।

আমি কারাগারে এসে যতটুকু জেনেছি- ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সেল প্রকোষ্ঠের শ্বাস-রুদ্ধকর পরিবেশে থেকেও তিনি এদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ব্যাপারে ছিলেন দারুণ আশাবাদী। তাজউদ্দিন গংরা কারা পরিদর্শনে এলেই তিনি নাকি তাকে বলেছিলেন, 'সেলগুলোকে বড়সর কর তাজুদ্দিন। আমাদেরকে তোমরা ধরে রাখতে পারবে না। আমাদের বেরুনোর সময় এসে গেছে। কারাগারের ভেতরে আসতে তোমাদেরও বেশী দেরী নেই। এখন থেকে কারাগারগুলো সংস্কার করে ফেল।' চৌধুরী সাহেব আরো নাকি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন- 'তোমাদের মুজিব তো এদেশকে সোনার বাংলা বানিয়ে ফেলেছে। মুজিবকে বলো, আমার জন্য অন্তত সাড়ে ৩ হাত মাটি যেন মাটিই রাখে।'

প্রত্যেক দিন সকল বেলা চৌধুরী সাহেব দরাজ গলায় কোরআন তেলাওয়াত করতেন। বিভিন্নভাবে জ্বালাময়ী বক্তব্য রেখে তিনি ভারত বিরোধী কারাবাসী মজলুমদের বিপন্ন মানসিকতাকে চাঙা রাখতেন।

এই শার্দুল নেতার কণ্ঠরোধ করার জন্য সম্ভবত হিন্দুস্তানের কালো হাত কারা প্রাচীর আর লোহার গরাদ ভেদ করে ক্ষুদ্র সেল প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। কারাগারের বিভিন্ন সূত্র থেকে আমি যতটুকু জেনেছি- এক কম্পাউন্ডার দ্বারা জনাব চৌধুরীর দেহে সিরিঞ্জ দিয়ে বিষ প্রয়োগ করা হয়। এই বিষক্রিয়ার

ফলে ফজলুল কাদের চৌধুরী, মুসলিম বাংলার এক বিশাল ব্যক্তিত্ব শাহাদাতবরণ করেন। তার সমস্ত শরীর নাকি নীল হয়ে গিয়েছিল।

মুজিব প্রশাসন পরবর্তীতে সেই কম্পাউন্ডারকে সরকারী খরচে তার সচেতন গুনাহ মাফের জন্য হজ্জে প্রেরণ করে।

ফজলুল কাদের চৌধুরীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল এমন ধারণা বহুল প্রচারিত। মুজিব-পরবর্তী সরকারসমূহের উচিত ছিল, এর একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করা। কিন্তু 'বরবাদে গুলিস্তাঁ করণে কো একই উল্লোক কাফি হ্যাই হার শাখপর উল্লোক বায়টা হ্যায় আনজা সে গুঁলিস্তা কেয়া হোগা।' সংবেদনশীল সচেতন বিবেক কি এখন একটিও অবশিষ্ট আছে? নেই। আছে কেবলমাত্র অন্ধ উন্মাদনা। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সবার যেন একই অবস্থা। এ কারণেই কোনদিন এসব রহস্যের জট খুলবে না।

কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে কখনো কখনো নৈরাজ্য আমাদের ঘিরে ধরতো। বাইরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কত বিচিত্র খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছত। মুজিবের ব্যাপারে রুশ-ভারতের যৌথ উদ্যোগে এবং হিন্দুস্তান বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে আমরা সমগ্র জাতির সামনে নি-দ্র অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পাই না। ভয়ঙ্কর হতাশা ও অন্তহীন নৈরাজ্য যখন পেয়ে বসে, তখন কারাগারের একটি মাত্র মানুষ আমাদের কানে কানে ভোরের পাখীর মত যে গান শোনাতেন সেটা সূর্য উঠার গান, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের আশ্বাস। তার পিতা বাঙ্গালী নন। কিন্তু তিনি এদেশে জন্মেছেন। বাংলার অস্থি-মজ্জার সাথে মিশে তিনি একাকার। এদেশের জলবায়ু আকাশ আর মাটিকে তার আত্মার সাথে একিভূত করে ফেলেছেন। তিনি ইশ্বরদীর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী জনাব আবদুল মজিদ খান। এ দেশের জন্য তার গভীর ভালবাসা, অন্তহীন মমত্ববোধ। ইচ্ছে করলেই তিনি পাকিস্তান যেতে পারতেন। কিন্তু সে চেষ্টা তিনি আদৌ করেননি। তাঁর ভাষায়, 'আমি এদেশ, এ মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে নারাজ। এদেশের কোটি কোটি মানুষের তকদীরে যা লেখা আছে আমার নসীবে তাই ঘটবে, এখান থেকে পালিয়ে আমি বাঁচতে চাই না।'

মার্চ-এপ্রিল নাগাদ ইশ্বরদীর পাকসীতে আওয়ামী লীগ যে ভয়াবহ অবাঙালী হত্যাযজ্ঞের উৎসব করেছে এবং হাজার হাজার মানুষকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করেছে, এর প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং অবাঙালীদের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এককভাবে এই মজিদ খান রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি অগণিত মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু তবু তিনি এই অন্ধ কারাপ্রকাষ্ঠে। হিন্দুদের হীন মানসিকতার শিকার হয়ে তাদেরকে ইউপি থেকে বাংলায় আসতে হয় ইমানকে নিরাপদ রাখার জন্য। অথচ এখানেও তাদের অর্জিত সম্পদ গ্রাস করার জন্য আওয়ামী পঞ্চমবাহিনী চক্রান্তে এখন তার ঠিকানা কারাগার। তিনি আমাদের বলতেন একটা পরিবর্তন আসন্ন। নৈরাশ্যের কিছু নেই। বসন্ত আসার আগে যেমন মৌমাছিদের মধ্যে দেখা যায় উল্লাস। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে তারা যেন আসন্ন বসন্তের গন্ধ পায়; শুনতে পায় দখিনা হাওয়ার পদধ্বনি; মজিদ ভাই তার অবচেতন মনে ঠিক তেমনি পালাবদলের সংকেত পেয়েছিলেন। তা না হলে তাঁকে কারাগারে এমন নিরুদ্বিগ্ন দেখতাম না। দুশ্চিন্তা ছিল না মোটেও। যদিও অর্থনেতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত ছিলেন, রাজনৈতিক কার্যকারণে সামাজিক অবস্থানও ছিল তার পর্যুদস্ত।

খোদার ইচ্ছার সাথে কোন বিপন্ন আত্মার যোগ হলেই সম্ভবত মানুষ এমন নিরুদ্বিগ্ন হতে পারে। এত উল্লাস এত আনন্দ কারাগারে আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি। বসন্তের পাখীর মত তিনি এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে গেছেন আর শুনিয়েছেন নতুন দিনের গান। অর্থাৎ কারাগারের সবখানে রাজনীতির প্রেক্ষিতে পর্যুদস্ত মানুষগুলোকে আশা আর আশ্বাসের প্রাণবন্ত করেছেন তিনি। সময়ের স্বল্প ব্যবধানে তার ভবিষ্যতবাণী আক্ষরিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট। জেল থেকে বেরিয়ে এসেও আমি তার নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছি। সুখ দুঃখের পসরা নিয়ে তিনি আমাতে একাকার হয়ে আছেন। সব রকম সহযোগিতা দেয়ার জন্য তার অন্তর আত্মা আমার দিকে সম্প্রসারিত করে রেখেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি আমার রাহবার বললেও অতিরঞ্জিত হবে না।

চার

পনেরই আগস্ট। কারাগারে রোজকার নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রত্যেক দিন ভোর ৫টার সময় সূর্যোদয়ের পূর্বেই যথারীতি আমাদের সেলের ফটক খুলে যায়। অথচ আজ নিয়মের ব্যতিক্রম সেলের মধ্যে অস্থিরতা ও আশঙ্কাজনিত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। হলোটা কি! ৬টার ঘন্টা বাজল তবু কারো সাড়া নেই। বাজল ৭টা এখনও আমরা অন্ধ প্রকোষ্ঠে সূর্য ওদিকে তাতিয়ে উঠছে। উত্তাপ বিকিরিত হচ্ছে। উত্তপ্ত হচ্ছে পৃথিবী। আমাদের ভাবনাও একই রকম উত্তপ্ত। বাইরের সংবাদ থেকে আমরা বিছিন্ন। অতএব আল্লাহ ভরসা।

৮টার ঘন্টা পড়ল। পদশব্দ শুনলাম। সেন্ট্রী সম্ভবত এগিয়ে আসছে। কারা প্রাচীরের ফটক খুলে দেয়া হল। আমরা এখনও যে যার সেলে আবদ্ধ। অবশেষে একে একে সবক'টা সেলের দরজা উন্মুক্ত হল। আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসে বাইরের দিকে তাকালাম। কারাগারের অদূরে দালানগুলোর ছাদে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অগণিত জনতার ভিড়। এমনটি দেখিনি আর কোন দিন। হাত নাড়িয়ে আমাদের ওরা কি যেন বলতে চাচ্ছে। অনেকের হাতে রেডিও ট্রানজিস্টার অথবা টু-ইন-ওয়ান। আমাদের দিকে উঁচু করে ধরে আছে। ওরা আমাদের যেন কি বলতে চায়। ওদের অঙ্গভঙ্গির সাংকেতিক ভাষা কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে মনে হল বাইরে অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটেছে। দূরে থেকে নজরুলের একটা গানের কলি ভেসে আসছে- মোহম্মদ মোস্তাফা সাল্লেআলা, তুমি বাদশাহর বাদশাহ কমলিওয়ালা।

স্রোত কি তাহলে উজানে বইতে শুরু করল! উল্টো হাওয়া দেখে কি ভাবতে পারি শ্রাবণ মেঘে ফাগুনের পূর্বাভাস। সূর্য পশ্চিম দিকে উদয়ের মত অস্বাভাবিক মনে হল সবকিছু। জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলায় একি অশনি সংকেত। শাহজালালের পদধ্বনি কেন?

গানটা শোনার পর কারাবাসীদের সকলের আগ্রহ আরও তীব্র হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সকলেই এগুতে লাগল দালানগুলোর কাছাকাছি পাঁচিলের দিকে। কিন্তু পুলিশ এসে বাধা দেয়াতে সকলেই ফিরে এলেন। তবে অল্প সময়ের

মধ্যে পুলিশদের মাধ্যমে জানতে পারলাম- শেখ মুজিব নিহত। সেনাবাহিনী মুজিবকে হত্যা করেছে। আমার তক্ষুণি সিজাদায় লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। মহান খোদার উদ্দেশ্যে বললাম, 'ইয়া মাবুদ! তুমি ছিলে, তুমি এখনও আছ। তুমি কোন ব্যাপারে গাফেল নও। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে! তুমি আধুনিক দুনিয়ার নব্য নমরুদ-শাদ্দাদের পতন ঘটিয়ে প্রমাণ করলে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমিই সমস্ত সার্বভৌমত্বের মালিক।'

কারাগারের ডাক্তার মঈনুদ্দিন সাহেব আমার প্রতিক্রিয়া জানাতে চাইলে আমি বললাম- 'একটা জগদ্দল পাথর যেন জাতির বুক থেকে সরে গেল। দুর্নীতির ভাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা পাহাড় যেন ধসে পড়ল।' ধোঁকাবাজী, মিথ্যাচার আর সন্ত্রাসের ওপর গড়ে ওঠা রাজপ্রাসাদ তাসের ঘরের মত ভেঙে খান খান। আমার মনে হল- হিন্দুস্তান ও তার উচ্চাভিলাষী কতিপয় দালালদের হাতে বন্দী ১০ কোটি মানুষ আজ মুক্ত। সোনার বাংলার ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে কঙ্কালসার মানুষগুলো আজ প্রাণ ভরে মুক্তির নিঃশ্বাস নিবে।

কারাগারে শিক্ষক মতিউর রহমান সাহেব স্কুলে আজ যথানিয়মে না এসে একটু দেরীতে এলেন। তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার কারণে আজ মুক্তির এই আনন্দ-ঘন দিনে তার প্রাণের আবেগ নিয়ে অনেক কিছু বললেন- 'আমি আসার পথে দেখলাম মোড়ে মোড়ে ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে অস্ত্র নিয়ে সেনাবাহিনীর জোয়ানরা টহল দিচ্ছে গোটা শহরে। তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উল্লসিত জনতার উদ্দেশ্যে বলছে- 'আপনারা ধৈর্য ধরুন আল্লাহর সাহায্যের জন্য দোয়া করুন, সময় ভাল নয়। আপনারা জটলা অথবা ভিড় করবেন না।' তার ভাষায়- 'সেনাবাহিনীর বিনম্র আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। মনে হয় তাদের এই ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ মহান উদ্দেশ্যে এবং জাতির কল্যাণের জন্য।'

জাতির এই ঘোর অমানিশায় এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে জানবাজী রেখে যারা এই বিপ্লব ঘটিয়েছে আমি তাদের জন্য দোয়া করলাম। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম এই বলে- 'ইয়া মওলা! এই বীর সৈনিকদের হাতগুলো মজবুত করে দাও। হিম্মত দাও এদের বাহুতে।'

আবার বলতে হয় নিউটনের তৃতীয় সূত্র- 'প্রত্যেক ক্রিয়ার সমমূখী ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।' তার প্রমাণ এতদিন যারা দালালীর অভিযোগ এনে দেশপ্রেমিক মানুষগুলোকে অন্ধকারার বদ্ধ প্রকোষ্ঠে আটকে রেখেছিলেন আজ তারাই বিদেশী এবং বিজাতীয় দালালীর তিলক পড়ে আসতে শুরু করল। আর আমাদের শুরু হল একে একে বিদায়। রবীন্দ্রনাথের সেই গানের কলির মত- 'তোমার হল শুরু আমার হল সারা।'

লাল বাহিনী প্রধান শ্রমিক নেতা আব্দুল মান্নান, যে একদিন কেন্দ্রীয় কারাগার ঘেরাও করেছিল, সাথে তার শত শত লাল বাহিনীর বরকন্দাজ। উদ্দেশ্য রাজাকার আল-বদর আল-শামস আর শান্তি কমিটির লোকজনদের হত্যা করবে। সেদিন পারেনি। কিন্তু আজ নিয়তির কি নির্মম পরিহাস- তাকে আসতে হল কারাগারে আলবদর আর রাজাকারদের মধ্যে। এদের করুণা নিয়ে তাকে বাঁচতে হয়। এদের দয়ায় তার পিঠ বাঁচে। তবু কি শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পেরেছে? তার যন্ত্রণায় উত্যক্ত পুলিশেরাই তার সেলে পিঞ্জরায় আবদ্ধ জানোয়ারের উপর অত্যাচারের মত করে তার ওপর নিপীড়ন চালায়। তারই রক্তে লালে লাল হয়ে ওঠে সেল প্রকোষ্ঠের মেঝে।

একে একে আসে তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, জিল্লুর রহমান, তোফায়েল আহমদ, শামসুল হুদা, কোরবান আলী, এম এ রেজা, আবদুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী আরো অনেকে।

কয়েকদিন পর আসে কাজী আঃ বারী। যে আমাকে হত্যা করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজেছে, তাদের তথাকথিত বিজয়ের দিন গুলোতে। এর পরে এলেন আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতারা এদের মধ্যে ছিলেন সাবেক ডি সি আহমদ ফজলুর রহমান (ফরিদপুর), আলী রেজা (কুষ্টিয়া), কামাল সাহেব (নোয়াখালী), মাহবুবুল আলম চৌধুরী (হবিগঞ্জ)। এই ষড়যন্ত্রকারীদের পেলাম আমি অত্যন্ত কাছাকাছি। আমার ১০ সেল ডিভিশনে ছিল তাদের অবস্থান। সার্বক্ষণিক দেখা-সাক্ষাত ও কেরাম খেলার মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা নিবিড়ের পর্যায়ে এসে পড়ে। মোমেনশাহী ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃস্থানীয় কর্মী, সুমসাম ভাই, কামাল সাহেবের শ্যালক হওয়ার কারণে

কামাল সাহেবের সাথে আমার সম্পর্কটা আরও নিবিড় আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সুমসামের অনুপস্থিতিতে তার সাথে আমার সম্পর্ক সুমসামের অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়। নিকটতম আত্মীয় সুমসামের চরিত্র ও চিন্তা চেতনার সাথে তার পরিচয় ছিল। আমার প্রতিও তার কোন রকম বিরূপ ধারণা জন্মেনি। আহমদ ফজলুর রহমান ছিলেন স্বল্পভাষী কিন্তু একরোখা মানুষ। তার সাথে আমার আলোচনা প্রায়ই উত্তপ্তের পর্যায়ে এসে যেত। তার দাবী আজকের বাংলাদেশের স্থপতি তারাই। তারাই এই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক। তার ভাষায়- 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরাই আগরতলায় একটি তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রের খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করি। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হলে ভারতের সাথে যোগসাজশ ছাড়া ভিন্ন কোন পথ ছিল না।' বললাম, 'এ ব্যাপারে আপনার সাথে একমত। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ইংরেজদের সাহায্য নেয়া ছাড়া মীরজাফরের কোন বিকল্প ছিল না। মীরজাফরের অসদুদ্দেশ্য ছিল এমনটি বলা যায় না। ইতিহাস যাই বলুক, সিরাজের বালসুলভ স্বৈরাচার ও রাজনৈতিক অব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছিলেন মীরজাফর।' যদিও সিরাজ স্বৈরাচারী ছিলেন এ কথা সত্য নয়।

'আপনি আমাদের মীরজাফরের সাথে তুলনা করতে চান?' একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন রহমান সাহেব।

বললাম- 'ভুল বুঝবেন না। মীরজাফরের উদ্দেশ্য আপনাদের মতই হয়তো বা মহত ছিল। কিন্তু আপনাদের মত তিনিও পরিণতির গভীরে যেতে পারেননি। এর ফলে যা হাবার তাই হয়েছে। স্বাধীন বাংলার সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি ক্লাইভের সাথে যে ঔদ্ধত্য নিয়ে আগে কথা বলেছেন, বাংলার নবাব হয়ে তার সেই ঔদ্ধত্য আর আত্মবিশ্বাস গুঁড়িয়ে গেছে। নবাবীর মসনদে বসেও মীরজাফর ক্লাইভের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস করেননি। যেমন শেখ মুজিব দিল্লীর অনুমোদন ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার সাহস রাখতেন না। অথচ একদিন এই মুজিবের হুঙ্কারে প্রেসিডেন্ট ইহাহিয়া পর্যন্ত তার ধানমন্ডির বাসভবনে ছুটে এসেছেন। ইতিহাসের করুণ পরিণতি তো এটাই। আমাদের দুঃখ তো ওখানেই।'

ফজলুর রহমান সাহেব আমার কথায় আরও একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। চড়া গলায় বললেন- 'আপনি কি বলতে চান? এত হত্যা এত জ্বালাও পোড়াও, এত অত্যাচারের পরও কি বলতে চান স্বাধীনতা আন্দোলন ঠিক হয়নি? অথবা ভারতের সাহায্য নেয়া অন্যায় হয়েছে?

বললাম- 'মাফ করবেন। আপনাকে আহত করার কোন ইচ্ছেই আমার মধ্যে নেই। ২৩ বছরের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় একাত্তরে এই যে নজীরবিহীন জুলুম নেমে এসেছে, এটা কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে। সুপরিকল্পিতভাবে এটা আনা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের আগে এই হত্যার সূচনা করল কারা? সান্তাহারের গণহত্যা কার ইঙ্গিতে? পাকসী হার্ডিঞ্জ সেতুর নিচে হাজার হাজার অবাঙালী বৃদ্ধ বৃদ্ধা নারী- পুরুষ শিশু হত্যা করল কারা? খুলনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, নড়াইল, খালিশপুর, সাতক্ষিরা, কুষ্টিয়া, নওগাওঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নীলপামারী, সৈয়দপুর, বগুড়া, কোর্ট চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, ভৈরব- বাক্ষণবাড়িয়া- কুমিল্লা, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, খালিশপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কসবা এদেশের প্রত্যেকটি জায়গায় প্রত্যেকটি অঞ্চলে বর্বেরোচিত হত্যাকাণ্ডের উদ্বোধন আওয়ামী পঞ্চমবাহিনী করেনি কি? গণ- উত্তেজনা সৃষ্টি করে শত শত ইপিআর, সেনাবাহিনীর সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গকে গরু ছাগলের মত হত্যা করা হয়েছে। এমনকি সদ্য ভূমিষ্ট শিশুকেও রেহাই দেয়া হয়নি। এর পরও বলতে চান সশস্ত্র বাহিনী তাদের হত্যাকারীকে চমু খাবে? এমনটি হবে না জেনেই আওয়ামী পঞ্চমবাহিনী ইচ্ছা করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। তারা চেয়েছিল- সেনাবাহিনী জনগণকে অত্যাচার করুক। তাহলে তারা হিন্দুস্তানে যেতে বাধ্য হবে। এই দুর্বলতার সুযোগে তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে অস্ত্র। এটা কিন্তু আমার বক্তব্য নয়; কোলকাতায় সাপ্তাহিক 'দেশ' এর রূপদর্শীর প্রতিবেদন থেকে বলছি। এই পত্রিকায় মুজিব ভুট্টো উভয়কেই হিন্দুস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা জঅউ (পরবর্তীতে জঅড) - এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই উভয় নেতার বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি, ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ধ্বংসের পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হন।'

ফজলুর রহমান সাহেব মনোযোগ ও ধৈর্যের সাথে আমার কথা শুনলেন। যদিও তার মধ্যে অস্বস্তিকর উত্তেজনা আমি লক্ষ্য করেছি। আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্য আর একজন কামাল সাহেব মুখ খুললেন। বললেন- 'আপনি কি বলতে চান বৈষম্য ছিল না? বলতে চান বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা অন্যায় হয়েছে?

বললাম- 'বৈষম্য ছিল না এমনটি আমি বলিনি। বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে অন্যায় অথবা অযৌক্তিক- ইবা বলব কেন? গণ আন্দোলন ও শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈষম্য দূর করা যেত এটাও আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এর জন্য আমাদের জাতীয় দুশমন হিন্দুস্তানের সাহায্য নিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে রক্তাক্ত পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে হবে, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ এটাকে মেনে নিবে কি করে?

আমি আবার বললাম- 'ধরুন বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল শিল্প কারখানা ও সমৃদ্ধির দিকে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, উত্তরাঞ্চলের অবস্থা তেমনই অপরিবর্তিত ও করুণ। এর সমাধান শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় না হয়ে যদি কেহ বিদেশী সাহায্য নিয়ে উত্তরবঙ্গকে পূর্বাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ নেয় এবং সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তাহলে এটাকে একটি সার্বভৌম সরকার কিভাবে নিবে? অথবা আপনি এটাকে কিভাবে নিতে পারেন? আপনি কি চাইবেন বাংলাদেশ দুটো ভাগ হয়ে যাক?'

কামাল সাহেব কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন- 'সামরিক চক্র শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হতে কোন দিনই দিতো না।' বললাম- তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিকচক্র একটা বিরাজমান সমস্যা এটাকে স্বীকার করি। কিন্তু এ সমস্যা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের এমনটি নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সমস্যা ছিল ঐ একই। যেমন উনসত্তুরের গণআন্দোলন। যার মাধ্যমে মুজিব কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন, এটাতো সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। যদিও এই গণআন্দোলন সৃষ্টির মূলে আওয়ামী লীগের কোন হাত ছিল না। এমনি করে সম্মিলিত উদ্যোগ নিয়ে তো আমরা সার্বিক সমস্যার সমাধান করতে পারতাম।' রহমান সাহেব বললেন- 'আপনি পশ্চিমাদের মন মানসিকতা জানেন না। শুরু

থেকে তারা আমাদের ওপর তাদের মন- মানসিকতা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। তা না হলে জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দেয়ার অর্থ কি?'

আমি বললাম- কায়েদ আযম মুহাম্মদ আলী 'জিন্নাহর সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে কিন্তু অসদুদ্দেশ্য- প্রণীত নয়। কেননা পশ্চিম পাকিস্তানের গণমানুষের মুখের ভাষা উর্দু নয়। উর্দুকে তিনি পূর্ব পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের সেতুবন্ধন তথা কমন ভাষা হিসেবে চিন্তা করেছিলেন। এ সিদ্ধান্ত হয়তো তার ভুল। এ ভুল সিদ্ধান্ত গণ- আন্দোলন অথবা শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পাল্টানো সম্ভব ছিল। পরবর্তীতে সেটা হয়েছেও। যে ভাষা আন্দোলনকে পুঁজি করে তথাকথিত জাতীয়তাবাদকে সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে আপনারা নিয়ে এসেছেন সেই ভাষা আন্দোলনের উদ্যেক্তরা কিন্তু আপনাদের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী অপকর্মের শরিকদার নয়। তাদের অধিকাংশ আপনাদের পরিভাষায় দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীল- যেমন অধ্যাপক গোলাম আযম, অধ্যক্ষ আবুল কাশেম এবং আরও অনেকে। আপনি কি বলতে চান তাদের দেশপ্রেমের অভাব রয়েছে?

প্রাসঙ্গিকভাবে আমি আরও বললাম- 'পাকিস্তান ছিল জনগণের রায়। এটা চাপানো কোন বস্তু ছিল না আপনারা এই রায়কে পাল্টে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছেন। আপনাদের অপরাধ নৈতিকতার মাপকাঠিতে কি পর্যায়ের ভেবে দেখেছেন কি? অথচ যারা সেই রায়কে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করেছে তারাই দেশের শত্র", আপনাদের পরিভাষায় দালাল। আচ্ছা বলতে পারেন, হিন্দুস্তানের ছত্রছায়ায় বন্ধুকের নলের মুখে তথাকথিত বাংলাদেশ হওয়ার পর আজও কি এ ব্যাপারে কোন রেফারেণ্ডাম হয়েছে? হয়নি। অথচ যে কোন সচেতন ব্যক্তি এ কথাই বলবে রেফারেন্ডামকে একমাত্র রেফারেন্ডামের মাধ্যমে পাল্টান সম্ভব। এমনকি হিন্দুস্তানের ব্রাহ্মণ্যচক্রের উর্বর মস্তিস্ক থেকে উৎসারিত মুজিব প্রণীত ৪টি মূলনীতির ব্যাপারেও জনগণের রায় নেয়া হয়নি। সবকিছু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা জানে জনগণ এসব প্রত্যাখ্যান করবে। মুজিববাদ ও তথাকথিত প্রগতিশীলদের গণতন্ত্র একটি ভণিতা, একটি মুখোশ এবং রুশ- ভারত চক্রের নীলনক্সা বাস্তবায়নের হাতিয়ার।'

১৫ আগস্টের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে জনাব রহমান বলেন- 'রেডিও খুলে আমি হতবাক। ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান বলে বিশ্বাসই হচ্ছে না। গানগুলো পাকিস্তানী মার্কা ইসলামী গান। একের পর এক সম্প্রচারিত হচ্ছে। ভাবলাম এ আবার কি? ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে এ কোন অশনি সংকেত! রেডিওর নব ঘুরাচ্ছি। বার বার নেড়ে চেড়ে দেখছি ঢাকা কিনা। ঘোষণা শুনলাম- খুনী মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। পৃথিবীটা যেন কেঁপে উঠল আমার সামনে। থরথর করে কাঁপছে আমার দুটো পা । পা বাড়াতে পারছি না। বসে পড়লাম। মনে হল পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে আসছে। মুজিব ভাই, বঙ্গবন্ধু নিহত! না, এ হতে পারে না। অবিশ্বাস্য মনে হল আমার কাছে। সাহসে ভর করে উঠলাম। বন্ধুমহলে টেলিফোন করলাম। সবখানে একই বিস্ময়! কোন কোন টেলিফোনে রিং হচ্ছে কিন্তু কেউ রিসিভ করছে না। সময় অস্বস্তি আর অস্থিরতার মধ্যে এগিয়ে চলছে। খন্দকার মোশতাক আহম্মদ ভাষন দিলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন। ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। এর একটা ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অঙ্কের হিসেবে কেমন যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। এক বিরাট রক্ষীবাহিনী, যাদেরকে মুজিবের কট্টর সমর্থক হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। মুজিব সমর্থকদের হাতেও তখন প্রচুর হাতিয়ার। সেনাবাহিনীর কিছু অংশ বিরূপ থাকলেও বিরাট অংশ রয়েছে সমর্থনে। তা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াহীন ভাবেই সারাটা দিন কাটল। রাত পেরুল, আবার সকাল হল, দেশের কোথাও কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে শুনলাম না। এমনকি ভারত ও এল না কোন সাহায্য নিয়ে। মনে হল গোটা জাতি মরে গেছে।'

জবাবে আমি বলেছিলাম- 'সম্মোহিত গোটা জাতির চেতনা তখন ফিরে এসেছিল বলে কোন পক্ষ থেকে কোন প্রতিরোধ আসেনি। গোটা জাতি মুজিব হত্যাকারীদের অভিনন্দন জানিয়েছে। একাত্তরে যে সম্মোহিত জাতি পাকিস্তানের কারাগারে থাকার কারণে মুজিবের জন্য কেঁদেছিল পঁচাত্তরে এসে সেই জাগ্রহ জাতি তার মৃত্যুর জন্য উল্লাস করেছে। এ থেকে আপনাদের বুঝা উচিত আপনারা জাতীয়তাবাদের যে উন্মাদানা ছড়িয়েছিলেন সেটা ছিল কৃত্রিম ও সুপরিকল্পিত। আপনারা নিজেদের ভাবেন সুচতুর ষড়যন্ত্রকারী, কিন্তু আল্লাহ

বলছেন, 'আমিই সবচাইতে বড় কৌশলী।' আর এও জানা উচিত- কিছু মানুষকে কিছু দিনের জন্য সম্মোহিত করে রাখা সম্ভব হলেও চিরকাল সম্ভব হয় না। ইতিহাস তার নিজস্ব গতিধারায় এগিয়ে চলে।'

আমার কথাগুলো তারা কিভাবে গ্রহণ করলেন জানিনা। তবে তিনি বললেন- 'সবচাইতে অবাক হলাম যখন আমাকে গ্রেফতার করা হল এবং ভারতের সাথে আমাদের যোগসাজসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল। আমাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালান হল। পশুসুলভ আচরণ করা হয়েছে আমাদের ওপর। উল্টো করে টাঙ্গিয়ে চাবকালো তারা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত। সবচাইতে বড় কথা তারা যে ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেটা বাংলা নয় উর্দুতে। মনে হল আমি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী। ভাবলাম ইতিহাসের গতি কি তাহলে উল্টো দিকে?'

কামাল ভাই বললেন- 'আমার উপর নির্যাতনের কথা কোন দিনও ভুলব না। আজও সে নির্যাতনের কথা মনে হলে শিউরে উঠি। এ নির্মমতা পাকিস্তানীদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের উপর তাদের যেন এক আদিম আক্রোশ জমে ছিল পাকিস্তানী মন- মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ আজও সেনাবাহিনী দখল করে আছে। তিনি আরও বললেন, আমাদের ত্যাগের বিনিময়ে এই বাংলাদেশে পাকিস্তানী মানসিকতাকে লালিত হতে দেব না। আমরা বাইরে বেরিয়ে আবার প্রতিরোধ গড়ে তুলব।'

অনুরূপ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম আলী রেজা। তার ভাষায়

'বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশী সৈনিক দ্বারা আগরতলা ষড়যন্ত্রকারী বলে নির্যাতিত হব এমনটি ভাবতে পারিনি কোন দিনও।'

পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পরে আব্দুল কুদ্দুস মাখন কারাগারে অন্তরীণ হলে তিনি আমাদের পাশের সেলে থাকতে লাগলেন। তার সাথে ছিলেন তার চাচা ও তার ভাই হুমায়ুন। বাংলাদেশ আন্দোলনে চার যুব- নেতার তিনি অন্যতম হলেও আমার ইতিবৃত্ত জানার পর আমার প্রতি তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য

করিনি বরং তার সাথে আমার সম্পর্ক সদ্ব্যবহার থেকে সখ্যতায় পরিণত হয়। তার সাথে আমি প্রায় প্রতিদিন ব্যাডমিন্টন খেলতাম খেলার মাঠে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মযহারুল ইসলামের সাথে প্রায় দেখা হত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল তসরুফের আসামী হিসেবে কারাগারে ছিলেন। তার রবীন্দ্রপ্রীতির আতিশয্য এত অধিক ছিল যে শেষ পর্যন্ত সেটা পরিবর্তিত হয়ে হিন্দুপ্রীতিতে পরিণত হয়। তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-বোধ লোপ পেয়েছিল পুরোপুরি। হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে অবগাহন করার ব্যাপারে এতটুকু সংশয় ছিল না। কোন জাতির মগজে পঁচন ধরলে সে জাতি অধঃপাত ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মযহাবের প্রত্যক্ষ সাহচর্য না পেলে সম্ভবত সেই পঁচনের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারতাম না। বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে তিনি কর্টাক্য করতেন। তিনি অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী ছিলেন হিন্দুস্তানের সাথে বাংলাদেশ বিলীন হওয়ার মধ্যেই নাকী বাংলাদেশের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ নিয়ে তার সাথে বহুবার বহুভাবে আলাপ হয়েছে। তার সাথে উত্তপ্ত বিতর্কে লিপ্ত হতেন পাবনার সার্কেল অফিসার জনাব আবদুল কাদের খান। জনাব খান এক মিথ্যা মামলায় আটক ছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতির ওপর তার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল।

আমাদের আলোচনা পর্যালোচনা বাইরের যুদ্ধংদেহী রাজনৈতিক প্লাটফর্মের মত ছিল না। প্রত্যেকে তার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তির অবতারণা করতেন এবং ধৈর্য সহকারে শুনতেন। আওয়ামী লীগের অন্যান্যদের চাপ থাকা সত্ত্বেও মাখন ভাই আমাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। তার অন্তরে অনুশোচনার ঝড় বইছে এমনটি বাহির থেকে বেশ দেখা যেত। ঐদ্ধত্যপূর্ণ অশালীন মন্তব্য করতে আমি কোন সময়ই তাকে দেখেনি। তিনি ছিলেন প্রশান্ত-চিত্ত ও সদালাপী একই রকম অনুভূতি আমি লক্ষ্য করেছি জিল্লুর রহমান সাহেবের মধ্যেও।

ডক্টর মযহার ও জাসদের এম এ আওয়ালের মত দুর্নীতির পাঁক থেকে যারা উঠে এসেছেন ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ তাদের মধ্যেই বেশী ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল। 'বাহাত্তরে ভুল করেছি আলবদর রাজাকারদের ক্ষমা করে আগামীতে সুযোগ এলে আর ক্ষমা করব না।'

আমি বলেছিলাম, 'আলবদর রাজাকার আর তাদের ভাষায় পাকিস্তানের দালালেরা আকাশ থেকে নাযিল হয়নি, এই মাটি এই আবহাওয়ায় তারা জন্ম নিয়েছে। এখানের এই পরিবেশে তারা লালিত। এ কারণে শিকড়ও এ মাটির গভীরে বিস্তৃত। এক সময় এ জাতিকে সম্মোহিত করে হিন্দুস্তানী তলোয়ারের ছায়াতলে যা ইচ্ছে তাই করেছেন। যাকে হত্যা করা সম্ভব করেছেন তার বেশী আর অগ্রসর হলে পঁচাত্তরের অনেক আগেই উৎখাত হতে হত। ভবিষ্যতের কথা বলছেন, সে সুযোগ আর এ দেশের মানুষ আপনাদের দিবে না। কোটি কোটি মানুষের কাছে আজ আপনাদের হিন্দুস্তানের দালালীর চেহারা স্পষ্ট। সাড়ে তিন বছরে জাতিকে আপনারা কি দিয়েছেন? খুন খারাবী লুটপাট ধোকা ছাড়া কিছু দিতে পারেননি।'

তারা বলেন 'এই আলবদর রাজাকারদের জন্য আমরা কিছু করতে পারিনি।' বললাম, 'ঠিক বলেছেন। এদের জন্য নাটকের শেষ পরিণতি টানতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভারতের হাতে এ দেশটাকে তুলে দেবার শেষপর্ব আর আনতে পারলেন না। পরিণতির আগেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হল। আপনাদের দুঃশাসনের দিনগুলোতে কোথায় কোন আলবদর রাজাকার আল শামস আপনাদের অগ্রগতি রোধ করেছিল? তারা হয়তো ছিল কারাগারে অথবা ছিল পালাতক। এমন নির্বিঘœ সময় আর কি আপনারা পাবেন? শেখ মজিব যে বিষ পান করেছিলেন তার প্রতিক্রিয়ায় সোনার বাংলা উজাড় হয়ে গেছে সাড়ে তিন বছরে। মুজিব ৮ কোটি মুসলমানের ইজ্জত ও আযাদীকে বিক্রি করার ব্যাপারে যে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সবংশে নিপাত হয়ে তাকে তার কাফফারা আদায় করতে হয়েছে। মুজিবের এই জিল্লতিপূর্ণ মৃত্যুর জন্য দায়ী মূলত আপনারাই। আপনারাই মুজিবের হাত পা বেঁধে রেখেছিলেন। চাটুকারিতার চক্রান্ত বিস্তার করে মুজিবকে পরিস্থিতি আঁচ করতে দেননি। তাকে বাস্তব গণচেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। মুজিবের সত্যিকার ভক্ত ও অনুরক্ত যদি এদেশে থেকে থাকে তাহলে তাদের উচিত হবে আপনাদের চিহ্নিত করা। আর মুজিব ভক্তরা যদি আপনাদের ক্ষমা করে তাহলে ইসলামী জনতার আদালতে আপনাদের একদিন দাঁড়াতেই হবে। সেদিন পালানোর আর সুযোগ হবে না। তথাকথিত জাতীয়তাবাদীর অধীশ্বর যেমন সে সুযোগ পায়নি।'

কথার প্রেক্ষিতে অনেক কথা এসে গেছে। ডক্টর মযহারকে অবমানা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। সেদিন ডক্টর মযহার তেমন জোরালো প্রতিবাদ করেননি। তাকে নীরব আক্রোশে ফুঁসতে দেখেছি। তবে আমাকে ঘায়েল করার জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। আমার সাথে মতবিরোধের প্রেক্ষিতে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে আওয়ামী লীগের কেউ যেন আমার সাহচর্যে না আসে, আওয়ামী লীগ নেতারা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এটা হয়েছিল ডক্টর মাযহাব সাহেবের ইঙ্গিতে।

একদিন খেলার মাঠে আমি, মাখন ভাই ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম। হাজী রফিক মওলানা বেলাল, মিস্টার গোমেজ আরও অন্যান্য লোক দাঁড়িয়ে ছিল। এক পর্যায়ে আমাকে অপ্রস্তুত করার জন্য ডক্টর মযহার একটু মিষ্টি হাসি দিয়ে বললেন, 'আমিন যে স্বেচ্ছায় আলবদরে যোগ দিয়েছিল এটা আমরা মনে করি না। প্রেসারে যেতে বাধ্য হয়েছিল।'

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু একথাই বলেছিলাম 'আমি জেনে শুনে ঈমানের দাবীতে একাজ করেছি। আমি এ জন্য অনুতপ্তও নই ক্ষমাপ্রার্থীও নই।'

আওয়ামী লীগ ও জাসদের সাথে আমাদের একটা স্নায়ু-যুদ্ধ কারাগারের অভ্যন্তরে চলতে থাকে। যদিও কিছুদিন আগে পর্যন্ত সৌহার্দ পূর্ণ সহ-অবস্থানের মনোভাব বিরাজ করছিল। ডক্টর মযহার, কাদের সিদ্দিকীর ভাই লতিফ সিদ্দিকী, পাবনার রফিকুল ইসলাম বকুল, এমপি এম, এ আউয়াল প্রমুখ উগ্রবাদীদের প্ররোচনায় কারাবাসীদের মধ্যে পোলারাইজেশন শুরু হয়। স্পষ্টত দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে কারাবাসীরা।

ডিআইজি অব প্রিজনস্ কাজী আব্দুল আউয়াল সাহেবের পদোন্নতি হলে তিনি সেক্রেটারিয়েট চলে যান। তার এ শূন্যস্থানে মোমেনশাহীর জেল সুপার ডিআইজি হয়ে ঢাকায় এলেন। আমাদেরকে নতুন এক বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের ঘোর সমর্থক ও উগ্রপন্থী তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা। ডক্টর মযহার, আবদুল কুদ্দুস মাখন, রফিকুল ইসলাম বকুল ও শেখ মুজিবের তথাকথিত গভর্নর নূরুল হকের প্ররোচানায় জেল

সুপার আমাদের সকলকে দেশের বিভিন্ন কারাগারে স্থানান্তরের আদেশ দিয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেন। ১০ সেল ডিভিশন থেকে সরিয়ে ২০ সেল ডিভিশনের সেই কুঠুরীটি আমার জন্য বরাদ্দ করা হয়, যে কুঠরীতে কিছুদিন আগে জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল।

ডিআইজি, জেল সুপার ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নিষ্ঠুর পদক্ষেপের ফলে কারাগারে যেসব বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তার একটি তুলে ধরছি নারায়ণগঞ্জের মুসলিম লীগ নেতা হাজী রফিক ও তার অন্ধ পিতা দালাল আইনে দীর্ঘ দিন ধরে আটক ছিলেন কেন্দ্রীয় করাগারে। এখানে একই সেলে পিতার অন্ধের যষ্টি হয়েই ছিলেন হাজী রফিক। কারা কতৃপক্ষের নতুন নির্দেশের ফলে অন্ধ পিতাকে একাকী কারাগারে বদ্ধ প্রকোষ্ঠে রেখে তাকে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে যেতে হল। যাবার মুহূর্তে আমরা দেখেছি তার অন্ধ পিতার বুক চাপড়ানো কান্না আর আহাজারি। তাকে দেখা শোনা এবং সেবা শুশ্র"ষার জন্য কোন লোক আর তার পাশে রইলো না। হাজী রফিকের পিতার দুরবস্থা দেখে কারাগারের প্রায় প্রতিটি মানুষই চোখের পানি ফেলেছে। কিন্তু ডক্টর মযহার ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের চোখে মুখে আমরা দেখেছি বর্বরোচিত উল্লাস।

অধিকাংশ জাসদ নেতা ও কর্মী আটক ছিলেন ২০ সেল ডিভিশনে। এখানে এসে প্রথমত যে ক'জনের সাথে আমার পরিচয় হয় তারা হল আমাদের বন্ধু সৈয়দ নেসার নোমানীর ভাই বাহাউল হক সবুজ, কর্নেল তাহেরের ভাই বেলাল, অধ্যাপক আনোয়ার ও ইউসুফ ভাই। এদের সাথে সম্পর্ক দু'-একদিনের মধ্যে আন্তরিকতার পর্যায়ে পৌঁছে। এদের সূত্র ধরে জাসদের সব ক'টি দুঃসাহসিক তরুণের সাথে আমি পরিচিত হই। পরে সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠে। এদের নিয়ে প্রত্যেক দিন এক সাথে ব্যায়াম করতাম। রাজনৈতিক মত বিনিময় হত প্রায় সবসময়। আমাকে আমার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জেল সুপার যে মানসিক নির্যাতন চালাতে চেয়েছিলেন সেটা আর হল না বরং আমার চারিদিকে একটি নতুন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে সক্ষম হলাম। জাসদের তরুণরা আমার ওপর দারুণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

অল্প কিছু দিনের মধ্যে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে বেশ কয়েকটা দিন আমাকে কারাগারের হাসপাতালে অবস্থান করতে হয়। সুস্থ হয়ে উঠলে ২০ সেল ডিভিশন আর ফেরা হল না। আমার জন্য ২৭ সেল ডিভিশনের একটি কক্ষ বরাদ্দ করা হল। এটাও আমার নতুন পরিবেশ। আমাকে সার্বক্ষণিক বিব্রত রাখার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র এসব। এখানে আসার পর প্রথমত একাকী মনে হলেও পরবর্তীতে অনেকের সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হই। আমার পাশের সেলে থাকতেন আইনাল শাহ। তিনি একজন সাধক ছিলেন। খুনের আসামী হয়ে তিনি কারাগারে প্রবেশ করেন। সেই থেকে আজ অবধি তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন। ১৯৭১ সালে কারাগারের ফটক খুলে দেয়া হলে সমস্ত কয়েদী পালিয়ে গেলেও আইনাল শাহই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার অবস্থান থেকে এ পর্যন্ত নড়েননি। তাকে সব সময় দেখতাম তসবিহ তহলীল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। নামাজ পড়তে দেখিনি কখনও। কারাগারে থাকা অবস্থায় তার কাছে সাবেক রেডক্রস চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফা তার সহচর্য লাভের জন্য তার কাছে প্রায়ই আসতেন। গাজী গোলাম মোস্তাফার প্রতি আমার অত্যন্ত বিরূপ ধারণা ছিল বলে দু'একটি বাক্যালাপ ছাড়া সহজ ও স্বাভাবিক আলাপ হয়নি। আমার মনে হত কারাগারে গাজী গোলাম মোস্তফা তার অতীত কৃতকর্মের জন্য নিজেকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অপরাধী ভাবতেন। আইনাল শাহের প্রতি গোলাম মোস্তফার এই দুর্বলতাকে তার পুঞ্জীভূত পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবার প্রয়াস বলে আমার মনে হয়েছে।

এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী কোরবান আলী সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। তাকে অনুতাপে দগ্ধ হতে দেখি। আমার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত এবং ৫ বছরের কারাবাসের পরও আমার অনমনীয় মনোভাব দেখে তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি আমার কাছ থেকে মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সাহিত্য চেয়ে নিতেন এবং মনোযোগ সহকারে পড়তেন। তিনি বলেন 'ইসলাম সম্বন্ধে যে ধ্যান ধারণা, যে আলো আমি পাচ্ছি, এটা আমাদের সামনে এতকাল ছিল না।'

তার কথা শুনে নিজেদের অপরাধী বলে মনে হল। গোটা জাতির সামনে আমাদের চিন্তাধারা ও ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন না করতে পারার জন্য আজকে গোটা দেশ, গোটা জাতি অন্ধকারের আবর্তে খাবিখাচ্ছে। যদি সঠিক সময়ে ইসলামকে ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করতে পারতাম তাহলে হয়তো আমাদের ভাগ্যাহত জাতি ভাবাবেগে তাড়িত হতো না। ইতিহাসের চেহারা হত উল্টোটা।

প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি বলেন 'আপনাদের নেতাদের বলুন 'আমার কারামুক্তির ব্যাপারে চেষ্টা তদবীর করতে, আমি বেরিয়ে জামায়াতে ইসলামী করব।' একই কথার প্রতিধ্বনি শুনি নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন এমপি এবং শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহচর জনাব শামসুজ্জোহার কণ্ঠেও। তার সাথে একই সেলে অনেক দিন অবস্থান করেছি। ইসলামী সাহিত্য ও মওলানা মওদূদীর রচনাবলীর সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমার সাহচর্যে থেকে। ওদিকে হাসপাতালে অবস্থানকালে মোমেনশাহী জেলা ন্যাপের সহ সভাপতি জনাব কাজী আঃ বারী আমার সাথে দেখা করেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আমিন মাফ করো। অতীতের সমস্ত কিছুকে ভুলে যাও।' তার মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের মমত্ববোধ লক্ষ্য করেছি। দেখেছি তার অনুতপ্ত মানসিকতা। আমি এক বিস্ময় আর বিহ্বলতা নিয়ে নীরব থেকেছি। খোদাকে বলেছি 'তুমি সবই পার মাবুদ।' এই সেই কাজী আঃ বারী, আমাকে হত্যা করার জন্য কি এক অন্ধ আবেগে শানিত কৃপাণ নিয়ে হন্যে হয়ে পাগলের মত আমাকে খুঁজেছে। এই কাজী বারীর হাত আমার ভাইদের রক্তে রাঙা। তার নেপথ্য ইঙ্গিতে তার সাগরেদরা অষ্টগ্রাম থানা জামায়াত নেতা মওলান আব্দুল গণি খানের পিতা, ভাই, ভাগ্নেসহ একই পরিবারের কয়েকজনকে হত্যা করে এবং শান্তি কমিটির কনভেনার জনাব মাহববুল হক কুতুব মিয়াকে জবাই করে হত্যা করা হয়। তার মাথাবিহীন লাশ নদীতে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। সেদিন তার সন্তান ও স্বজনদের গগণবিদারী কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। এছাড়া আরো প্রায় ৩শ' নিরীহ রাজাকারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাদের লাশ মালা-ঘাঁথার মত দড়ি দিয়ে বেঁধে শাহপুরের নিকট নদীতে ভাসিয়ে দেয়। নদীর স্বচ্ছ পানি নিরপরাধ মানুষের রক্তে লালে লাল হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার

যে ঐসব রাজাকার তখনও অস্ত্র হাতে নেয়নি। কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং নিয়ে নৌকাযোগে বাজিতপুর হয়ে কিশোরগঞ্জ যাওয়ার পথে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। পাকিস্তান আমলে খুন আর ডাকাতী মামলার ফেরারী আসামী বর্সা, বেতের ও খুনী বদরসহ অধ্যাপক ইয়াকুব আলী এই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিল। ইয়াকুব আলী বাজিতপুর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান।

এই নৃশংতা আমার সামনে ভেসে উঠল। অথচ আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের মূল নায়ক। তার খুন রাঙা হাত রয়েছে আমার হাতে। কাজী বারী আবেগে অনেক কিছু বলছে কিন্তু আমি যেন শুনতে পাচ্ছি সেই শাহাদাতপ্রাপ্ত রাজাকারদের দুঃস্থ পরিবার সমূহের পিতামাতা ভাই বোন স্ত্রী পুত্রদের আর্তনাদ, বুক চাপড়ানো আহাজারি আর বেদনার্ত বিলাপ। আজও সেই কান্না, সেই আহাজারি মর্ম বিদারী মর্সিয়া হয়ে আমার প্রাণে বাজে।

আমি সেই দুঃস্থ রাজাকারদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের শোকে মুহ্যমান আত্মীয় পরিজনদেরকে আমার চোখের পানি ছাড়া সান্ত্বনা দেবার মত কোন কিছু দিয়ে আসতে পারিনি।

কাজী বারী আমার কাছে এসেছে অনুতাপ বিদগ্ধ হৃদয় নিয়ে। আমি ভাবছি তাকে আমি কোন ভাষায় কথা বলি।

বললাম 'বারী ভাই, আমাদের জীবন, আমাদের মৃত্যু যাঁর হাতে সেই পরাক্রমশালী আল্লাহই একমাত্র ক্ষমাকারী।' আমি রাসূল করীম (সাঃ) - এর উদ্ধৃতি দিয়ে বললাম 'আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দারা অপরাধ করবে আর আমার কাছে ফিরে আসবে; এ না হলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।' দেখলাম বারী ভাইয়ের মুখমন্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন 'তুমি যেখানে আছ কর্তৃপক্ষকে বলে সেখানে আমাকে টেনে নাও। কারাগারে যে কয়টা দিন আছি আমি তোমার সাহচর্যে থাকতে চাই।'

বারী ভাইয়ের অনুরোধে আমি কারা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তাকে ২৭ সেল ডিভিশনে নিয়ে এলাম। এখানে কাজী বারী আমার কুঠুরীতে অধিকাংশ

সময় কাটাতেন। আমার কাছ থেকে বই নিতেন, পড়তেন, আলোচনা পর্যলোচনায় অবতীর্ণ হতেন। তিনি আমার সামনে এলে অতীতকে রোমন্থন করে দুঃখ পেতাম। আবার তার চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন দেখে আমি খুশীও হতাম। আমি দোয়া করতাম এদের সবার জন্য। আহ! এ জীবনগুলো পাল্টে গেলে এ দেশটায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসত। ইসলামী বিপ্লব তো একটা ব্যক্তির নাম নয়। এ বিপ্লব একটা গোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায়ের নাম নয়। ইসলামী বিপ্লব আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে এক বিরাট জনগোষ্ঠীর আমূল পরিবর্তন আর এ পরিবর্তন আনতে হলে তাতে দেশের কোটি কোটি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অংশীদারীত্ব থাকতে হবে। বিপ্লবের প্রতিটি স্তরে থাকতে হবে গণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব। সংকীর্ণতার ভ্রান্তি বিস্তার করে যদি অনুতপ্ত কাজী বারীদের আমরা পাপী অশুচি বলে দূরে সরিয়ে রাখি তাহলে বিপ্লবের বিস্ফোরণ হবে না কোন দিন কোন কালে। মানুষের অন্তরে অন্তরে বিপ্লব শুধুমাত্র গুমরেই মরবে।

ইসলামী সাহিত্যসমূহের সংস্পর্শে এসে কাজী বারীর চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন হতে শুরু করে। তার পরিবর্তন দেখে আমি অবাক হলাম। তিনি বললেন 'দ্বীন থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করার অবকাশ অন্তত ইসলামে নেই।' ঠিক যেন আল্লামা ইকবালের সেই বাণীর প্রতিধ্বনি- 'জুদা হো দ্বীন সেয়াসত সে তো রাহ যাতে হ্যায় চেঙ্গিজী।' দ্বীন থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করলে সেখানে বিরাজ করে চেঙ্গিজের বর্বরতা। কাজী বারী আরও বললেন 'ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন ধারণাই আমার ছিল না। ইসলামী রাজনীতিকে মনে করতাম ১৪শ' বছর আগের পরিবেশেরই উপযোগী কিন্তু এখন আমি এর মধ্যে দেখছি এক শাশ্বত চিরন্তন আবেদন। আনন্তকালের উপযোগিতা এর মধ্যে বিদ্যমান। ইসলামের স্থিতিস্থাপকতা এত বিস্তৃত, এত ব্যাপক যে এটা পৃথিবীর যে কোন আবহাওয়া, যে কোন মাটিতে শিকড় গাড়তে সক্ষম।' তিনি তার উদ্দাম যৌবন ইসলাম বিরোধিতা এবং জাহেলিয়াতের সপক্ষে ব্যয় করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন। কারামুক্তির সময় কাজী বারী আমার হাত ধরে বলেছিলেন 'আমি তো মুক্ত হতে চলেছি। বাইরে গিয়ে তোমার মুক্তির জন্য কিছু করতে পারি কিনা দেখব। তোমার সাথে আমার যোগাযোগ থাকবে।

এখান থেকে আমি যে চিন্তা-চেতনা নিয়ে গেলাম এটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেটাও চিন্তা করছি।' কারাগার থেকে বিদায় নেয়ার বেশ কিছুদিন পর কাজী বারী আবার এসেছিলেন আমার সাথে দেখা করতে।

খন্দকার মোশতাক আহম্মদ ক্ষমতাসীন থাকাকালে কারা কর্তৃপক্ষ আমাকে আবার ১০ সেল ডিভিশন স্থানান্তর করলেন। এখানে থাকা অবস্থায় একদিন জানতে পারলাম আমাকে মোমেনশাহী যেতে হবে। আর এক মামলার শুনানী। ৪০ বছর কারাদণ্ড দেয়ার পরও প্রতিপক্ষের জিঘাংসা শেষ হল না। তারা আরও কিছু চায়; চায় আরও আমার শাস্তি হোক। চায় আমার জীবনের প্রদীপ কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠেই ধীরে ধীরে নির্বাপিত হোক। আমি যেন কোন দিনও বাইরের আলো বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে না পারি। পঁচাত্তরের পট-পরিবর্তনের পরও জিঘাংসার শেষ হল না। মুজিবের তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা, দালাল আইনকে কালাকানুন হিসেবে মোশতাকের ঘোষণার পর ও হিন্দুস্তানী দালালদের তূনের তীর ছুটে আসছে আমার দিকে। মুজিব চক্রের কর্মকর্তাদের সাথে কারাগারে সহ-অবস্থানের মধ্যে স্বাভাবিকতার পর্যায়ে উপনীত হলেও তাদের চর অনুচরদের দ্বারা দাবার ঘুঁটি ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে।

পঁচাত্তরের শেষার্ধে সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে আমার পায়ে আবার ডাণ্ডাবেরী পড়ানো হল। দীর্ঘ মেয়াদী দণ্ডপ্রাপ্তদের সফরের সময়ের অলঙ্কার ওটি। ট্রেনপথে মাত্র চার জন পুলিশ প্রহরায় বিকেল ৪টা নাগাদ আমি এসে পৌঁছলাম মোমেনশাহী স্টেশনে। তারপর রিক্সাযোগে কারাগারে। কারা কর্তৃপক্ষ আমাকে বুঝে নিলে, আমার সফরসঙ্গী ৪ জন পুলিশ বিদায় নিয়ে চলে গেল। কারাগারে প্রবেশের পর যথানিয়মে আমাকে আনা হল কেস টেবিলে। কেস টেবিলে আসার পর জেল সুপার নির্মল রায় এলেন। জমাদার আবদুল আলিম তাকে জিজ্ঞেস করলেন 'ডাণ্ডাবেরী কি খুলে দেব স্যার'? জেল সুপার বললেন 'কি করে হয়! তুমি জাননা তাকে? যার ৪০ বছর কারাদণ্ড, যার আরও বেশ কিছু মামলা ঝুলছে, এমন টেরর আলবদরের ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দেয়ার কথা ভাবছো কি করে?'

দূরে থাকার জন্য আমি সে কথা শুনিনি। জমাদার এসে বললেন। আমি বললাম, জেল সুপারকে জানিয়ে দিন আমার বেড়ী খুলতেই হবে কারাগারের ভিতরে ডাণ্ডাবেরী পরিয়ে রাখার তো কোন অধিকার নেই। যদি তিনি আমার বেড়ী খোলার আদেশ না দেন তাহলে আমি তার ব্যবস্থা নেব।' জমাদার সাহেব জেল সুপারকে জানালে তিনি না খোলার সিদ্ধান্ত অটল থাকলেন। জমাদার সাহেব এসে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বললেন 'বাবা মাত্র কয়েকদিনের জন্য তো এসেছেন, আবার তো ঢাকায় ফিরে যাবেন। এর মধ্যে সাহেবদের সাথে গোলমাল করে কি লাভ? বাবুরা নাখোশ হলে অসুবিধা হবে।' আমি বললাম 'অসুবিধার বাকী আর কি আছে? আমি এর প্রতিবাদ করবই আপনাদের বাবুকে জানিয়ে দিন আমি তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী নই। আমার সাথে তৃতীয় শ্রেণীর মত আচরণ করার কোন অধিকার রাখেনা আপনার কর্তা। আমি অনশন করবই। আমরণ অনশন।'

জমাদার সাহেব সুপারের কাছে গেলেন। আর ফিরলেন না। এদিকে আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল থাকলাম। ওদিকে পীরে কামেল হযরত মওলানা আতাহার আলী সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে মুজাহিদ কমান্ডার আখতার ভাই আমার সিদ্ধান্তের কথা শুনে আর সব কারাবাসীদের নিয়ে অনশনের সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে কারাকর্তৃপক্ষ ভীত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে আমার ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দেয়। আমি অনশন ভঙ্গ করি।

আমি বিভিন্ন সূত্রে যতটুকু জেনেছি মোমেনশাহীর জেল সুপার নির্মল রায় একাত্তরের সংকটে ভারতে পাড়ি না জমিয়ে হিন্দুস্তানের সপক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য দুঃসাহসে ভর করে ঢাকায় থেকে যান। ঢাকার জেলার হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। নিজেকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখার জন্য তিনি কৌশলগত অবস্থান নেন এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা বলে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ ও বাঙালী মুসলমানদের সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হন। সবার ধারণা হয় তিনি সত্যিই মুসলমান হয়েছেন। নিয়মিত নামাজ কালামও পড়তেন, কোরআন পাঠ করতেন। তৎকলীন প্রশাসনকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে রাখার মত অভিনয়-নৈপুণ্য তার জানা ছিল। বাংলাদেশ হওয়ার পর তার স্বরূপ স্পষ্ট হয় ওঠে।

ঢাকা হিন্দুস্তানী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এলে শত শত বিহারী ও অবাঙালী মুসলমানদের জেল হাজতে নিয়ে আসা হয়। তাদের সমস্ত টাকা পয়সা ও গয়নাপত্র নির্মল বাবু হাতিয়ে নেন। জেল রেজিস্ট্রারে সবকিছু অনুল্লেখ থেকে যায়। পরবর্তীতে তিনি এর সবটাই আত্মসাৎ করেন। শুধু তাই নয়, হিন্দুস্তানের গোয়েন্দাবৃত্তিতে নিয়োজিত এই ব্যক্তিটি ভারত বিরোধী চিন্তা চেতনা-সম্পন্ন মানুষদের পদে পদে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেন। এই নির্মল রায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার থাকা অবস্থায়ই জনপ্রিয় নেতা জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীকে তার সেলে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। ১৯৭৩ সালে তার সময়েই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গুলী চলে। এতে বহু কয়েদী হতাহত হয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন ইসলামী ছাত্র সংঘের তরুণ কর্মী, শহীদ আনিস ভাই। সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করে দণ্ডপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ইসলামপন্থীদের গুলী করা হয়। তিনি ভারতের গোয়েন্দাবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন তার প্রমাণ হল তার ধর্মান্তরিত হওয়া এবং যুদ্ধের ৯ মাস পাকিস্তানীদের সহযোগিতা করা সত্ত্বেও কোন একটি ফুলের আঁচড়ও তার ওপর পড়েনি। সম্ভবত হিন্দুস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা জঅড এর নির্দেশে তিনি এসব করেছেন। মোমেনশাহী কারাগারে আমাকে ১৪ নাম্বার ওয়ার্ড ডিভিশনের দোতলায় স্থান দেয়া হল। সেখানে মুজাহিদ কমান্ডার আখতার ও ডাঃ মান্নানসহ দালাল আইনের লোকজন অবস্থান করতেন। এখানে আসার কয়েক দিন পর আর এক গোল বাধল। শুনলাম আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ ও অধ্যাপক আবিদুর রহমানকে মোমেনশাহী কারাগারে আনা হয়েছে। জেল কর্তৃপক্ষ জানালেন যে তারা আমাদের ১৪ নাম্বার ওয়ার্ড ডিভিশনে অবস্থান করবেন। তোফায়েল আহমদের কথা শুনে প্রথম শ্রেণীর বন্দিরা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা কিছুতেই তোফায়েল আহমদকে বরদাস্ত করতে নারাজ। জেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে নির্মল রায় তাদেরকে যেভাবে হোক সেখানেই রাখবে। তারা আমাদের শেষ পর্যন্ত আরও জানালেন যে প্রয়োজন হলে দালালদের সরিয়ে দিয়ে সেখানে তোফায়েল আহমদদের রাখা হবে। আমাদের অনমনীয় মনোভাব এবং একাত্মতা দেখে অবশেষে নির্মল বাবু হার মানলেন। তা না হলে তার ঝুলির বিড়াল বেড়িয়ে যেতে পারে এমন এক আশঙ্কা

করেছিলেন হয়তোবা। যাই হোক, আওয়ামী লীগের দু'জনকে পুরাতন সেলে রাখা হল। ঘটনার কয়েকদিন পর তোফায়েল সাহেব আমাদের কাছে একটা চিঠি পাঠালেন। সেটা ছিল বিনম্রতার সাথে বিশেষ অনুরোধ। তিনি চান আমাদের ডিভিশনে আমাদের সাথে সহ-অবস্থান করতে। এবার আমরা বিবেচনা করলাম এই কারণে যে এটা চাপিয়ে দেয়া কোন সিদ্ধান্ত নয়। তোফায়েল ভাই, অধ্যাপক আবিদুর রহমান অবশেষে আমাদের ডিভিশনে এলেন। এখানকার বাসিন্দাদের সকলেই তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখতেন। কিন্তু শুরু থেকেই তাদের সাথে আমার বেশ কথাবার্তা চলতে থাকে। এখানে তোফায়েল ভাইকে দেখতাম তিনি পুরোপুরি নামাজী। তসবীহ তাহলীল ও দোয়া কালাম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন সব সময়। তার এই পরিবর্তীত মানসিকতার জন্য আমাদের ওয়ার্ডের বিরূপ কয়েদীরা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হলে ওঠে। রুমে তোফায়েল ভাইদের সাথে সবারই সম্পর্কের উন্নতি হয়।

তাদের সাথে আমার প্রায়ই রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা হত। আলোচনায় এক পর্যায়ে তোফায়েল ভাই বলেন- 'আমিন, আমরা কি একাত্তরে ভুল করেছিলাম?'

বলেছিলাম 'এখনও সেটা ভাবছেন, এত কিছুর পরও উপসংহারে পৌঁছাতে পারেননি? একটা বৃহত্তর দলের রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে আপনার মেধার ওপর আমার আস্থা ছিল।' এ প্রসঙ্গে একটা হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বললাম- 'যে আঞ্চলিকতার দিকে আহ্বান করে, যে আঞ্চলিকতার জন্য সংগ্রাম করে এবং আঞ্চলিকতার জন্য মৃত্যুবরণ করে সে আমার নয়।' এর পর আপনার কী বলার থাকতে পারে? আগামী দিনের বংশধরদের জন্য আপনার কী বলার আছে? যে জাতির সাথে আমাদের হাজার বছরের বিরোধ, যারা আজও মুসলমানদের আপন করে নিতে পারেনি, তাদের ইঙ্গিতে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদেশের বেগুনাহ হাজার হাজার উর্দুভাষী মুসলমান শিশু, নারী, পুরুষ খুন করেছেন। পাক বাহিনীর নৃশংসতার জন্যও দায়ী আপনারা। সবচেয়ে বড় কথা আপনাদের এবং আমাদের সংঘাতে যারা নিহত হয়েছে তারা কারা? সবাই মুসলমান। আপনার ভাই, আমার ভাই, মুক্তিফৌজ, সেও মুসলমান, বিহারী

মুসলমান, পাকিস্তানী সেনা সেও মুসলমান। আলবদর, রাজাকার, বাঙালী সৈনিক, ইপিআর যারাই নিহত হয়েছে সবাই মুসলমান। আমরা পরস্পরের রক্ত ঝরিয়েছি আর হিন্দুস্তানের বাবুদের ঘরে ঘরে চলেছে উল্লাস। এর পরেও কি বলতে চান ভুল করেননি?' তোফায়েল ভাই নীরব থাকলেন।

প্রসঙ্গ এড়িয়ে তিনি বললেন 'বঙ্গবন্ধুর বিরাট একটা সদিচ্ছা ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ বঙ্গবন্ধুকে কাজ করতে দেয়নি। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এক মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হল।' কথাগুলো আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলার সময় দেখলাম তার চোখ ছল ছল করে উঠেছে। মুজিবের প্রসঙ্গ এলেই তিনি কেঁদে ফেলতেন। আমি বললাম- 'নজীরবিহীন সমর্থন যার পেছনে ছিল, তার কিছু করণীয় থাকলে তার প্রতিফলন দেখতে পেতাম। বাংলাদেশকে অখণ্ড ভারতে বিলীন করা যদি হয়ে থাকে তার স্বপ্ন, তাহলে সেটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে ভালই হয়েছে। একটা জীবনের বিনিময়ে গোটা জাতি আসন্ন বিপর্যয় থেকে নাজাত পেয়েছে। যদি ভেবে থাকেন মুজিব বেঁচে থাকলে দেশকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করে দিতেন তাহলে ভুল করেছেন। মুজিব বলেছিলেন, 'তিন বছর কিছু দিতে পারুম না।' আল্লাহ তাকে তার পরেও সাড়ে তিন বছর বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কোনকালেই তিনি কিছু দিতে পারতেন না। খুনরাঙা হাত দিয়ে কোন কল্যাণ আসতে পারে না। বিদেশী ও বিজাতীয় গোলামদের দিয়ে ভাল পরিকল্পনা সম্ভব নয়।' আমার কথাগুলো তোফায়েল ভাই নীরবে শুনে যেতেন তেতো ঔষুধের বড়ি গেলার মত করে, তবে অধ্যাপক আবিদুর রহমান আমার সাথে প্রায়ই একমত হতেন। আওয়ামী লীগের অতীত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তোফায়েল ভাইয়ের মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়তো বা কিছু হয়েছিল, তার নামাজ কালাম ও তসবীহ তাহলীলের প্রতি আসক্তি দেখে সেটা স্পষ্ট বুঝা যেত। কিন্তু কখনও মুখ দিয়ে আবিদুর রহমানের মত সহজ স্বীকৃতি প্রকাশ করতে দেখিনি তাকে।

ছাত্র সংঘের বিভিন্ন নেতা প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত ভাল ধারণা ব্যক্ত করতেন। কোন একদিন ছাত্রনেতা শহীদ আবদুল মালেক ভাই প্রসঙ্গ এলে আমি

তোফায়েল ভাইকে বলেছিলাম, 'শহীদ মালেকের প্রত্যক্ষ হত্যাকারীদের মধ্যে ছিলেন আপনি নিজেও।' প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন তিনি।

একদিন তোফায়েল ভাইয়ের স্ত্রী ও মা এলেন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে। তাদের মুখ থেকে তিনি জানতে পারলেন, প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার ভাইকে তার এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে বাজারে হত্যা করেছে। কথাটা শুনেই তিনি কেঁদে ফেললেন। সারাক্ষণ কাঁদতেন তিনি। তার চোখে আমি দেখেছি বাঁধভাঙা অশ্রু"। আওয়ামী বর্বরতার মধ্যমণি হয়েও তার হৃদয়ের গভীরে ছিল একটি কোমল মানবিক সত্তা। তার আচার-আচরণ ও ব্যবহার ছিল আকর্ষণীয়। বিজাতীয় প্রলোভনের দুর্বিপাকে হারানো তার মুসলিম সত্তা তিনি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজেছেন। খানিক হলেও পেয়েছেন বলে আমার ধারণা। তার এই প্রাপ্ত উপলব্ধি আর অনুভূতি বাইরের দুর্বৃত্তরা আবারও লুঠ করবে কিনা আমি তা জানিনা।

ঢাকা থেকে মোমেনশাহী জেলে যে কারণে আমাকে আনা হয়েছে এবার সে প্রসঙ্গে আসা যাক। আমার বিরুদ্ধে আর একটি হত্যা মামলা। অষ্টগ্রামের দেওঘর ইউনিয়নের তৎকলীন চেয়ারম্যান আহমদ আলী আমার বাদী। অভিযোগ তার পিতাকে আমি হত্যা করেছি। আদালতে আমাকে হাজির করা হয়। আদালতের এলাকার মধ্যে পুলিশের তত্ত্বাবধানে আমি রয়েছি। ভাগ্যচক্রে আহমদ আলীকে আমার চোখে পড়ল। ডাকলাম, আমার দিকে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করলাম 'আপনি নিজে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন না, আপনার পিতার হত্যাকারী কে?' 'জানি' জবাব দিল আহমদ আলী। জিজ্ঞাসা করলাম- 'জেনে শুনে কি করে আমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলেন?' আহমদ আলী বললেন- 'আমি চাপের মুখে মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

বললাম, 'কে বা কারা আপনার পিতাকে হত্যা করেছিল আপনাদের সবার জানা। তাছাড়া আপনার পিতার অপরাধ কি যে আমার তাঁকে হত্যা করতে হবে? তার কাছে আমি আপনার চেয়ে কম প্রিয় ছিলাম না। তিনি আমার ছিলেন শ্রদ্ধেয়।'

ইতোমধ্যে মামলার সাক্ষীদের পেয়ে গেলাম। তারা কাজী বারীর সহযোগী মোজাফফর ন্যাপের কর্মী। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম- 'আপনারা সাক্ষী হতে এসেছেন? সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ করে আপনারা কি বলতে পারবেন, আহমদ আলীর পিতাকে আমি হত্যা করেছি? ৪ বছর পরও মিথ্যার বেসাতী শেষ হল না! এ হত্যার নায়ক আপনারা, আপনাদের দলীয় কর্মীরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করে আপনারা এদেশের ভাল মানুষগুলোকে হত্যা করেছেন। মুক্তিফৌজ সেজে এসেও আপনারা ভাল মানুষগুলোকে হত্যা করেছিলেন। ভৈরব কালিকা প্রাসাদের মোমতাজ পাগলার ছেলে হাদী, গোলাম গউস ও তার ভাইয়েরা কি জামায়াতে ইসলামীর কর্মী অথবা ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী ছিল? সেনাবাহিনীকে তারা অপকর্মের ইন্ধন জুগিয়েছে। তারা হত্যা করেছে। এসব করেছে তারা পাকিস্তানের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য। মুক্তিফৌজরা গ্রামবাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করেছে জাতীয় বিবেকগুলোকে ধ্বংস করার জন্য। আবার মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে অবশিষ্ট বিবেকগুলোকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে পঁচন ধরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র আজও চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে আপনাদের অপকর্মের বাধা দেয়ার কেউ থাকবে না। এ জাতিটাকে ৪ বছর লুট করেও আপনাদের আশা মিটেনি। পঁচাত্তরের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতেও কি আপনাদের বিবেকবোধের সঞ্চার হবে না।'

আমার কথাগুলোয় দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। নমনীয়তা প্রকাশ করে তারা আমার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেন। এই আদালত প্রাঙ্গণে আমার এলাকার চেনামুখ আরও অনেক পেলাম। এখানেই প্রথম জানলাম, অষ্টগ্রাম উপজেলার আবদুল্লাপুরের শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবি তোতা মিয়া মাস্টারকে অন্ধ জাহেলরা অপদস্থ করেছে দুঃখ হল তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান শিক্ষক ও এ অঞ্চলের নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী। রাজনৈতিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের সাথে জড়িত। জানলাম তথাকথিত মুজিববাদী সন্ত্রাসী খুনী মফিজ ও তার জাহেল অনুচরবর্গ তোতা মাস্টার ও সাবেক এমএনএ মুসলিম লীগ নেতা সরফুদ্দিন সাহেব, ওসমান গণি (টুক্কু চেয়ারম্যান, বড় বাড়ী) তাদের ওপর মানসিক ও শারিরীক নির্যাতনের কোন কিছু বাকী রাখেননি এবং অষ্টগ্রামের ফতু মেম্বারকে জাহেল আওয়ামী সন্ত্রাসীরা হত্যার পর তার লাশ

নদীতে ভাসিয়ে দেয়। তোতা মাস্টারকে মাথা মুড়িয়ে চুনকালি দিয়ে আবদুল্লাপুরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরান হয়। এইভাবে আল্লাহর হক- পরস্ত বান্দারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে জাহেল- জালেমদের হাতে কত যে অপদস্থ হয়েছে, কত যে নির্যাতিত হয়েছে এর প্রকৃত তথ্য হয়তো কোন দিনই জনসমক্ষে আসবে না। এদেশের ইতিহাস একটি অপূর্ণ একপেশে ইতিহাস হিসেবে রয়ে যাবে শেষ অবধি।

আদালতের অঙ্গন থেকে শুনানীর সম্মুখীন না হয়েই আমাকে ফিরে আসতে হল কারাগারে। মরার ওপর খাড়ার ঘা যেমন প্রতিক্রিয়াহীন, ৪০ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর কাছেও নতুন মামলার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এসব তেমনি বোঝার ওপর শাকের আঁটি বলে মনে হত। কয়েকদিন পর মোমেনশাহী জেল থেকে বিদায় নিতে হল।

আবার কেন্দ্রীয় কারাগার। আবার সেই ১০ সেল ডিভিশন। এর মধ্যে ডিআইজি মোফাখখারুল ইসলাম সাহেবের বদলীর আদেশ এল। নতুন এআইজি এলেন। ডিআইজির দায়িত্ব তিনিই পালন করছেন। জেলারও বদলী হয়েছে ইতোমধ্যে। নতুন জেলার রিয়াজুদ্দিন ভূঁইয়া (টাঙ্গাইল) এখন দায়িত্বে। প্রথম দর্শনে তার চেহারা সুরত ও চালচলন দেখে নেহায়েত আল্লাহওয়ালা বলে মনে হবে। কিন্তু ফুলের পাঁপড়ির নীচে বিষাক্ত বৃশ্চিকের মত একটা কিছু তার বাহ্যিক চেহারার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। তিনি ছিলেন উৎকোচ গ্রহণে সিদ্ধহস্ত। তাকে ঘিরেই দুর্নীতি আবর্তিত হত। সবচেয়ে বড় কথা হল, তিনি ছিলেন তোষামোদপ্রিয় একটি মানুষ। কারাগারে এ সুযোগটা নিয়েছিল কারাবাসী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। এর ফলে কারাগারে সবরকমের সুযোগ- সুবিধা, আরাম-আয়েশের দুয়ার আওয়ামী লীগের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং আমাদের প্রাপ্য কারাগারের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র সংকোচিত হতে থাকে। একদিন জেলার সাহেব আমাকে বললেন- '১০ সেল ডিভিশন আপনাকে ছাড়তে হবে।' বললাম- 'কেন? আমার জানার প্রয়োজন আছে। ৪০ বছর কারাদণ্ড একজন কয়েদীর জন্য মানসিক যন্ত্রণা। তারপরও এক সেল থেকে আর এক সেলে,

এক পরিবেশ থেকে আর এক পরিবেশে চালান করে কষ্ট দেয়া কি সঙ্গত হচ্ছে?' আমি অনুরোধের সুরে বললাম- 'ব্যাপারটা একটু বিবেচনা করবেন।'

পাথরের বুক থেকে প্রস্রবণের প্রবাহ বেরিয়ে আসে। নিরেট লোহা একটি নির্দিষ্ট উত্তাপে বিগলিত হয়। কিন্তু জেলার সাহেব এমন একটা মানুষ যার বিবেকের সাথে আত্মা ও অনুভূতির যোগ নেই। আমার আবেদন, আমার আকুলতা তাকে বিগলিত করা তো দূরে কথা, তার হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছতে ব্যর্থ হয়।

একদিন সার্জেন্ট এসে হাজির। আমাকে অন্যত্র অর্থাৎ অন্য সেলে যেতে হবে। আমি বললাম- 'রাউন্ড পর্যন্ত আমাকে থাকতে দিন।' তিনি চলে গেলেন। আমাকে সরানোর ব্যাপারে আর তিনি আসেননি।

ডেপুটি জেলার ইকবাল সাহেবের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল ছিল। তাকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তিনি আমার অনুভূতির সাথে একমত হয়ে বললেন 'একটা বিশেষ গ্র"পের ইন্ধনে জেলার সাহেব এসব অন্যায় অবিচার করছেন।' সেই বিশেষ গ্র"পটি কারা, আমার জানতে বাকী রইল না। সে কারণে এ ব্যাপারে প্রশ্ন না করে জেলার সাহেবকে বলে কয়ে কিছুদিন আমাকে ১০ সেলে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম।

মোফাখখারুল ইসলামের পর নতুন ডিআইজি আজিজুল হক ভূঁইয়ার আগমন আমার জন্য আর্শীবাদের মত মনে হল। কারা অফিসারদের মধ্যে আমার জানামত যে দু'জন সৎ ও বিবেকবান অফিসার রয়েছেন তারা হলেন সাবেক ডিআইজি কাজী আব্দুল আউয়াল সাহেব, যাকে ঢাকা কারাবাসের প্রথম দিনগুলোতে পেয়েছিলাম। অন্যজন হলেন নবাগত ডিআইজি জনাব আজিজুল হক ভূঁইয়া। এক সময় আমি তাঁকে কাছে পেয়ে বললাম- 'জেলার সাহেব আমাকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমার মন-মানসিকতা এ ডিভিশনে এডজাষ্ট হয়েছে। অন্যত্র সরালে আমার বেশ কষ্ট হবে।' তিনি বললেন- 'কোথাও কাউকে সরানো হবে না, যে যেখানে আছেন সেখানে থাকবেন।' জেলার সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় কারাবাসী আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের

মধ্যে তাদের সেই পুরোনো ফ্যাসীবাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে লাগল। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের ক্ষমতা অপব্যবহারকারী রাজনৈতিক সামাজিক অপরাধ, জুলুম ও হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা কারাগারে দারুণভাবে মানসিক বিপর্যস্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ডিআইজি মোফাখখারুল ইসলামের নেপথ্য সহযোগিতায় এই হতাশাগ্রস্ত আওয়ামী লীগাররা দারুণভাবে চাঙা হয়ে ওঠে। জেলের ভেতরেই তারা সংগঠিত হয়। এছাড়াও জেল কর্মচারীদের সাথে একটা বিশেষ যোগসূত্র স্থাপন করে। কারাগারের নিয়ম শৃঙ্খলা পদদলিত করে স্বৈরাচারী কায়কারবার চালাতে থাকে। তথাকথিত দালাল আইনে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ইসলামপন্থীদের ওপর চড়াও হবার চেষ্টা করে।

ডিআইজি মোফাখখারুল ইসলাম সাহেবের একপেশে প্রশাসনিক শিথিলতায় আওয়ামী লীগাররা যেসব বাড়াবাড়ির পথ ধরে এগুতে থাকে, সেটাকে বাগে আনতে ডিআইজি অব প্রিজন্স আজিজুল হক ভূঁইয়াকে যথেষ্ট হিমশিম খেতে হয়। তার সময়েই বাজিতপুর হত্যা মামলার রায়কে কেন্দ্র করে কারাগারে আওয়ামী লীগাররা অবস্থান ধর্মঘট করে। কয়েদীদের যথারীতি সন্ধ্যার পূর্বেই সেলে অথবা ওয়ার্ডে তালাবদ্ধ করে দেয়ার নিয়ম। সেদিন যথানিয়মে আমাদেরকে তালাবদ্ধ করা হলেও কোন আওয়ামী লীগারকে তালাবদ্ধ করা হয়নি। তারা একযোগে কারাগারের মুক্ত অঙ্গনে অবস্থান নিয়ে বাজিতপুর হত্যা মামলার আসামীদের ফাঁসী মওকুফের দাবীতে শ্লোগান দিতে থাকে। কারা কর্তৃপক্ষ দারুণ সংকটে পড়ে। ঘন্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হচ্ছে। অথচ অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে না। এভাবে রাত্রি ১টা বাজে। ডিআইজি সাহেব তার কৌশল, ধী-শক্তি, ও প্রজ্ঞার প্রয়োগ ঘটিয়ে ঘটনাকে আয়ত্তে আনেন। আওয়ামী লীগের একতরফা বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তিনি যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বাইরের সাহায্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে একটি উত্তপ্ত ও মারমুখী পরিস্থিতির উপসংহার টানতে সক্ষম হন। আওয়ামী লীগাররা তাদের সেলে যেতে বাধ্য হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সেদিন একটি রক্তাক্ত পরিণতি থেকে রক্ষা পায়। কারাবাসী আওয়ামী লীগারদের সাথে আমাদের সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। জনৈক ডেপুটি জেলার ছাত্রবস্থায় ছাত্রলীগের সাথে জড়িত

ছিলেন বলে স্বভাবতই বন্দী আওয়ামী লীগারদের সাথে ছিল তার নাড়ীর যোগ। তার মাধ্যমে ওরা কারাগারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে যে, আমরা তফসীরের মাধ্যমে রাজনীতি করছি, তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করছি, সাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটাচ্ছি। তফসীর বন্ধ করা না হলে জাতীয় স্বার্থে তারা সম্মিলিতভাবে শক্তি প্রয়োগ করবে। এর ফলে কারাগারে অশান্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আওয়ামী লীগের কেউ দায়ী হবে না।

আওয়ামী লীগের ফ্যাসীবাদী উদ্ধত আচরণের আর একটি কারণ হল, পঁচাত্তরে আওয়ামী বাকশালী প্রশাসনের পতনের পর থেকে ক্রমশ কারামুক্তির ফলে আমাদের সংখ্যা কমতে থাকে। পক্ষান্তরে রাজনীতি ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে গ্রেফতার হয়ে আওয়ামী সমর্থকদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

আমাদের øায়ুযুদ্ধ ও কারাগার পরিস্থিতির উত্তাপ নিরসনের জন্য ডিআইজি সাহেব আমাদের প্রতিনিধিত্বকারী কিছু লোককে ডেকে পাঠান।

আমাদের পক্ষ থেকে আমি ও এডভোকেট এবিএম আনোয়ার হোসনে, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রাখাল ভট্টাচার্য, হোসেন সাহেব ও মিস্টার গোমেজ উপস্থিত হলাম। ওরা অভিযোগ করে যে, আমরা পুরোনো কায়দায় ইসলাম ও কোরআনকে টেনে এনে তথাকথিত মুক্তি যোদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করছি।

আমরা বললাম- 'কারাগারের অফুরন্ত অবসরে আমরা অন্যায় অপকর্মে অর্থহীনভাবে সময়ের অপচয় না করে কোরআন চর্চা করছি। আর কোরআন চর্চা যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করা হয় তাহলে কারাগারের মধ্যে এ ধ্বংসযজ্ঞ চলবে। কারাগার থেকে বেরিয়েও তাই করতে থাকব।'

ডিআইজি সাহেব আওয়ামী লীগারদের উদ্দেশ্যে বললেন- 'কোরআন চর্চা তো অপরাধ নয়, আপনারা নিজ নিজ ধর্ম চর্চা করেন, কেউ বাধা দিবে না। কেউ রাজনীতি করলে সেটা দেখার দায়িত্ব আমাদের, আপনাদের নয়। আপনাদের সবাইকে বলছি কেউ বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করলে এখান থেকে

আমি আলবদর বলছি আমিনুল হক

অন্যত্র পাঠাতে বাধ্য হব। এরপরে এ ধরনের কোন অভিযোগ শুনতে আমি নারাজ।'

রাখাল ভট্টাচার্য, যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই দিয়ে কারাগারে কোরআন চর্চা বন্ধ করার প্রধান উদ্যোক্তা এবং মুসলমান কয়েদীদের মগজে ঘুন ধরানোর ব্যাপারে সক্রিয়, সেই রাখাল বাবু একটি মন্ত্রণালয়ের সেকশন অফিসার ছিলেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করা হয়। একাত্তরের যুদ্ধকালীন সময়ে তার মত কোন হিন্দুর বাংলাদেশে থাকার কথা নয়। অথচ তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুসলমানদের ছদ্মাবরণে বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। কালামে পাকের অনেক সূরা অর্থসহ তার জানা। নামাজের নিয়ম-পদ্ধতি ছিল তার নখদর্পণে। একাত্তরে তিনি বিভিন্ন মসজিদে নামাজ পড়িয়েছেন। এমনকি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট মসজিদে তিনি ইমামতি করেছেন বলেও তিনি আমাকে জানান। পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার অনেক আগে থেকে তিনি হিন্দুস্তানের স্বপক্ষে গোয়ন্দাবৃত্তিতে নিয়োজিত থেকে 'লরেন্স অব এরাবিয়ার' মত বাংলাদেশের মুসলমানদের মগজে পর্চন ধরিয়েছেন। ভাল মানুষগুলোকে পাকিস্তানের শত্র“ চিহ্নিত করে হত্যা করিয়েছেন। এ দেশের তথ্য হিন্দুস্তানে পাচার করেছেন। তার মুসলিম-বিদ্বেষী জঘন্য মনোবৃত্তির প্রকাশ আমরা দেখেছি কারাগারের অভ্যন্তরেও। এখানে মুসলমান অবুঝ তরুণদেরকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি।

আমি একদিন আমার সেলে বিশ্রাম নিচ্ছি। একটা উত্তেজিত কন্ঠ আমার কানে এল। বলতে শুনলাম 'আমরা একাত্তরের আলবদর, রাজাকার আল-শামস মুজাহিদ আর শান্তি কমিটির লোকদের ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছি। সামনের দিনগুলোতে আমরা আর সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করব না। বঙ্গবন্ধু এদের জেলে পাঠিয়ে রক্ষা করেছেন। ওরা জেলখানাকে ট্রেনিং সেন্ট্রারে পরিণত করেছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, কি দুঃসাহস। একাত্তরের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য ওরা জেলখানায় বীজবপন করছে। ওদের ক্ষমা করা আর ঠিক হবে না।'

আমি সেল প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, আমাকে দেখে রাখাল বাবু বিব্রত। বললাম- 'রাখাল বাবু, কি বললেন আবার বলুন। আপনাদের ধ্বংসের বীজ বপন করেছিলেন আপনারাই। আপনাদের ধ্বংসের জন্য দায়ী আপনাদের সংকীর্ণ হিন্দুবাদ। যা মুসলমানদের মানসিক দুর্বলতার সুযোগে তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। গোটা জাতি আপনাদের সেই চক্রান্তের চেতনা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। আপনাদের পাশে এখন খুনী লুটেরা আর ক্রিমিনাল ছাড়া কেউ নেই। তারা চায় আপনাদের তথাকথিত চেতনাকে তাদের কৃত-কর্ম আর অপরাধগুলোর ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে। মুসলমানদের কানে কানে বিষ ঢালার পুরোনো প্রবণতা এখনও আপনার মধ্যে রয়ে গেছে। অভ্যাস পরিবর্তন করুন। আমার কানে দ্বিতীয়বার যেন এ কথা না আসে। শুধু এটুকু জানিয়ে দিতে চাই, এটা একাত্তর নয় ছিয়াত্তর। একাত্তরের অন্ধ তরুণ, যাদের দিয়ে জঘন্যতম কাজ করিয়েছেন তাদের বিরাট অংশ এখন আমার পাশে।' কাছে দাঁড়িয়েছিল জমাদার ও সিপাই। বললাম- 'এই ক্রিমিনলটাকে আমার চোখের সামনে থেকে সরে যেতে বলুন। এই জঘন্য মনোবৃত্তির লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।' ডিউটি জমাদার কিছু বলার আগে রাখাল বাবু মাথা নীচু করে সরে গেলেন।

পাঁচ

একদিন দেখলাম ঢাকা বেতার নিঃশব্দ। আশঙ্কা হল, একটা কিছু ঘটেছে। মনে হল পঁচাত্তরের ঐতিহাসিক বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। দোয়া করতে থাকলাম। আমাদের অন্যান্য ভাইদের দোয়া করতে বললাম। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তন জাতীয় জীবনে একটা উষালগ্ন বলে মনে হয়েছিল। এই বিপ্লব একটা সূর্যোদয় ঘটাতে না পারলেও অমানিশয়ার অন্ধকার বিদূরিত করে সুবেহ সাদিকের আবছা আলোর আভা আনতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু আবার সেই জাহেলিয়াত। আবার সেই নিশ্চিদ্র অন্ধকার। আবার সেই হিন্দুবাদের প্রাধান্য। খবর পেলাম খালেদ মোশাররফের মা, ভাই, মতিয়া চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে একটি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করেছে। এতে আরও নিশ্চিত হলাম যে প্রতি-বিপ্লব শক্তভাবেই এগুচ্ছে। পঁচাত্তরের পরিবর্তীত চেতনাকে রুশ-ভারত অক্ষশক্তি বেশী দূর এগুতে দিবে না। আমার এ ধারণা ছিল অনেক আগে থেকে। মীর কাশিমের অনুতপ্ত অনুভূতির প্রতি যেমন ক্লাইভের সতর্ক দৃষ্টি ছিল, হিন্দুস্তানের ক্ষুধার্ত আগ্রাসী জঠরে অবস্থান করে তা থেকে নিস্কৃতি পাবার আকুলতাকে দিল্লী যে কোন মূল্যের বিনিময়ে প্রতিহত করবে এটাই তো স্বাভাবিক। স্বাধীনচেতা মীর কাশিমকে ক্লাইভ বাংলার মসনদে বসে কাজ করার সুযোগ দিবে না। এই নির্মম বাস্তবতা ও ইতিহাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সামনে থাকা সত্ত্বেও, প্রতি বিপ্লবের পদধ্বনি শুনে ভাগ্যহত জাতির জন্য দারুণ ব্যথা অনুভব করি। রাত্রে ঘুমানোর চেষ্টা করি। কিন্তু ঘুম নেই। এক ভয়ঙ্কর মানসিক যন্ত্রণা ও অনাহুত অস্থিরতা অনুভব করি। শেষরাত্রে বেশ কিছু গুলীর শব্দ কানে এলো, লক্ষ্য করলাম সেন্ট্রিদের অস্থির পদচারণা। ভাবলাম বাইরে কেন্দ্রীয় কারাগারের কাছাকাছি প্রতিবিপ্লবের ঢেউ এসে আছাড় খেল। কোন মুসলমান কোনদিন কোন অবস্থায় আল্লাহর সাহায্য থেকে নিরাশ হতে পারে না। এমন একটা হাদীসের কথা মনে হতেই দোয়া করলাম। প্রাণ ভরে দোয়া করলাম আল্লাহর কাছে। অসহায় এই জাতির জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করলাম। আমার চিন্তা-চেতনা দুলছে। পেণ্ডুলামের মত দুলছে আশা নৈরাশ্যের মাঝখানে। আমি এই ভেবে আশ্বস্ত যে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক আমরা

নই। পরিস্থিতির ওপর প্রভাব বিস্তারের শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের নেই। যখন ছিল তখন আমাদের সামর্থ্যরে সবটুকু কাজে লাগিয়েছিলাম। এখন আমরা দৃশ্যপটের বাইরে। আমরা বাইরের পর্যবেক্ষক মাত্র। তাছাড়া আমাদের সংগ্রাম, আমাদের কোরবানী যদি আল্লাহর ওয়াস্তে হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ নিজ হাতে নিয়ন্ত্রণ করবেন সবকিছু।

সকাল হল, সেলের দরজা বন্ধ তখনও। সকাল ৮টা নাগাদ প্রতিদিন সেল প্রকোষ্ঠে নাস্তা পৌঁছে যায় যথানিয়মে। আজ ব্যতিক্রম। ঘন্টার পর ঘন্টা পেরিয়ে গেল। ১১টা নাগাদ দরজা খোলা হল। ক্ষুধা, ভয়ঙ্কর ক্ষুধায় অস্থির আমরা সকলে। সেল থেকে বেরুলাম। বেরিয়ে শুনলাম বাইরে থেকে সেনাবাহিনীর লোকজন এসে আওয়ামী লীগের ৪ জন নেতাকে হত্যা করেছে। বুঝলাম গতরাতে গুলীর শব্দ বাইরে নয় ভেতরের। ঐ গুলীগুলাতেই কারা প্রকোষ্ঠে চারজন আওয়ামী লীগ নেতার বুক বিদীর্ণ হয়েছে। দুঃখ পেলাম এই ভেবে যে কারাগারের অসহায় মানুষদের বিনা বিচারে হত্যার প্রবণতা কোনদিনই শুভ হয় না। এটা অমানবিক বর্বরতা। এটা মানুষের মৌলিক অধিকারের চূড়ান্ত অবমাননা। কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিকে আমরা ঠেকাব কি দিয়ে একটা বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ বালির বাঁধকে ভেঙ্গে দিতে পারে। আশ্চর্য হলাম দুশ' বছর পর একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখে। মোহাম্মদী বেগরা অপঘাতে মরবে এটাইতো স্বাভাবিক।

দুপুরের খাবার পেলাম। সকালে খাবার থেকে সবাই মাহরুম হয়েছে। কারাগারে সন্ত্রাসের ছায়া নেমে এসেছিল। খাবার আয়োজন হয়নি, খাবারের কথাও ভুলে গিয়েছিলাম সকলে। সবার চোখে মুখে আতঙ্ক। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের বন্দীরা তাদের চার নেতার মৃত্যুতে মুষড়ে পড়েছে। তাছাড়া বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি বুঝতে পারছেনা কেউ। কারো মুখে কোন কথা নেই। নির্বাক চাওনি সবার। সবাই একে অপরের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতির গভীরতাকে নিরূপণের চেষ্টা করছে। বিকেল নাগাদ দেখলাম আওয়ামী লীগারদের চোখ-চাওনিতে আগের মত আর আতঙ্কের ছাপ নেই। মুখমণ্ডলের বিমর্ষতা দূর হয়ে অনেকখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ওরা আমাদের জন্য পরিস্থিতির ব্যারোমিটার। ঠিক তেমনি

ওদের জন্যও ছিলাম আমরা। তবে আমাদের চাইতে ওদের বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক ছিল বেশী। বুঝলাম সময়ের স্রোত তাদের সপক্ষে প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা আমাদের মধ্যে ফিস ফিস করে আলাপ করছি। সামগ্রিক বিচারে পরিস্থিতিকে কুয়াশাচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছিল। দেখলাম প্রতিপক্ষের উল্লাস ক্রমশঃ বাড়তে আছে। বিক্ষিপ্ত আর কেউ নেই, দলে দলে পদচারণ আর বৈঠক, এদিক সেদিক ইতস্ততভাবে চলছে। আমার মন মানসিকতায় এই নিুচাপ যেন একটা ঝড়ের পূর্বাভাস বলে মনে হল। ইচ্ছে হল পঁচাত্তরের পরিবর্তিত অবস্থা ধরে রাখার জন্য আমি সচেতন সৈনিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিবিপ্লবকে প্রতিহত করি। কিন্তু আমার স্বতঃস্ফূর্ত আকাক্সক্ষা লোহার গরাদে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে এল। বুঝলাম আমি নিরুপায়। আমি একজন বন্দী।

এ রাতও অস্থিরতার মধ্যে কাটল। সকালে সেলের দরজা খোলার পর জানান হল, আমাকে এ সেল ডিভিশন ছাড়তে হবে। ওদের ভাষার মধ্যে শালীনতা ও সাবলীলতা নেই। সার্জেন্ট নিজে একজন তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আওয়ামী লীগের ভেতর-বাহির সব চ্যানেলের সাথে তার ছিল অন্তরঙ্গতা। দিনের শুরুটা ভাল লাগল না মোটেও। এই ঘটনা অশুভ সংকেত বলে মনে হল। বাদ প্রতিবাদ না করে আমি তৈরী হলাম। এবার আমি ফাঁসীর সেলে। ফাঁসী হোক আর নাই হোক সার্জেন্টের এই কাজ, আমাদের প্রতি তার ভয়ঙ্কর জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ। ফাঁসীর সেলে আটক রেখে আমার মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়ে এক বর্বরোচিত আনন্দ চোখে চোখে উপভোগ করতে চান তিনি। তার ভাবখানা যেন এই এবার তোমাকে ফাঁসীর সেল থেকে বাঁচাবে কে? তার মুখেই জানতে পারি- খালেদ মোশাররফ এখন ক্ষমতায়। মুজিব হত্যাকারীরা পলাতক। ভাবলাম ভাগ্যহত জাতিটা আবার অসহায় হয়ে পড়ল। ফাঁসীর সেলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু বিচলিত হইনি মোটেও। কেননা আমি জানি জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। এমনি ফাঁসীর সেলে বসেই বিপ্লবী নেতা মোরশেদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ফাঁসীর রায় শুনেও ছিলেন নির্বিকার। দ্বিধাহীন চিত্তে বই লিখে গেছেন সেল প্রকোষ্ঠের ক্ষুদ্র পরিসরে। ক্ষমা চাননি কারো কাছে। বলেছেন- 'উপরের ফায়সালা না হলে কেউ আমাকে ফাঁসী দিতে সক্ষম হবে না।'

একদিন কাটল ফাঁসীর সেলে। আমি একা। মানসিক ভীতি অথবা অজানা আশঙ্কায় মনে কোন দুর্বলতার সঞ্চার হয়নি তবে একাকীত্ব আমার দারুণ খারাপ লাগছিল। আমাদের ভাইদের থেকে দূরে অবস্থান করে অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। একটা দিন কোন মতে কাটল। পরদিনও একইভাবে পার হল। নামাজ কালাম তসবীহ তাহলীল করে অধিকাংশ সময় আমার কাটছে। রাত্রে ঘুম, নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন। দুটো দিন অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আবার আকস্মিক গুলীর শব্দ। গুলী চলছে। অবিরাম গুলীর শব্দ। 'মিয়া সাহেব মিয়া সাহেব' বলে ডাকলাম সেন্ট্রীকে। জেলের পরিভাষায় সেন্ট্রীদের মিয়া সাহেব বলা হয়ে থাকে। তিনি আসলেন। দেখলাম- বেশী বয়সী একজন বিহারী পুলিশ। তার সাথে আমার কথাবার্তা আগে থেকে হত। জিজ্ঞেস করলাম- 'কি হয়েছে?' তিনি বললেন- 'দোয়া করেন সাহেব। বাইরে গণ্ডগোল চলছে।' তবে এর বেশী তিনি কিছু বলতে পারলেন না।

রাত্রি ভোর হল। সকাল হল স্বাভাবিক নিয়মে। সেন্ট্রীদের মাধ্যমে বিকেল নাগাদ খবর পেলাম- খালেদ মোশররফের পতন হয়েছে। সিপাহী জনতা জেনারেল জিয়াকে আটকাবস্থা থেকে বের করে এনেছে। মোশতাক এখন আর প্রেসিডেন্ট নন, তিনি বিবৃতি দিয়ে সরে গেছেন। নতুন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ করেছেন। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের ঝুঁকি গ্রহণকারী তরুণ সেনানায়করা দেশের মাটিতে আর নেই। দারুণভাবে দুঃখ পেলাম। মনে হল সেই জানবাজদের কাছে জাতির অনেক পাবার ছিল। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি ঐকান্তিক দরদ ছিল বলেই তারা চূড়ান্ত কোরবানীর প্রস্তুতি নিয়ে মুজিবকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তাদের তত্ত্বাবধানে তিন মাসের বাংলাদেশ অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের বাংলাদেশ। তাদের সদিচ্ছা তাদের প্রাণের স্পর্শের সাথে কারো তুলনা করা যাবে না। জিয়ার ক্ষমতারোহণ, এতে খুশী হওয়ার কিছু নেই। কেননা দেশের পট পরিবর্তনে তার কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু পরিস্থিতির সুফলটা তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। আমার মনে হয়েছিল পঁচাত্তরের চেতনা তার মধ্যে নেই বলে ক্ষমতায় আট ঘাট হয়ে বসবার চিন্তা-চেতনা দ্বারাই তিনি চালিত হবেন। অর্থাৎ আদর্শ নয়, ঐতিহ্য নয়, জাতি নয়, দেশ নয় তার কর্মের কেন্দ্রবিন্দু মসনদ। ফাঁসীর সেলে বসে

জিয়া সম্বন্ধে আমার যে ধারণার উন্মেষ হয় জিয়া তার শাসনকালের প্রতিটি কর্মে অনুরূপ স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথমতঃ পঁচাত্তরের নায়কদের বাংলাদেশে আসতে দেননি। আসলেও তাদেরকে জুলুম নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বিচারপতি সায়েমকে সরিয়ে তিনি নিজেই মসনদে সমাসীন হয়েছেন। তৃতীয়তঃ বিমান বাহিনী প্রধান এমজি তোয়াবকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছেন। কেননা এ দেশটাকে ইসলামী দেশে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তার সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করা সত্ত্বেও কর্ণেল তাহেরকে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছেন। ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন বিমান বাহিনী অফিসারদের হত্যা করিয়েছেন। শত শত তরুণ সামরিক অফিসার ও জোয়ানদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। শত শত সৈনিককে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছেন। রাজনীতিকদেরকে তেজারতের মালে পরিণত করেছেন। তার শাসনামলে রাজনীতিকদের কেনা-বেচা শুরু হয়। তিনিই সেনাবাহিনীকে রাজনীতির মোহে আবিষ্ট করেছেন। তার ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ না করে ভাঙনের দিকে নিয়ে যায়। বিসমিল্লাহর ছত্রছায়ায় তিনি ইসলামী চেতনাকে নস্যাৎ করার সুযোগ করে দেন। কর্ণেল নাসেরের মত একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার লক্ষ্যে তার সমস্ত কাজ আবর্তিত হতে থাকে। সরকারী ব্যয়ে তরুণদেরকে তার রাজনীতির মুখাপেক্ষী করে তোলেন। সবচেয়ে বড় কথা এ দেশটার স্বকীয় সত্তার বিকাশ না ঘটিয়ে আমেরিকা ও রুশ-ভারত অক্ষশক্তির চারণভূমিতে পরিণত করেন।

দুঃসাহসিক নওজোয়ানেরা যুগের মীরজাফরকে হত্যা করে মীর কাশিমকে মসনদে বসায়। অর্থাৎ মুজিবের পর প্রেসিডেন্ট হন খন্দকার মোশতাক। মীরজাফরের সহযোগী হিসেবে তার অতীত গুনাহের কাফফারা আদায়ের জন্য তার উচিত ছিল গণভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়া। তা না করে তিনি কেবল পুরোনো পাঁকে পুরোনো চক্রের আবর্তে খাবি খেয়েছেন। গোটা জাতিকে একটা ইস্যুর ওপর ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থই বা বলি কেন? জাতিকে তার সত্তার মূল স্রোতধরায় প্রবাহিত করার

চেষ্টা করেননি। হালকা কিছু সংস্কারের প্রলেপ দিতে চেয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু এতে গোটা জাতির রোগ নিরাময় হল না। একাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত রোগভোগের পর জাতির জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থা না হওয়াতে রোগ জীবাণুগুলো সক্রিয় হয়ে উঠল। এর ফল মাত্র তিন মাসের মধ্যেই মোশতাক সরকারের পতন।

বিপ্লবোত্তর প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক রাজনীতিকদের দ্বিতীয় ঠিকানা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সেল প্রকোষ্ঠে ঠাঁই পেলেন। এই কারাগার তখন আওয়ামী বাকশালী ও বামপন্থীতে পরিপূর্ণ। ইসলামপন্থীদের সংখ্যা ক্রমশ কমতির দিকে। আওয়ামী বাকশালী ও বামপন্থীদের অস্থিমজ্জায় মিশে থাকা সন্ত্রাসী প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মাঝে মাঝে ঘটতে থাকে। এর প্রেক্ষিতে আমি, শফিউল আলম প্রধান এবং আরও অনেকে মিলে আওয়ামী বাকশাল বিরোধী একটি মোর্চা গঠন করি। এই অবস্থার মধ্যে খন্দকার মোশতাক সাহেব কারাগারে প্রবেশ করলেন।

২৬ সেল ডিভিশনে তার প্রবেশকে বলা যায়- রোষ্ট হবার জন্য একটা মোরগ যেন রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে। মাত্র তিন মাস আগে এই আওয়ামী বাকশালীদের উৎখাত করে এদের নেতাদের লাশের ওপর খন্দকার মোশতাক সাধের সোনার বাংলার মসনদে আসীন হন। তাছাড়া মাত্র কয়দিন আগে তাদের ৪ নেতাকে হত্যা করা হয়। এর জন্যও তারা মনে করে মোশতাক স্বয়ং এটা করিয়েছেন। আজকে সেই মোশতাক তাদের হাতের মুঠোয়। দুশ্চিন্তার দুঃসহ গুরুভার নিয়ে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকলেন। তাছাড়া বাকশালীদের ভয়ঙ্কর উক্তি ও প্রতিশোধস্পৃহা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। আমরা মোশতাক সাহেবের অবস্থা আঁচ করতে পারলাম। ওদিকে মোশতাক সাহেবের ভাগ্নে কাজী বারী তার সাথে যোগাযোগ করে আমাদের জানালেন যে, তিনি হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে কি করা যায় আপাতত ভাবতে লাগলাম। শফিউল আলম প্রধান তার গ্র“প থেকে শক্তিশালী দু'জনকে সার্বক্ষণিক পাহারা দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে পাঠিয়ে

দিলেন। আমরা ঘোষণা দিলাম মোশতাক সাহেবের ওপর কেউ আঘাত হানার চেষ্টা করলে কারাগার কারবালায় পরিণত হবে।

মোশতাক সাহেব প্রায়ই কাজী বারীর সেলে তার সাথে দেখা করতে আসতেন। একদিন কাজী বারী আমার সেলে থাকায় তিনি আমার সেলে এসে উপস্থিত হলেন। আমার সাথে বারী ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন- 'আমিনকে ছোট থেকেই জানি। প্রথম দিকে আমাদের সাথে কাজ করলেও '৬৯ সাল নাগাদ ইসলামী ছাত্রসংঘে যোগ দেন। তারপর একাত্তরে আমরা ছিলাম দুই বিপরীত মেরুতে। এখন আবার বাস করছি এক জায়গায়।'

আমি বললাম- 'মুজিবের আইনের ফাঁদে আটকে আমাকে ৪০ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়।'

মোশতাক সাহেব বললেন- 'আমি কালাকানুন ঘোষণা দিয়ে ওই সবগুলো বাতিল করে দিয়েছি।' বললাম- 'কিন্তু আমাদের কারাদণ্ড বাতিল হয়নি। আপনি কালাকানুন ঘোষণা দিয়েই খালাস। কিন্তু আওয়ামী চক্র তো প্রশাসনের রন্ধে রন্ধে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। তারা আমাদের দণ্ডাদেশ বাতিল করবে কেন?'

খন্দকার মোশতাক স্বল্পভাষী, নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন। মাত্র কয়টা দিন আগে জাতির সর্বোচ্চ আসনে থেকে কত অজস্র সম্মান কুড়িয়েছেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! আজকে কয়েদীদের সাথে কারাবাস করছেন। তার ইঙ্গিতে কত অজস্র মানুষ কারাগারে নিক্ষিপ্ত। আজকে তিনি সেই কারাগারে সবচেয়ে অসহায় প্রাণী। তাকালাম তার দিকে। তার চোখ আর চাওনিতে নৈরাজ্যের অন্ধকার। মনে পড়ল নজরুলের সেই মরমী সঙ্গীত-

নদীর এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে
এই তো নদীর খেলা
সকাল বেলা আমীর রে ভাই
ফকীর সন্ধ্যা বেলা।

অবশ্য তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম- 'আমরা রয়েছি আপনার পাশে। আমাদের লাশের ওপর দিয়ে ওরা আপনার ওপর চড়াও হতে পারবে তার আগে নয়।

আমরা আপনার ব্যাপারে সতর্ক। শাদ্দাদের স্বপ্ন আপনি ভেঙে চূরমার করেছেন। জাতিকে এর চেয়ে বড় উপহার দেয়ার কি ছিল? কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে আমরা দোয়া করেছি আপনার জন্য, যারা আপনার পাশে ছিল তাদের জন্য। আল্লাহ নিশ্চয় তার রাস্তায় চলা মজলুমের দোয়া ফিরিয়ে দেন না।'

ঈদ সমাগত। আত্মীয় পরিজন দূরে রেখে কারাগারে ঈদের আবেদন খুব একটা আমাদের কাছে নেই। এই ঈদ আমাদের কাছে যত মলিন বিবর্ণ হোক, যত মহররমের মত বেদনা বিধৃত হোক, তবু ঈদ তো। বছরের এই একটি দিন, বছরান্তে এই দিন জীবনে আর ঘুরে নাও আসতে পারে। কবি রবীন্দ্রের ভাষায়- 'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে?' যে দিন যায় তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই এই কারা প্রকোষ্ঠে ঈদ উদযাপনের আয়োজন চলল। আয়োজন চলল আওয়ামী বাকশালী শিবিরে, সে আয়োজন ঈদ উদযাপনের নয়, খন্দকার মোশতাককে ঈদের জামায়াতে হত্যার আয়োজন। খবর আমাদের কানেও এল। কারা কর্তৃপক্ষের কানেও গেল। খন্দকার মোশতাকের জানতে বাকী রইল না। আমি মনে করলাম, সে সময় খন্দকার মোশতাককে সাহস যোগান দরকার। আমি একাই তার সাথে দেখা করতে চললাম। সামনে দিয়ে গেলে বিভিন্ন বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙাতে হবে। আমি সেসব এড়িয়ে, পেছন দিক দিয়ে তার জানালার সমনে দাঁড়াতেই তিনি জানালার কাছে এগিয়ে এলেন। আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন। সে কান্না শিশুদের কান্নার মত। বুঝলাম, ঘাবড়ে গেছেন তিনি। আমাকে বললেন- ওরা আমাকে হত্যা করতে চায়।' বললাম- 'অসম্ভব। হকের দীপশিখাকে বাতিলেরা সম্মিলিতভাবে এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ এ দীপশিখাকে আরও প্রজ্জলিত আরও উদ্দীপ্ত করে তোলেন। আপনি নির্ভয়ে থাকুন ওরা আপনার কিছু করতে পারবে না। এছাড়া আপনার ব্যাপারে আমরা সতর্ক। আমরা প্রত্যেকেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।'

কারা কর্তৃপক্ষ পর দিন ঈদের জামায়াতে শামিল হতে তাকে নিষেধ করেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে। কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত সঠিকই বলতে হয়। যদি মোশতাক সাহেব জামায়াতে যেতেন, আর তার উপর যদি হামলা পরিচালিত

হত, তাহলে সম্ভবতঃ ঈদের মাঠ রণাঙ্গনে পরিণত হত। কারাগারে প্রাণহানি ও রক্তপাতের খবর ব্যানার হেডিং হয়ে পৃথিবীর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হত। আল্লাহ সে অবস্থা থেকে কারাগারকে সেদিন বাঁচিয়েছেন। যাই হোক, যতদিন খন্দকার মোশতাক সাহেব কারাগারে ছিলেন আমরা তার নিরাপত্তার জন্য চোখে চোখে রেখেছি।

ছয়

খবর পেলাম কয়েকজন ভদ্রলোক আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন। আমি তড়িঘড়ি ভিজিটিং রুমে এলাম। এসে দেখলাম কেউ নেই। গেটের কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম প্যান্ট-শার্ট পড়া নাদুসনুদুস ভদ্রলোক তার পরিষদবর্গ নিয়ে লোহার গেট দিয়ে ভিতর ঢুকছেন। সালাম দিলাম। জবাবও পেলাম। তার সাথে অতিরিক্ত পেলাম মিষ্টি হাসির তোহফা। অর্ধযুগ পর অতি পরিচিত, অতি চেনা অতি পুরানো øেহ আর মমতা মিশ্রিত এ হাসি আমার অন্তরের গভীরে নাড়া দিল। আমার রাহবার, আমার পথপ্রদর্শক, আমার নেতা যেন দিগ¦ীজয় করে ফিরে এসেছেন। উনসত্তরের প্রথমার্ধে ভৈরব রেলওয়ে কলোনীতে ইসলামী ছাত্রসংঘের একটি ঘরোয়া বৈঠকে আমি আমন্ত্রিত। যদিও আমি তখন ছাত্র ইউনিয়ন করি। সেখানে আশরাফ ভাই বক্তৃতা করলেন। অনেক জিজ্ঞাসার জবাব দিলেন। নতুনত্বের সন্ধান পেলাম আমি। গড্ডালিকা প্রবাহে আর নয়, স্রোতের বিপরীতে চলবার শপথ নিলাম। আমার তারুণ্য তওহীদের পথে এগিয়ে চলার আগ্রহে তীব্র হয়ে উঠল।

কৈশোরের তারুণ্য আর অবুঝ অন্ধতায় ছিলাম ছাত্রলীগে, দুর্নিবার আঠারোতে ছাত্র ইউনিয়নে। তারপর নতুন উপলব্ধি, নতুন চেতনা নিয়ে ইসলামী ছাত্রসংঘের সাথে একাকার হলাম। আশরাফ ভায়ের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হত। দ্রুত সাংগঠনিক পথ পরিক্রমায় আমি এগিয়ে চলছি। নিত্য নতুন দায়িত্ব এসে পড়ছে। অবশেষে একাত্তরে আলবদর। তখন আশরাফ ভাইয়ের সাথে দেখা হতো না কিন্তু তিনি গাইড করতেন টেলিফোনে। তার পর বিপর্যয়। ঝড়ের পাখির মত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সকলে। পল থেকে প্রহর, প্রহর থেকে দিন, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর, বছর থেকে যুগের অর্ধেক পেরিয়ে আজ আশরাফ ভাই আবার আমার সম্মুখে।

আশরাফ ভাই কথা পাড়লেন। একাত্তরের পতনের পর কিভাবে কোলকাতায় গেলেন ও ভারতের মুসলমানদের তখন কি দুঃসহ মানসিক অবস্থা তিনি একে একে বলতে থাকলেন। তিনি বললেন- আমাদেরকে যখন বাংলাদেশে বিশ্বাসঘাতক আর দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে ঘরে ঘরে তল্লাসী করে খুঁজছে, যখন এদেশে আমাদের ভাইয়ের হাতে আমাদের বুক বিদীর্ণ হচ্ছে, তখন হিন্দুস্তানের হিন্দুদের গৃহে চলছে দেয়ালী আর মুসলমানদের ঘরে ঘরে চলছে মাতম আর মর্সিয়া। আমি নিজের দেশ নিজের ভূখণ্ড ছেড়ে যখন কোলকাতায় উপস্থিত হলাম, মুসলমানরা তখন আমাকে সাগ্রহে আগলে রাখল। দেখলাম কি অপরিসীম তাদের দরদ।

পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে হিন্দুস্তানী সৈনিকদের পদচারণায় তারা কি নিদারুণ আহত। শেষ পর্যন্ত কোলকাতায় আমার দ্বীনি ভাইয়েরা অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাখতে পারলেন না। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন পিছু লেগেছে। ওখানে প্রত্যেকটি মুসলমানের পেছনে গোয়েন্দা। যেন রুশ-ভারতের নীলনক্সা মত আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীদের দ্বারা নির্যাতিত মজলুম মুসলমানদেরকে আশ্রয় না দিতে পারে। কোলকাতার মুসলিম ভাইয়েরা আমাদেরকে তাদের আশ্রয়ে রাখতে পারলেন না। আমার নিরাপত্তার জন্য আমাকে দিল্লী যেতে হল। সেসব আয়োজন উদ্যোগ কোলকাতার মুসলমান ভাইয়েরা করলেন। দিল্লীর মুসলমান ভাইয়েরাও আমাকে সাদরে আগলে রাখলেন। এখানেও একই রকম গোয়েন্দা তৎপরতা। এবার বোম্বে এলাম। দিল্লীর ভাইয়েরা বোম্বে পর্যন্ত আসার এবং নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। এখানেও থাকলাম অনেক দিন। গোয়েন্দারা তৎপর এখানেও। তারপর চোরা পথে দুবাই গেলাম, সেখান থেকে পাকিস্তান। সেখানে আলবদর দেখার জন্য শত শত মানুষের ভিড় জমে গেল। প্রত্যেকদিন আমি মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বৈকালিক অধিবেশনে তার সাহচর্য থেকে কিছু সংগ্রহ করার জন্য বসতাম। আমাকে পেয়ে মওলানা দারুণ খুশী। বিস্তারিত- ভাবে বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থা আমার কাছ থেকে শুনলেন আর দোয়া করলেন আমাদের অগণিত নির্যাতিত মানুষদের জন্য।'

আশরাফ ভাই বলে চলেছেন- 'নিজের দেশ, নিজের মাটি, আমাদের জন্য বেগানা হলেও দুনিয়ার মুসলমানরা আমাদের এই ত্যাগ এই কোরবানীকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেছেন। গ্রহণ করেছেন ইসলামের সাম্প্রতিক ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে। দুশ্চিন্তা করবেন না। আমাদের ত্যাগ বিফলে যাবে না কোনদিন। আমি আপনাদের সবার খবর রাখার চেষ্টা করেছি। আপনি কারাগারের নিভৃত সেলে থেকেও ইসলামী আন্দোলনের জন্য কী করেছেন তা আমার অজানা ছিল না। এদেশে আসার আগে আমি নিয়ত করেছিলাম দেশের মাটিতে পা দিয়েই আমি আপনার সাথে দেখা করব। আমি কোথাও না গিয়ে সরাসরি আপনার সাথে দেখা করার জন্য এখানে এসেছি।'

তার কথা শুনে মনে হল যদিও আমি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিসঙ্গ, কিন্তু একা নই। পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আমার আপনজন। যাদের কল্যাণ কামনা, যাদের আশীর্বাদ আমাকে বেষ্টন করে রয়েছে। তাদের দোয়ায় সম্ভবতঃ আমি বেঁচে আছি।

আমি বেশী কথা বললাম না। আমি যা বলব সবই আশরাফ ভাইয়ের জানা। আমি স্রেফ একজন ধৈর্যশীল শ্রোতা হিসেবে তার কথাগুলো শুনতে লাগলাম। সংগঠনের জন্য তার ত্যাগ-তিতিক্ষা অপরিসীম। বৃহত্তর মোমেনশাহীতে বিপ্লবের মশাল নিয়ে গ্রাম-গঞ্জ, শহর-শহরতলীতে ছুটে বেড়িয়েছেন। তার সাহায্য না পেলে হয়তো আজও অন্ধকারের আবর্তে খাবি খেতাম। তিনিই আমাকে টেনে এনেছেন জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে। তাকে ভুলব না। ভোলা উচিতও না।

প্রাণের আবেগ দিয়ে আশরাফ ভাই অনেক কিছু বললেন। বললেন সিন্দাবাদের মত তার দুঃসাহসিক সফরের ইতিবৃত্ত। তারপর বিদায় নিলেন। মন চাইল না ছেড়ে দিতে। কিন্তু আমি কারাগারের একজন বন্দী বই তো কিছু নই। আমার সম্মানিত মেহমানকে রাখার স্থান তো কারাগার নয়। তিনি চলে গেলেন। বিবর্ণ হাসি দিয়ে তাকে বিদায় দিলাম।

তারপর একদিন শুনলাম আশরাফ ভাই আবার এসেছেন। আমি তার জন্য ভিজিটিং রুমের দিকে এগুতেই একজন আমাকে বললেন- 'আরে না ওদিকে নয়। ৪নং ওয়ার্ডের দিকে যান।' বুঝলাম আশরাফ ভাই কারাবাসে। ৪নং ওয়ার্ডে গিয়ে দেখলাম আশরাফ ভাই বসে আছেন দুশ্চিন্তার দুঃসহ গুরুভার নিয়ে। আমাকে দেখেই একটু ম্লান হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। আমি হেসে বললাম, 'আশরাফ ভাই, আমার প্রতি আপনার প্রাণের টান হয়তো বা আমার কাছে আপনাকে টেনে এনেছে। সবই আল্লাহর মেহেরবানী। আল্লাহর কোন ফায়সালার ওপর নারাজ হওয়া উচিত নয়।' জিজ্ঞাসা করলাম- 'আপনি এখানে এলেন কিভাবে?' তার মুখ থেকে জানলাম কোন এক রেস্টুরেন্টে চা খাওয়ার সময় একাত্তরে তার এলাকার কর্মরত একজন পুলিশ অফিসার তার প্রতি এই মেহেরবানী করেছে। তারই সৌজন্যে তিনি এখন কারাগারে। সাতাত্তরে এসেও একাত্তরের রেশ শেষ হয়নি। আশরাফ ভাই যাতে ভেঙে না পড়েন এ জন্য তার সঙ্গ দিতে থাকলাম। তাছাড়া কারাগারে আশরাফ ভাই থেকে আমি সিনিয়র এ জন্য দায়িত্ব অনুভূত হল বেশী করে। তৃতীয় শ্রেণীর ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে সরিয়ে তাকে হাসপাতালে থাকার ব্যবস্থা করলাম। সেখানেও তিনি বিব্রত বোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত কারা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে নিয়ে এলাম আমার সেলে। এখানে তার জন্য আমার বিছানা ছেড়ে দিয়ে আমি নিচে থাকতাম। আমার নেতাকে সাথে পেয়ে আমার নিঃসঙ্গ সময়গুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। জেল থেকেই তিনি দুবাইয়ে ব্যারিষ্টার কোরবান আলী সাহেব ও তার স্ত্রীকে চিঠি লেখেন। তার মুখেই শুনেছি, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের প্রতিক্রিয়াশীল মহনুভবতায়

পাকিস্তানে তার এবং কোরবান সাহেব-এর সংকটের কথা। তারপর দুবাইয়ে পাড়ি জমান। সেখানে কিভাবে সংকট উত্তরণের প্রয়াস নিয়েছেন, একে একে সবকিছু তিনি খুলে বললেন।

তারপর একদিন তিনি মুক্তি পেলেন। খাঁচা থেকে বেরিয়ে মুক্তির দিগন্তে ডানা মেললেন। আমি রয়ে গেলাম সেই অন্ধ তমসায়। সেই নিবিড় তিমিরে। দিল্লী হনুজ দূরাস্ত। চল্লিশ বছর অনেক দূর।

দিনের বেলাটা কারাবাসী দ্বীনি ভাই ও অন্যান্য সংগঠন বহির্ভূত ভাইদের সাথে আলাপ আলোচনা তালিম তরবিয়ত ও খেলাধুলার মধ্যে সময় অতিবাহিত হলেও রাত্রির একান্ত একাকীত্ব মাঝেমাঝে আমাকে বিচলিত করে তোলে। অন্তহীন হাহাকারে ঘিরে ধরে আমাকে। একটা কোমল অনুভূতি পাওয়ার আকুতি আমাকে কাতর করে তোলে। অন্তহীন প্রত্যাশা নিয়ে অধীর আগ্রহে যে মহিয়সী অপেক্ষা করছেন তার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠি। মনে হয় কারাগারের গরাদ ভেঙে আমি ছুটে যাই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেটে গেল। দেখতে দেখতে ৮টি বছর আমার জীবন থেকে খসে পড়ল। ৪০ বছরের দণ্ড প্রাপ্ত তাও চুরি ডাকাতি অন্যায় অপকর্মে নয়, ভাগ্যহত জাতির ইজ্জত ও আজাদী কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য আমাদেরই এই বুজদীল জাতির কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে ধুঁকে মরছি। কাছে থেকেও আমার প্রিয়জন, একান্ত প্রিয়জন থেকে আমি কোটি যোজন দূরে। কতরাত আমি বিনিদ্র তার জন্য। মোমেনশাহী কারাগারে তাকে আমি দেখেছি, দেখেছি তার অশ্র“সজল চোখ। সেই ছবি সাজিয়ে রেখেছি হৃদয়ের একান্ত গভীরে। আমার অনুভূতি দিয়ে তাকে দেখি। রোজ দেখি। দেখি তার অশ্র“ভেজা চোখ। তার øিগ্ধ মমতার চাওনি। তার কোমল হাতের স্পর্শ, তার আবেগ-জড়িত বাণী, আমাকে আজও বিহ্বল করে রেখেছে। তবু ইচ্ছে হয় আর একবার দেখি। আবার দেখি তাকে। মমতার মূর্ত প্রতীক সেই মহিয়সী কি আসবেনা এখানে এই কারাগারে, আমার একান্ত কাছাকাছি।

উনআশির প্রথম দিক, দিন তারিখ মনে নেই। খবর পেলাম ভিজিটিং রুমে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য কিছু লোক অপেক্ষা করছে। আমার ধারণা হল আমার সংগঠনের কেউ হবে হয়তো। জমাদারের কাছে নিয়ম মত একটা স্লিপ জমা দিয়ে ভিজিটিং রুমের দিকে রওয়ানা হলাম। ঢুকেই আমি চমকে উঠলাম। এক বিশীর্ণ মহিলা কাতর চোখ মেলে অধীর আগ্রহে চাতকের মত অপেক্ষা করছেন।

এই সেই মহিলা যার জন্য আমার উৎকর্ণ প্রতীক্ষা। এই মহিয়ষী মহিলাই আমার মা। মায়ের কাছে এগিয়ে গেলাম। সালাম দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। মা তার বিশীর্ণ হাত দিয়ে আমাকে নেড়ে চেড়ে দেখছে। মায়ের আগের সেই লাবণ্য নেই, রোগে শোকে চামড়াগুলো কুঁচকে গেছে। চোখ দুটো কোঠরাগত। মা বললেন, 'বাবা এই বোধ হয় শেষ দেখা। আর দেখা হবে না।'

মার শরীর উত্তপ্ত। কথা বলতে পারছেন না, কাঁপছেন। মাকে বললাম- 'মাগো, তুমি আমার জন্য দোয়া করো। একমাত্র তোমার দোয়া আমাকে জুলুম-মুক্ত করতে পারবে। মা, দুনিয়ার যে যাই বলুক তোমাকে আবার জানাচ্ছি, আমি অন্যায় করিনি। কোন অপকর্মে জড়িত ছিলাম না, তুমি অন্তত বিশ্বাস করো। দোয়া করো ভবিষ্যতেও যেন আল্লাহর পথে থাকতে পারি।' মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। মাকে আমি বিরক্ত করতে চাইলাম না। যত দেরী হবে কষ্ট বাড়বে তার। আমার দেখার বড় সাধ ছিল। প্রাণ ভরে দেখে নিলাম। মার সাথে ছিল আমার খালাত ভাই আবদুল লতিফ, খন্দকার বজলুর রহমান, মামাত ভাই আবদুর রহমান দুটো বোন, ও ভাগ্নেরা। সবার সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপ করে মার চিকিৎসা ভালভাবে করার জন্য উপদেশ দিলাম আর বললাম একটা ছবি তুলে নেয়ার জন্য। আমার মনে হল এ দেখাই শেষ দেখা। মাকে আর আমি পাব না।

মাকে পেয়ে যেমন আমি আনন্দিত হয়েছি। তার জীর্ণ শীর্ণ শারীরিক অবস্থা দেখে ততোধিক পেয়েছি কষ্ট। তবে কুদরতের ফায়সলা যা হবার তাই হবে; সেখানে আমাদের কোন হাত নেই, করণীয়ও কিছু নেই। ভাবনা দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম।

তারপর তিন মাস পেরিয়ে গেছে। উনআশির ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শেষ রাত্রে আমি দেখলাম দুঃস্বপ্ন। মা যেন মারা যাচ্ছেন। শ্বাসকষ্ট আর মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির, কোন কথা বলতে পারছেন না। আমি দেখছি ভয়ঙ্কর কষ্ট আমারও। কান্নায় ভেঙে পড়ছি নিঃশ্বাস আমার বন্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু অস্থিরতা কমল না। উঠে পায়চারী করলাম। অযু করে নামাজ পড়লাম আর দোয়া করলাম মায়ের জন্য।

এরপর কয়েক দিন পর চাচা খন্দকার ইসমাঈল এলেন আমার সাথে দেখা করার জন্য। অনেক কিছু আলাপ করলেন। চাচা তার আলাপ আলোচনায় ভিন্ন কিছু হয়তো বা বলতে চেয়েছেন, কিন্তু আমি বুঝিনি অথবা বুঝার চেষ্টা করিনি।

আরও কয়েকদিন পর সংগঠনের কয়েকজন এলেন। এর মধ্যে ছিলেন জামায়াতের আব্দুল খালেক মজুমদার ভাই, কামরুজ্জামান ভাই, আজহারুল ইসলাম ভাই শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি আবু তাহের ভাই, ছাত্র নেতা এনামুল হক ভাই, মোঃ ফারুক ও মালেক ভাইসহ ১০ জনের মত। এতজন এক সাথে তারা কোন দিনেও সাক্ষাতের জন্য আসেননি। সকলকে এক সাথে দেখে সালাম বিনিময়ের পর আমি বললাম- 'আপনারা কেন এসেছেন আমি জানি। আমার মা মারা গেছেন তাই না? দিনটা ছিল শুক্রবার, যেদিন শেষ রাতে স্বপ্ন দেখি।' তারা অবাক হলেন, আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন।

মায়ের সাথে সাক্ষাতের পরই বুঝেছিলাম মা আর বাঁচবেন না। সেদিন থেকে মাকে হারানোর মত বিরাট একটা আঘাত সহ্য করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

মা নেই। এ বিরাট পৃথিবীতে আমার শেষ আশ্রয়টুকুও ব্যথার প্লাবনে ভেসে গেল। এখন আমি একা। নিতান্ত একা আমি। এই বেশ হল। পিছুটান আর রইল না। বিপ্লবীদের পিছুটান না থাকা ভাল।

প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজের পর নিয়মিত ব্যায়াম করার সময় দেখতাম লুঙ্গী আর পাঞ্জাবী পড়া একটা লোক মন্থর গতিতে একাকী ইতস্তত হাঁটছেন। সকালের হাওয়া গায় লাগানো হয়তো তার অভ্যাস। পরিচয় জেনেছিলাম- তিনি কমিউনিস্ট পার্টির জাঁদরেল নেতা কমরেড ফরহাদ। তার সাথে আলাপ আলোচনার ইচ্ছে আমার কম ছিল এমনটি নয়। তবে চিন্তা-চেতনা ও কর্ম পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা বিপরীত বলয়ে অবস্থান করছি সে কারণে কিভাবে তার সাথে আলাপ আলোনার সূত্রপাত করব এ নিয়ে কয়েকদিন ধরে ভাবছিলাম!

সেদিন যখন ব্যায়াম সেরে শরীরটা ম্যাসেজ করছি তখন পাঞ্জাবী ও একটা দামী লুঙ্গীপড়া সেই ভদ্রলোক আমার কাছে এসে নিজেই প্রথমে কথা পাড়লেন। বললেন- 'আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারবেন।' আমি তক্ষুণি ফালতুকে বললাম এক গ্লাস পানি দিতে। পানি খাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন- 'আপনি কি বাইরেও ব্যায়াম করতেন?' বললাম- 'জ্বি করতাম। তাছাড়া আমি স্পোর্টসের সাথে জড়িত ছিলাম। এখানে একটু বেশী করার কারণ, অন্য কোন কাজও নেই। অতিরিক্ত ব্যায়াম করে শরীরের চাহিদা পুষিয়ে নিচ্ছি। তা না হলে ৪০ বছরের কারাবাসে এমনিতেই শরীর নেতিয়ে পড়বে।'

এরপর থেকে তার সাথে আমার সখ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা- দুটো বিপরীতমুখী অবস্থানে থেকেও কারাগারের নিঃসঙ্গতায় আমাকে তিনি কথাবার্তা বলার ও আলাপ আলোচনার সাথী হিসেবে পাবার ফলে তিনি আমার সাথে কথা বলতে ভালোবাসতেন। অথবা এও হতে পারে তার চিন্তা- চেতনা আমাকে প্রবাহিত করার জন্য আমাকে টার্গেট করেছেন।

তার সাথে আমার সব রকম আলাপ আলোচনার দ্বার খুলে গেল। প্রত্যেক দিন তার সাথে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে আলাপ হত। তার সাথে মতান্তর, মত- বিরোধ হয়েছে। কিন্তু সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি কখনও। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি দুঃখ করে বলেন- 'আমরা এ জাতিটার কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন রয়ে গেলাম। আমরা ইসলাম বিরোধী, আমরা ধর্মদ্রোহী এমন একটা ধারণা মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল রয়েছে। সে বিভ্রান্তি উপড়ে ফেলা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। অথচ আমরা শোষণ বঞ্চনার অবসানের জন্য সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের কথা বলে থাকি, যা ইসলামেরও লক্ষ্য।'

আমি বললাম- 'আপনাদের অর্থনৈতিক প্রসঙ্গটাকে বাদ দিয়ে যদি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আপনাদের কার্যক্রম নিয়ে বিতর্ক না করে নিজেরাই বিশ্লেষণ করেন তাহলে এটা কি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবেনা যে, আপনারা আপনাদের কর্মীদের ভেতরে ইসলামী চিন্তা- চেতনার বিলোপ ঘটাতে চেয়েছেন? যাদের চিন্তাধারা আপনাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ভিত্তি সেই মার্ক্স, সেই লেনিন, যারা ধর্মকে আফিম বলেছেন, খোদার অস্তিত্ব মুছে ফেলার কথা বলেছেন। এ ছাড়াও যে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের মদদ নিয়ে ময়দানে নেমেছেন, তাদের হাত কোটি কোটি মুসলমানদের রক্তাক্ত করেছে। তাদের আগ্রাসী ভূমিকা মধ্য এশিয়ার ৬টি মুসলিম রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র দখলে রেখেছে এমন নয়, তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নির্মূল করে দিয়েছে। এর ফলে যাদের মধ্যে একটুখানি ইসলামী চেতনা রয়েছে তারা কি করে আপনাদের সেই পুরানো ফাঁদে পা রাখবে?

'তিনি একটু চুপ থেকে বললেন- 'এদেশের ইসলামপন্থীরা যেভাবে সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করে, যেভাবে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের সমালোচনা করে, সেভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ও পুঁজিবাদের সমালোচনায় মুখর নয়। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না কি, ইসলামপন্থীরা শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে?'

বললাম- 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের সমালোচনা করেনা এমনটি নয়। তবে হ্যাঁ, দাঁড়ি- পাল্লায় ওজন করলে আপনাদের দিকটা বেশী হবে। পুঁজিবাদ যে দেউলিয়া

এটা অনেক আগে প্রমাণ হয়ে গেছে। অর্বাচীনের মত একটা মৃত লাশকে টানা- হেঁচড়া করে সময়ের অপচয় হয়তো তারা করতে চান না। তাছাড়া ধরুন, আপনার বাড়ীতে আগুন লেগে বেড়ার আগুনে মশারীও জ্বলছে, আপনি দেখছেন স্পষ্ট। আগুন আপনার কি ক্ষতি করতে পারে এটুকু বলার কি প্রয়োজন আছে? পুঁজিবাদের আঁচ প্রত্যেকের গায়ে লেগেছে আমরা সবাই জ্বলছি। কিন্তু আগুন নেভাতে সমাজতন্ত্র যে ভয়াবহ তুষারপাত ঘটাতে চাচ্ছে, সেখানেই বেঁধেছে গোল। পুঁজিবাদের আগুনে জ্বলে পুরে চিৎকার আহাজারি করার সুযোগ থাকলেও সমাজতন্ত্রের তুষারপাতে গোটা জাতি হিম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বেশী। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, পুঁজিবাদের আলোচনা সমালোচনা করা এমনকি পুঁজিবাদকে উৎখাত করার পথ খোলা আছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের অক্টোপাশে কোন জাতি আবদ্ধ হলে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন পথ নেই। সমাজতন্ত্রের সস্তা শ্লোগানে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী রয়েছে বলে সমাজতন্ত্রের ভয়ঙ্কর দিকগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরাকে ইসলামপন্থীরা তাদের দ্বীনি দায়িত্ব বলে মনে করেন।'

ফরহাদ সাহেব তখন বলেন- 'আমাদের কর্মীরা যেভাবে শোষণ- বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার, যেভাবে জনগণের দুঃখ- দুর্দশার সাথে একাকার হয়ে কাজ করছে, আপনি বলুন ইসলামপন্থীদের কাউকে কি আপনি তেমনভাবে দেখছেন?'

আমি বললাম- 'সব দলের কার্যক্রম ও স্ট্রাটেজী এক রকম হয় না। ইসলামপন্থীরা নৈতিক দিকটার প্রতি যেমন গুরুত্ব দেয় আপনাদের তেমন প্রয়োজন হয় না। ইসলামপন্থীরা মনে করে কোন বৃহত্তর পরিবর্তন আনতে হলে, নৈতিক চরিত্রের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। তারা তাদের বিশাল কর্মী বাহিনীকে নৈতিক দিক দিয়ে বলিষ্ঠভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তারা যখন গণমুখী পরিকল্পনা নিয়ে ময়দানে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখনই তাদের ওপর এসেছে প্রচণ্ড আঘাত। রুশ- ভারত এমনকি আমেরিকা এদেরকে সম্মিলিতভাবে উৎখাত করার চেষ্টা করেছে। তা ছাড়া ১৪শ বছরের বংশ পরম্পরায় পেয়ে আসা পুঞ্জীভূত ধ্যান- ধারণা আর বস্তুবাদের সৃষ্ট সন্দেহবাদ ব্যক্তি- চেতনা থেকে নির্মূল করা চাট্টিখানি কথা নয়। এটা করতে ইসলামপন্থীদের দিনের পর দিন নিরলস পরিশ্রম করতে হয়েছে। ষাটের দশক থেকে আমরা দেখে আসছি মত ও পথের বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও যে একটি ব্যাপারে আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছেন তা হল- ইসলামপন্থীদের উৎখাত করতে হবে।'

ফরহাদ সাহেব বললেন- 'আপনি তো এ ব্যাপারে একমত যে, প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম জনকল্যাণের চাইতে গণ-বিরোধী অবদান রেখেছে বেশী।'

বললাম- 'জ্বি হাঁ, সম্পূর্ণ একমত। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার বিরোধিতা আমি করছি না। এই ভাগ্যহত বিপর্যস্ত জাতির জন্য আপনাদের যে অনুভূতি ও বেদনাবোধ রয়েছে আমাদেরও একই অনুভূতি বিদ্যমান। পার্থক্য আমরা সমস্যার গভীরে আঘাত হানতে চাই, আর আপনারা সেখানে মলমের প্রলেপ দিতে চান।'

ফরহাদ ভাই হেসে ফেললেন। বললেন- 'আপনি ধরেছেন ঠিক কিন্তু বললেন উল্টোটা। আসলে আমাদেরটা রেভ্যুলিউশন আপনাদেরটা এভ্যুলিউশন।'

বললাম- 'না মোটেও উল্টো বলিনি। ধরুন একটা রিক্সাওয়ালা আপনাদের ভাষায় বঞ্চিত শ্রেণী অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত শ্রেণী। তার ব্যক্তিমানসে বুর্জোয়া চিন্তা-চেতনা কি নেই? আছে। আর আছে বলেই ৫ টাকার ভাড়া বাগে পেলে ১০ টাকা আদায় করে। কর্মের কর্তৃত্ব যদি তার হাতে আসে তাহলে শোষণ থেকে সমাজকে কি বাঁচাতে পারবেন? স্বার্থপরতা সহজাত, জন্ম থেকে মানুষ সেটা অর্জন করেছে। এই ব্যক্তির সংকীর্ণ স্বার্থকে নির্মূল করতে হলে তার জন্য আর এক স্বার্থের জোগান দিতে হবে। শুধু পরার্থপরতা ও জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের মূলে আঘাত হানা সম্ভব নয় কিছুতেই। একটা ব্যক্তি আবেগতাড়িত হয়ে দেশ, জাতি অথবা সামগ্রিক স্বার্থে জীবন দিতে পারে। কিন্তু সে লোক সামগ্রিক স্বার্থে লোক চক্ষুর আড়ালে কৃচ্ছ-সাধনায় নিমগ্ন হতে পারবে না। এ ব্যাপারে ইসলাম একটি বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখতে পেরেছে। ধরুন, একটি লোক নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তবু দুনিয়ার মানুষ তাকে দেখেছে অবজ্ঞার চোখে। স্বার্থবাদী জৌলুসের সামনে তার ত্যাগ-তিতিক্ষা ম্লান হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ বলছেন- 'আমি নিজ হাতে তার পুরস্কার দেব।' এই আশ্বাসই তার প্রেরণাকে উজ্জীবিত করে রাখতে পারে। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখুন। বিরাট হস্তীবাহিনী এবং লাখ লাখ সৈন্য নিয়ে আবরাহা বাহিনীর সৈনিকদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করার জন্য পরস্পরকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়েছিল, যাতে কেউ পালাতে না পারে। অপর পক্ষে ৩০ হাজার পদাতিক সৈন্য, যারা নিয়মিত সৈনিক নয়, যাদের রণ-সম্ভার, খাদ্য সম্ভারের প্রাচুর্যও ছিল না, তাদের শিবিরে কে আগে শহীদ হবে তার প্রতিযোগিতা চলছে।

এটা সম্ভব হয়েছিল ব্যক্তি মানসে বৈপ্লবিক চিন্তার সমাবেশ ঘটিয়ে। আর ও বিপ্লব এসেছিল তওহীদবাদ থেকে।

আমি আরও বললাম- 'আপনার প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির মোকাবিলায় আমি অতি তুচ্ছ। থিউরি আর থিসিসের পাঁকে ফেলে আমাকে পরাজিত করার যথেষ্ট যোগ্যতা আপনার আছে। আমার শ্রদ্ধেয় ভাই হিসেবে আপনার প্রতি অনুরোধ মানুষের কাছে ধার করার আগে আপনার বাক্স হাতিয়ে দেখুন যে কি পরিমাণ সম্পদ আপনার রয়েছে।'

ফরহাদ ভায়ের সাথে আমার আলোচনা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে হতো। তিনি কান পেতে আমার কথাগুলো শুনতেন। আমি আলবদরের দায়িত্বশীল ছিলাম জেনেও, তথাকথিত স্বাধীনতা বিরোধী এবং ৪০ বছর কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী জেনেও আমার প্রতি তার স্নেহ-মমতার কোন ঘাটতি দেখিনি। তার সাহচর্য আমার যেমন ভাল লাগত আমার সাহচর্য তিনিও তেমনি কামনা করতেন। তাকে আমি মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর তাফসীর দিয়েছি। তিনি পড়েছেন। দিয়েছি আরও অন্যান্য ইসলামী বই। তিনি ফিরিয়ে দেননি, পড়েছেন। তার মন-মানসিকতায় একটা ঝড় বইছে সেটা স্পষ্ট বুঝা যেত।

একদিন ফরহাদ ভাই দুপুর বেলায় আমার প্রিজন কেবিনে এলেন। হঠাৎ তার আগমনে বিস্মিত হলাম। তিনি নিজেই বললেন- 'আপনাকে একটা সুখবর দিতে এসেছি। খবরটা একটু আগে পেলাম। আপনার ভাবী জানিয়ে গেলেন আমার মুক্তির আয়োজন হয়ে গেছে, আজকেই সম্ভবতঃ কাগজ এসে পৌঁছে যাবে। এখন পর্যন্ত কাউকে এমনকি আমার সংগঠনেরও কাউকে আমি জানাইনি, খবরটা আপনাকেই প্রথম দিলাম।' বিকেলে আমাকে চা খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে চলে গেলেন। তার প্রিজনস কেবিনে।

আমার কারাগারের সঙ্গী ও সহযোগী সাবেক এনএসএস নেতা সৈয়দ নেসার নোমানী বাইরের মুক্ত আলো বাতাসের স্পর্শ পেয়েও আমার কথা ভুলেননি। আমার মুক্তির জন্য এই একটি মাত্র ব্যক্তি যার চোখে ঘুম ছিল না। এমপি থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সবার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে আমার জন্য আবেদন রেখেছেন। নোমানী ভাই প্রায়ই কারাগারে এসে আমার সাথে দেখা করতেন। আমার ব্যাপারে কতটুকু এগিয়েছেন জানিয়ে যেতেন। অগ্রগতি তেমন করতে না পারলেও তিনি আশাবাদী। তার প্রবল আত্মবিশ্বাস ছিল। তিনি প্রায় বলতেন- 'আমি আপনাকে মুক্ত করবই।'

সেদিন নোমানী ভাইকে আমি বললাম- 'মন্ত্রীদের সাথে আপনার বেশ যোগাযোগ রয়েছে। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।'

নোমানী ভাই বললেন- 'যে কোন কাজ, তা যদি আপনার হয়, সাধ্যে কুলোলে আমি অবশ্যই সেটা করব।'

বললাম- 'ডিআইজি, অব প্রিজন্স ভূইয়া সাহেবকে তো আপনি জানেন। আমাদের জন্য কিনা করেছেন। সম্ভব হলে তার জন্য আমাদের কিছু করা উচিত। বেচারা ভারী সংকটে আছেন। আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহের কর্মীরা কারাগারে তার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছে। কারাগারে এখন বস্ত্রের দারুণ সংকট। ডিআইজি সাহেব অনেক চেষ্টা করেও ম্যানেজ করতে পারছেন না। আপনি বস্ত্রমন্ত্রী আলীম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা করতে পারেন।'

নোমানী ভাই আমাকে বললেন- 'আমি তো সরাসরি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। তবে ডিআইজি সাহেবের সাথে মন্ত্রীর সরাসরি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেব।'

নোমানী ভাই তার কথা রেখেছিলেন। ডিআইজি সাহেবের সাথে আলীম সাহেবের সাক্ষাৎ হয় এবং সমস্যার আংশিক সমাধানও হয়েছিল। সাক্ষাতের পর ডিআইজি সাহেব আমাকে এসে বলেছিলেন- 'আলীম সাহেব আপনার কথা বলেছিলেন। কোন রকম নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন।' আলীম সাহেবের উক্তিগুলো পুনরাবৃত্তি করে বলেন- 'আমরা আমিনদের ভুলিনি। তাদের বের করে আনা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। মন্ত্রীত্ব আমরা পেয়েছি ঠিকই কিন্তু ক্ষমতা এখনও নাগালের বাইরে। এখনও অনেক কিছু আমরা করতে পারছি না। যাই হোক, একদিন আমরা আমিনদের কারাগার থেকে বের করে আনবই।'

পঁচাত্তরের আগস্ট বিপ্লবের পর প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক একাত্তরের দালাল আইন ও তৎসংশ্লিষ্ট আইনসমূহকে কালাকানুন বলে ঘোষণা দিলেও একটা বছর পেরিয়ে গেল অথচ তখনও সেসব আইনের আওতায় কারাগারে রয়েছে হাজার হাজার মানুষ। বাইরেও এ নিয়ে কোন আন্দোলন গড়ে উঠছে না। এ ব্যাপারটা সংগঠনকে জানিয়েছি বহুবার। ছবরের নসিহত ছাড়া অন্য কোন জবাব তাদের কাছ থেকে পাইনি। কারাগারে আমিসহ হাজার হাজার মানুষের দুঃসহ দুর্দশা বাইরের মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আঁচ করতে পারবে না। আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। আমরা

মরিয়া হয়ে উঠছি। নাড়া দিতে চেয়েছি মানবতাবাদী সংবেদনশীল মানুষগুলোর অন্তর। অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারা কর্তৃপক্ষকে পনের দিন আগে জানিয়ে দিয়েছি আমাদের দাবী, আমাদের সিদ্ধান্ত। আমাদের এ সিদ্ধান্তের কথা সংগঠনকেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সংগঠন এ ব্যাপারে তাদের কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল না।

নির্দিষ্ট দিন সমাগত। কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবীর জবাব না দিয়ে অনশন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন যথেষ্ট। কিন্তু আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অনড়। নির্দিষ্ট দিনে আমাদের পরিকল্পনা মত কালাকানুনের আওতাভুক্ত শত শত মানুষ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন শুরু করল।

আগের দিন রাত্রে লোক মারফত জামায়াতে ইসলামীর সদর দফতরে এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। অনশন শুরু হলেও তাদের কোন প্রতিক্রিয়া অথবা অন্য কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। একটি দিন গেল, দু'দিন গেল, তা সত্ত্বেও পত্র-পত্রিকায় কোন খবর প্রকাশিত হলো না। সমমনা রাজনৈতিক সংগঠন অথবা মানবাধিকার সংস্থাকে উচ্চকিত হতে দেখলাম না। বুঝলাম, আমাদের সংগঠন একটা কমপ্লেক্সে ভুগছে। তারা কারো সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেনি এমনকি পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমসমূহের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেয়নি। দুঃখ হল তাদের সংবেদনশীলতা ও সমমর্মিতার অভাব দেখে, তাদের অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্ষমার অযোগ্য মনে হলো। রাজনীতিকদের তথাকথিত অণশনের ভনিতা নয়, দুদিনের সত্যিকার অনশনে আমাদের সবাই নেতিয়ে পড়ল। নেতিয়ে পড়লাম আমি নিজেও। অনশন তবু চলছে। একে একে আমিসহ নেতিয়ে পড়া ধর্মঘটীদের নেয়া হলো হাসপাতালে। সেখানে স্যালাইন দিয়ে তাজা করার জন্য ডাক্তার তার প্রয়াস অব্যাহত রাখলেন। কারা কর্তৃপক্ষ আমার সাথে যোগাযোগ করে অনশন থেকে বিরত হওয়ার কথা বললেন। এবং ওয়াদা করলেন এ ব্যাপারে সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যার সুরাহা করার উদ্যোগ নিবেন। আরও একদিন পেরিয়ে গেল। বারবার কারা কর্তৃপক্ষের সমবেদনামূলক আবেদন ও ওয়াদার প্রেক্ষিতে তাদেরকে একমাস আরও সময় দিয়ে অনশন ভঙ্গ করলাম।

এরপর সংগঠনের প্রতি আমার বিরূপ ধারণা জন্মে। আমার ভয়ঙ্কর মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সংগঠনের প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে চিঠি লিখি। তাকে আমি এতকাল মনে করতাম- আত্মার আত্মীয়। আমাদের এই সংকটে তার এবং সংগঠনের স্থবির দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে মর্মাহত করে। আমার চিঠির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে

তিনি তার জবাব ও তার সাথে একটি ফতোয়া কারাগারে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। নিচে তার অনুলিপি উদ্ধৃত হলো।

২৭ সফর, ১৪০০ হিঃ

১৭ জানুয়ারী, ১৯৮০

স্নেহের আমিন,

ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কারাগার থেকে তোমার ১৯ মোহররম তারিখে লেখা চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি।

দীর্ঘদিন বদ্ধ আবহাওয়ায় জীবন কাটানোর যন্ত্রণা যে কত বেশী তা সহজে অনুমেয়। যুগে যুগে হকপন্থীরা বাতিলের হাতে এমনি করে নির্যাতিত হয়েছেন। বাতিল তার সকল শক্তি দিয়ে হককে স্তব্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছে। পরিশেষে বাতিল পরাভূত হয়েছে, হক বিজয়ী হয়েছে। তোমরা যে মহান দ্বীনের খাতিরে দীর্ঘদিন যাবৎ কারা ভোগ করছো তা বৃথা যাবে না ইনশাআল্লাহ।

তোমরা অনশন পালনের ব্যাপারে যে পরামর্শ চেয়েছ সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি- যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই এ বিষয়ে শরীয়তী ফায়সালা জানার প্রয়োজন বোধ করে আমাদের দ্বীনি সাথীদের কতিপয় হক্কানী আলেমের সাথে পরামর্শ করেছি। তাদের মতামত এই চিঠির সাথে সংযুক্ত হলো। আশা করি এটিকে দ্বীনি ফায়সালা মনে করে তোমরা সিদ্ধান্ত নেবে।

আইনগত পথে চেষ্টা এখনও যেহেতু শেষ হয়নি- তাই এখনি কোন চরমপন্থার কথা চিন্তা করা ঠিক হবে না। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে ছবর অবলম্বন করো। দেখা যাক আইনগত পন্থায় চেষ্টা করে কিছু করা যায় কিনা। আমি আশা করছি আল্লাহ অবশ্যই একটা ভাল ফায়সালা করবেন। আমার ব্যাপারে সরকারি মনোভাব পূর্ববৎ রয়েছে বলে তোমাদের জন্য জোড়ালো কোন বক্তব্য রাখা বা চেষ্টা করার পথে অসুবিধা যথেষ্ট। বিভিন্নভাবে যে চেষ্টা চলছে আশা করি তা ফলপ্রসূ হবে এবং আল্লাহ মুক্তভাবে তার দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ তোমাদের দেবেন।

তোমার সাথীদের নিকট আমার সালাম।

তোমাদের হিতাকাঙ্খী

গোলাম আযম

আল জওয়াব

“যে কোন বিপদ আপদ বা সংকটে পড়ে মৃত্যু কামনা করা কিংবা এমন কোন পথ ও পন্থা অবলম্বন করা, যার ফলে মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে তেমন কাজ করা শরীয়তে হারাম। তাই দালাল আইনে সাজা প্রাপ্তির প্রতিবাদে উর্ধ্বতন আদালতে আপীল করার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। এখন যদি আপীলের সুযোগ না থাকে তবে দালাল আইন বাতিল করার প্রেক্ষিতে উক্ত আইনে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের বিনাশর্তে মুক্তি দানের জন্য এবং উক্ত আইনের ভিত্তিতে দায়েরকৃত যাবতীয় মামলা বাতিল করার দাবীতে গণআন্দোলন করাই উত্তম পন্থা। এজন্য আমরণ অনশন শুরু করা জায়েয হবে না।”

কিন্তু প্রশ্ন হলো, অনশন শুরু করার পনের দিন আগে জানানো সত্ত্বেও সংগঠনের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনশন শুরু হবার আগে কেন আমার কাছে পৌঁছল না? কোথায় কিভাবে এটা ফাইলবন্দি হয়ে থাকল?

ক্ষমতাসীন হলে জাতীয় সমস্যাগুলো কি এমনিভাবে ফাইলবন্দি হয়ে বিলাপ করবে? জামায়াতের আনুষ্ঠানিকতা জামায়াতকে প্রগতির পথ থেকে সরিয়ে স্থবিরতার আবর্তে নিক্ষেপ করছে। একাত্তরের বিপর্যয়ের পরেও সংগঠনের এমন জড়তা বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে বিব্রত করছে। সংগঠনের হাত পা কোথায় যেন শিকল দিয়ে বাঁধা।

কোন ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া ভাল। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে একটা বাড়ীতে আগুন লেগেছে সেটা নেভানোর ব্যবস্থা না করে মজলিশে শূরার অপেক্ষা করতে হবে। কোনদিক থেকে কিভাবে আগুন এল? কারা আগুন লাগাল? এর অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য কি? এ আগুন নেভানোর ফজিলত কি? এসব নিয়ে গবেষণা করে সময়ের অপচয় করা একটা গতিশীল সংগঠনের জন্য কতখানি সঙ্গত আমার জানা নেই। অথচ জামায়াত বিধিবদ্ধ নিয়মে এমনটি করে থাকে। ওদিকে আগুনে জ্বলে পুড়ে সব শেষ।

সাত

আমার মধ্যে ছোট বেলা থেকেই বিরাজ করছিল অনুসন্ধিৎসা। আর এ কারণেই স্বাভাবিক নিয়মে আমার মধ্যে উত্তম পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে। আমি মনে করতাম স্কুল কলেজে ছকবাঁধা নিয়মের পাঠ থেকে মানুষ ডিগ্রীধারী হতে পারে ঠিকই কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারে না। নিয়মনীতির বাইরে থেকে বিশেষ পাঠাভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানের বিচিত্র ভাণ্ডার থেকে এবং জ্ঞানী মহাজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতার সমাহার বই পুস্তক থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। এ বিশ্বাসের প্রাধান্য আমার মধ্যে অত্যন্ত বেশী থাকার জন্য ডিগ্রী নেয়ার ব্যাপারে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। তবে বই পড়তাম প্রচুর। বই পড়ার ব্যাপারে আমার তেমন বাছ বিচার ছিল না। ইসলামের বিভিন্ন দিকের ওপর ভাল লেখকের কোন বই পেলে অবশ্যই সেটা পড়তাম। কারাগারের লাইব্রেরিতে সময় কাটাতে আমার ভাল লাগত।

কারাগার থেকে পরীক্ষা দেয়ার জন্য আমার তেমন ইচ্ছে ছিল না। জীবনের প্রয়োজনে ডিগ্রীর গুরুত্ব থাকলেও কোনদিন সেটা আমার কোন কাজে লাগবে বলে মনে করতাম না। চল্লিশ বছর কারাগারে কাটিয়ে মুক্তাঙ্গনে এসে ডিগ্রী আমার কোন প্রয়োজনে আসবে না সেটা আমি ভাল করেই জানতাম। এর চেয়ে ভাল নিত্য নতুন বই পুঁথির পাতায় পাতায় চোখ বুলিয়ে জ্ঞানের অদম্য পিপাসা নিবারণ করা।

ডিগ্রী পরীক্ষার ৬ মাস বাকী। পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য আমার চাচা খন্দকার এম ইসমাঈল, ভাই ডাক্তার এবি সিদ্দিক (পূর্ব রায়পুরা) এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা দারুণভাবে চাপ দিলেন। আমি এ ব্যাপারে উৎসাহী না হলেও তাদের চাপের মুখে রাজী হলাম। এ ব্যাপারে কারাসঙ্গীদের মধ্যে সবচাইতে বেশী সহযোগিতা দিয়েছেন হাফিজ ভাই (চাঁদপুর), শামসুল আলম, আনিসুজ্জামান (হাটু ভাঙ্গা)। বাইরে থেকে সবচাইতে বেশী সহযোগীতা দিয়েছেন আজিমপুরের মুহম্মদ ফারুক এবং মালেক ভাই। এই দু'জনই আমার অন্তহীন অন্ধকারে আলোর দুটো বিন্দু। এই দুটো বিন্দুর প্রত্যাশায় প্রতিটি মুহূর্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে কাটাতাম। এরাই ছিলেন বাইরের জগত এবং সংগঠনের

সাথে আমার সার্বক্ষণিক যোগাযোগের সূত্র। এরা বয়সে আমার ছোট হলেও আমার ওপর সদিচ্ছাই চাপিয়ে দিয়েছেন অনেক ঋণের বোঝা যা কোনদিন কোনভাবে আমি পরিশোধ করতে পারব না। আমার এবং আমার মত অনেকের ভাবনা মাথায় নিয়ে তারা দু'জন ডিগ্রী নিতে পারেননি। লেখাপড়ায় তাদের সফল অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। সুকান্তর ভাষায়, তারা যেন সেই বাতিওয়ালা, প্রতিদিন পথে পথে যে দীপ জ্বেলে ফেরে। অথচ তার ঘরে জমাট বেঁধে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।

যথাসময় পরীক্ষা দিলাম। আমার অনীহার কারণে প্রস্তুতি তেমন হয়নি। শুধু কিছু মানুষের কথা রাখার জন্য পরীক্ষা দিলাম। কারাগার থেকে আমরা প্রায় ৭০/৮০ জন পরীক্ষা দিলাম। যথানিয়মে পরীক্ষার রেজাল্টও বেরুল। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বমোট পাশ করল ৫ জন। সৌভাগ্যক্রমে এই পাঁচজনের একজন আমিও। যা চাইনি, সেটা সীমাহীন অবহেলার মধ্যেও আমার হাতের মুঠোয় এসে গেল। অথচ যেজন্য আমার সাধনা, আমার অব্যাহত সংগ্রাম, আমার অন্তহীন কোরবানী, সেটা আজও রয়ে গেল আমার নাগালের বাইরে। এসব দেখে নজরুলের সেই গানের কলি বার বার মনে পড়ে : 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।' সবই যেন তার ইচ্ছা। সংগ্রামে সাফল্য আর ব্যর্থতার মালিক আল্লাহ। আমাদের কাজ শুধুমাত্র তার নির্দেশের আনুগত্য করা।

একান্ত আপনজন আমার মা-এর ইন্তেকাল আমাকে দারুণভাবে আহত করে। যদিও জানি সবই আল্লাহর ইচ্ছা তবু অসহায়ত্বের অন্ধকার আমাকে গ্রাস করছিল। এতদিন মনে হত আমার সব আছে। আমার জন্য মা ভিটে-মাটি সহায়-সম্বল সবকিছু আগলে অপেক্ষা করছেন। আমার একাকীত্বের চাপ শরীরের ওপরও পড়তে থাকে। এ ছাড়াও একে একে কারাগারের সাথীরা বিদায়ের ফলে সবকিছু ভুলে থাকার বিকল্প পথগুলো রুদ্ধ হতে থাকে। ওদিকে কারাগারে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীরা সংঘবদ্ধ হয়ে আমার ওপর ও আমার কিছু সহযোগীর ওপর তাদের পুরানো মারমুখো ফ্যাসিস্ট কায়দার মহড়া আমাকে ভয়ঙ্কর বিব্রত করে তোলে। সব মিলিয়ে আমার ধৈর্যে ফাটল

ধরে, দুঃসাহস শিথিল হয়ে আসে; কারণ আমিও মানুষ। মানবিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে তো নই। একটা মানুষ একের পর এক কত ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করতে পারে? আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। প্রথমত কারাগারের ডাক্তার আমার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় আমাকে মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হয়। এখানে মেডিসিনের অধ্যাপক ওয়ালিউল্লাহর দায়িত্বে আমার চিকিৎসা শুরু হয়। হাসপাতালে ১২নং কেবিনে আমাকে রাখা হয়। ১২ জন পুলিশ আমার জন্য নিয়োজিত হয়। পালাক্রমে ৪ জন পুলিশের সার্বক্ষণিক প্রহরায় আমাকে কেবিনে অবস্থান করতে হতো। প্রথম দিকে পুলিশের আচরণকে ঘিরে সমালোচনার মত কিছু ঘটেনি। তারা সম্ভবত আমার কাছে থেকে উৎকোচের চলতি পরিভাষা বকশিস প্রত্যাশা করছিল। কয়েকদিন তারা নির্ভেজাল ব্যবহার দেখিয়ে যখন আমার কাছ থেকে সাড়া পায়নি। তখন তারা বিভিন্ন কলাকৌশলে আমার ওপর মানসিক চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। আমার হাতে হ্যান্ডকাফ পরানো হয়। আমার সাথে কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে পুলিশেরা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ নিয়ে তাদের সাথে উত্তপ্ত বচসা হয়। আমি বললাম- 'আপনারা জানেন আমি ক্লাসিফাইড প্রিজনার। আমার হাতে বেড়ী কোন মতে পরাতে পারেন না। এটা পরিয়ে রাখার সঙ্গত কোন কারণ নেই। অনর্থক মাঝখানে অসুবিধায় পড়বেন। তাছাড়া আপনাদের অফিসার আমাকে ভালভাবেই জানেন। উপর থেকে কোন নির্দেশ থাকলে তাও বলেন। আর যদি আপনাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত হয় তাহলে অফিসারদের পরামর্শ নিন।' আমার কথাগুলো তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল বলে মনে হলো না। পুলিশদের একজন ছিল নামটা ঠিক মনে নেই, সে লোকই তার অন্যান্য সহযোগী পুলিশদের প্ররোচিত করেছে। এখানে তার মধ্যে যে জিনিস কাজ করেছে তা হলো, তাদের সেই একাত্তরের উন্মাদনা। সেই আদিম আক্রোশ তাদের মধ্যে জমে থাকার কারণে আমার বক্তব্যগুলো তার মনে আছর করেনি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথম দিকে কে এম মঞ্জুর এলাহী এবং এ কে এম সফিউল্লাহ ভাই- পরে কারাগারে যারা লিয়াজোঁ রাখতেন সেই মোঃ ফারুক ও আব্দুল মালেক ভাই কেবিনে আমার অবস্থা দেখে যাবার পর বিভিন্ন মহলে

যোগাযোগ শুরু করেন। তখন মাস্টার শফিকুল্লাহ এমপি লক্ষ্মীপুর, মওলানা আবুদর রহীম সাহেব এমপি। তিনি মন্ত্রীপর্যায়ে বিশেষ করে আলীম সাহেব, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ও উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক সালাম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করেন। মোন'য়েম খানের জামাতা, বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল এমপি, নাজমুল হুদা এমপি (মোমেনশাহী) তৎপর হয়ে উঠেন তাৎক্ষণিকভাবে। তারা থানায় টেলিফোন করে জরুরীভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। তারা টেলিফোন করেন ডিআইজি সাহেবের কাছেও।

ইতোমধ্যে বস্ত্রমন্ত্রী আলীম সাহেব এবং উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক সালাম সাহেবের টেলিফোন এসে পড়ায় ডিআইজি সাহেব দারুণভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন। তাৎক্ষণিকভাবে ডেপুটি জেলার ও সার্জেন্টকে প্রেরণকরলেন ব্যাপারটা সুরাহা করার জন্য। তারা পুলিশদের আমার হাতের হ্যান্ডকাফ খুলে দেয়ার কথা বলেন। কিন্তু পুলিশেরা বেঁকে বসে। তারা বলে- 'আমরা আপনাদের নির্দেশে খুলে দিতে পারি। কিন্তু আসামী পলাতক হলে সে ব্যাপারে দায়দায়িত্ব আমাদের থাকবে না। এবং একথা লিখিতভাবে দিতে হবে।' ডেপুটি জেলার জহির সাহেব ফিরে গেলেন।

ওদিকে মেডিকেল কলেজের ছাত্র, ডাক্তার, নার্সরা দলে দলে এসে পুলিশদের সামনে তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে। পুরো হাসপাতালটার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

ডিআইজি সাহেব আর এক সার্জেন্টকে পাঠিয়ে উল্লেখিত পুলিশের রিলিজ অর্ডার তার হাতে দিয়ে অপর আর একজনকে তার কর্মস্থলে নিয়োগ করেন। সাথে উক্ত পুলিশকে ডিআইজির সামনে হাজির করা হয়। ডিআইজি এ ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু জেলার, সাব জেলারদের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ফরিদপুর বদলী করা হয়।

ইতিমধ্যে আমার হাতের বেড়ী খুলে দেয়া হয়। কিছুক্ষণ পর কোতোয়ালী থানার কর্মকর্তা এলেন, এই অনাহুত পরিস্থিতির জন্য ক্ষমা চাইলেন। বললেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে যদি আপনি আর বেশী নাড়াচাড়া করেন তাহলে ঐ পুলিশ

বেচারাদের চাকুরি রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আমি কি আশা করতে পারি না যে, আপনি তাদেরকে ঐ বেয়াদবীর জন্য ক্ষমা করে দিবেন?'

হেসে বললাম- 'আমি যা চেয়েছিলাম তাতো পেয়ে গেছি। এরপর কারো ওপর আমার কোন ক্ষোভ থাকার কথা নয়।'

পরবর্তীতে আদেল সাহেব স্বয়ং আমার কাছে এলেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর আমার আর কোন সমস্যা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন- 'কখনো কোন অসুবিধা হলে খবর দিবেন। আপনার তদবির চলছে, নিরাশ হবার কিছু নেই। হাসপাতাল কেবিনে থাকার সময় লক্ষ্মীপুরের এমপি মাস্টার শফিকুল্লাহ, হযরত মওলানা নূর মোহাম্মদ সিদ্দিকী, মওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী, ইসলামী ব্যাংকের ডাইরেক্টর জনাব, মুহাম্মদ ইউনুস ভাই, কামরুজ্জামান ভাই, ছাত্র নেতা ডাক্তার আবিদুর রহমান, ডাক্তার আলমগীর, ডাক্তার দীলবাহান, সাইমুমের পরিচালক মতিউর রহমান মল্লিক এবং ছাত্রনেতা ডাঃ ফাত্তাহ ভাইসহ অগণিত শুভাকাক্সক্ষী ও বন্ধু-বান্ধব এসেছিলেন।

মুসলিম লীগ নেতা কামরুজ্জামান খান (খসরু ভাই) এসে আমার সাথে বেশ কিছুক্ষণ কাটান এবং এ পর্যন্ত আমার জন্য যা কিছু করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন- 'আপনার মুক্তির জন্য যেভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে তৎপরতা চালানো হচ্ছে তাতে আশা করি আপনাকে খুব শীঘ্র মুক্ত করতে পারব। এতটা দিন যে ধৈর্য নিয়ে, যে হিম্মত নিয়ে কারাগারে অবস্থান করেছেন আমি আশা করব শেষ পর্যায়ে এসে আপনি হিম্মতহারা হবেন না।' হুমাইপুরের চেয়ারম্যান ফজলুল করিম খান ও তাঁর জামাতা এলেন আমার সাথে দেখা করে মুক্তির ব্যাপারে আশ্বস্ত করার জন্য।

আমার কাছে সবচাইতে আনন্দের বিষয় হলো- ইসলাম বিরোধী মোর্চার লক্ষ্যবস্তু আমার প্রিয় নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম এসেছিলেন আমার সাথে দেখা করার জন্য। আমার দীর্ঘ কারাবাস ও নির্যাতনের ইতিবৃত্ত তার জানা। তবু তিনি আমার মুখ থেকে অনেক কিছু জেনে নিলেন। ইতিহাস থেকে অনেক দৃষ্টান্ত টেনে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেবার এবং আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন।

আল কোরআনের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আমার হিম্মতকে আরও চাঙ্গা আরও উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করলেন। দীর্ঘ কারাবাস আর নির্যাতনে পরিশ্রান্ত এই মনটা আমার তাজা হয়ে উঠল। মনে হলো আমি আর একা নই। আমার পেছনে রয়েছে এক শক্তিমান মহাপুরুষ। আমি আমার নেতাকে আমার ইমামকে জানালাম- আমি কোন সময় আন্দোলনের প্রাণশক্তি থেকে দূরে থাকিনি। কোন অবস্থাতে কোন নৈরাশ্য আমাকে গ্রাস করতে পারেনি। এতকাল কারাগারগুলো ছিল বামপন্থীদের আখড়া এবং কমিউনিস্ট তৈরির কারখানা। হাজার হাজার কমিউনিস্ট তৈরি হয়েছে এই কারাগারে। আমার উদ্যোগে ইনশাআল্লাহ সে অবস্থা আর নেই। আমরা নিষ্ঠার সাথে কারাগারে সেই তৎপরতা চালিয়েছি। এর ফল হয়েছে আমাদের অনুক'লে। মুসলমানী জজবাত সম্পন্ন বহু বন্দী এখন ইসলামী আন্দোলনের সৈনিকে পরিণত হয়েছে। একাত্তরের বহু মুক্তিযোদ্ধা এখানে আমাদের সাথে, ইসলামী আন্দোলনের সাথে কাজ করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। আমাদের বহু নেতার কারাগারে পদচারণা বহুদিন থেকে অথচ কর্মের এত বড় ক্ষেত্রকে অবহেলা করেছেন অথবা এ ব্যাপারে কোন কিছু ভাবেননি। আমি আইজি অব প্রিজনস এবং ডিআইজি অব প্রিজনস সাহেবদের অনুমোদন সাপেক্ষে সমাজ কল্যাণ সংস্থার দায়িত্বশীল মুহাম্মদ ইউনুস ভাই-এর সহযোগিতায় কারাগারের লাইব্রেরিতে প্রচুর ইসলামী বই ও তাফহীমুল কুরআন এবং হাদীসের সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হই।

আলাপ আলোচনার মধ্যে মাগরিবের নামাজের সময় হলো। আমার কেবিনে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের ইমামতিতে নামাজ আদায় করলাম। গোলাম আযম সাহেব দোয়া করলেন আমাদের ইসলামী আন্দোলনের সিপাহীদের জন্য। চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের আবর্ত থেকে, জিল্লতি আর অবমাননার গ্রাস থেকে গোটা জাতির মুক্তির জন্য সর্বশক্তিমানের দরবারে রাখলেন বিনীত নিবেদন। কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের অন্যায় অনাচারজনিত কারণে সমগ্র জাতির উপর সম্ভাব্য কুদরতি আযাব থেকে তিনি পানাহ চান। তার প্রাণের গভীর থেকে উৎসারিত দোয়ার আবেদন থেকে আমার মনে হলো- তিনি যেন গোটা জাতির নেতৃত্বে সমাসীন। সমগ্র জাতির ভাল-মন্দ কল্যাণ-অকল্যাণের সাথে তিনি একাকার। প্রায় ২ ঘণ্টা হক, ইনসাফ আর শরাফতীর মূর্ত প্রতীক অধ্যাপক

গোলাম আযম সাহেব আমাকে সাহচর্য দিলেন। তিনি জানালেন বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব আসন্ন। মনে হলো ইরান থেকে উদ্ভুত ইসলামের বিশাল তরঙ্গ ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের কিনারে এসে আছড়ে পড়বে। আর এই তরঙ্গ- বিক্ষুব্ধ মহাকল্যাণের জোয়ারে আমরা ভাসব। এই নতুন জীবন প্রবাহ আর মুক্তির কালোচ্ছ্বাসে একাকার হবে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার ১০ কোটি মানুষ। আহ, সেই দিনটি কবে, কখন আমার ঠিকানা কারার কপাটে আঘাত করবে। বিদায় নিলেন মহাপুরুষ আর রেখে গেলেন রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

একদিন আমাদের আর এক নেতা ও তৎকালীন এমপি মওলানা আবদুর রহীম সাহেবকে হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করলাম। কথা শুরু হতে না হতেই আমাকে এলার্ম দিলেন, বললেন- "কথা শর্ট কর। আমার অনেক কাজ।" এতে আমার আবেগ আহত হল। বললাম- 'এ কারণেই আমি টেলিফোন করলাম, আমার জন্য আপনারা যে তদবির করেছেন তাতে আমার কাছ থেকে কোন কিছু জানার প্রয়োজন আছে কি না?' জবাবে তিনি কি বললেন, 'তা আমার মনে নেই।' তবে দুপুরে তার বাড়ীতে খাবার দাওয়াত দিলেন।

সেদিনের আহত অনুভূতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম- ইসলামী নেতৃত্ব জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ কোথায়? আমাকে কেন্দ্র করে এমপি থেকে মন্ত্রী, সাংবাদিক থেকে সম্পাদক, ছাত্র থেকে জনতার এই যে তৎপরতা, তা আমার প্রাণের গভীরে আনন্দের স্পন্দন জাগালেও এর ফল শুভ হয়নি। আমার সাময়িক বিজয় হয়েছে হয়তো বা কিন্তু যে চিকিৎসার জন্য আমি এই হাসপাতাল কেবিনে সেটা আর হল না। আমার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট বার বার টেলিফোনকে তারা বাড়তি ঝামেলা আর উলকো নিপীড়ন ভাবলেন। আশঙ্কা করলেন, তারা আবার কোন সংকটের বেড়াজালে আটকে পড়েন। অতএব রুগীকে বিদায় দেয়া উত্তম। আমাকে দশ বার দিনের মধ্যে রিলিজ করে দেয়া হলো। আমি আবার কারাগারে ফিরে এলাম। শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি হতে লাগল। আবার কারাগারের ডাক্তারদের শরণাপন্ন

হলাম। ডাক্তাররা কারাগারে আমার সুচিকিৎসার ব্যাপারে অপারগতা ব্যক্ত করলেন। তারা আমাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতাল কেবিনে থাকার যাবতীয় খরচ বহন করতে হয় রুগীকে। আমার যাবতীয় খরচ আমাদের সংগঠন বহন করতে থাকল। মেডিসিনের হেড, অধ্যাপক ডাঃ ইউসুফ আলী সাহেবের তত্ত্বাবধানে আমার চিকিৎসা শুরু হলো। এখানে যথানিয়মে পালাক্রমে ২ জন করে মোট ৬ জন পুলিশ আমাকে পাহারা দিয়ে রাখত। আগের মত এখানে আর পুলিশী নির্যাতন নেই কিন্তু ভিন্নধর্মী নির্যাতনের আয়োজন উদ্যোগ চলতে লাগল। নির্যাতনের তেলেসমাতি যা একাত্তরে শুরু হয়েছে তার যেন শেষ নেই। একাত্তরে আমাদের রাজনৈতিক দর্শনের পটভূমিতে ভুল শুদ্ধ যা কিছু করে থাকি না কেন সেই ফেলে আসা দিনগুলোকে ওরা আমাদের কিছুতেই ভুলতে দিবে না। ১০ বছরের ব্যবধানেও নতুন প্রত্যাশা নতুন চেতনার আলোকে নতুন মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে চলার উদ্যোগ নিলেও বিশেষ বিশেষ মহল একাত্তরের খুঁটিতে আমাদের পা- গুলো বেঁধে রাখতে চায়। 'লেকিন কম্বল নেহি ছোড়তা' আমরা যেন এমনএক অবস্থায় রয়েছি। বামপন্থী নেতা ও আওয়ামী লীগ নেতার টেলিফোন আসতে লাগল ডাঃ ইউসুফ আলীর কাছে। তাদের সবার একই প্রশ্ন- আলবদরের কমাণ্ডারকে হাসপাতালে পোষা হচ্ছে কেন? কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে যার ঠিকানা তাকে মেডিকেল কলেজের কেবিনে কেন এমন যতœ আত্তির মধ্যে রাখা হয়েছে, এটাই তাদের প্রশ্ন। বার বার বলা হচ্ছে- তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিন। প্রফেসর ইউসুফ সাহেব শুধুমাত্র বলেছেন- 'আমি ডাক্তার, আমিন সাহেব আমার রুগী। কে আলবদর, কে রাজাকার, কে মুক্তিফৌজ, কে সন্ত্রাসবাদী সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। সেটা দেখবে আদালত অথবা প্রশাসন। আমি দেখব রুগী। কোন হুমকি অথবা কোন প্রভাব আমার দায়িত্ব থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারবে না।'

আমার পাশের কেবিনগুলোতে ছিলেন কাদের সিদ্দিকীর বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী, ফণীভূষণ মজুমদার, শ্রমিক লীগের বজলুর রহমান (পাবনা), কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড ফরহাদ এবং মুসলিম লীগের এমপি ইব্রাহীম খলিল। এদের মধ্যে লতিফ সিদ্দিকী ও ফণীভূষণ মজুমদার বাইরের

ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আমার যেন হাসপাতালে ঠিকমত চিকিৎসা না হয় সেজন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ, হুমকি প্রদানের ব্যাপারে ঐ দু'জনের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। কিন্তু ফরহাদ ভাই ও শ্রমিক নেতা বজলুর রহমানের ভূমিকা ছিল নির্লিপ্ত। ডাঃ গোফরান, ডাঃ একে এম খোরশেদ আলম, ডাঃ শওকত, ডাঃ নজরুল, ডাঃ সরকার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও ডাঃ নূরুল ইসলাম সর্দার ডাঃ এনাম, ডাঃ দীল বাহার সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কোন মানসিক ভীতি আমাকে গ্রাস করতে পারেনি। কেননা হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার, নার্স, এমনকি মেডিকেল কলেজের ছাত্রনেতা ইদ্রিস আলী, ছাত্র নেতা ডাঃ এম আই ফারুকী, ডাঃ হাফিজ ভাই ও অন্যান্য ছাত্ররা বিশেষ সহানুভূতি নিয়ে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করতেন। এ কারণে বাইরের কোন হামলার ভয় আমি অতটা করতাম না।

তবে যেদিন জিয়াউর রহমানের মৃত্যু হয় সে দিনটা উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে। দু'জন মাত্র প্রহরী। প্রশাসনে শিথিল অবস্থা বিরাজ করছিল সর্বত্র। এ ছাড়া সংগঠনের তরফ থেকেও কেউ সেদিন যোগাযোগ রক্ষা করেনি। এতে একটু বিচলিত হয়ে উঠি। প্রতিপক্ষের কোন গ্র“প আমাকে আঘাত হানতে চাইলে সেদিনটি ছিল তাদের জন্য উত্তম সময়।

যা হোক, যুব মুসলিম লীগ নেতা ইব্রাহিম খলিল (এমপি) ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার্থে জুন '৮১-র প্রথমদিকে কোন একদিন হাসপাতাল কেবিনে ভর্তি হন। আমার প্রিজন কেবিন থেকে একটু দূরে লতিফ সিদ্দিকীর কেবেিনর দক্ষিণ পাশে ছিল তার কেবিন। তার সাথে পরিচিত হতে এবং তার অসুস্থতার খোজ খবর নিতে তার কাছে ছুটে গিয়েছি। তাছাড়া সমমনা হওয়ায় এবং অন্তরের টানে সাক্ষাৎ জরুরী মনে করেছিলাম। আমার পরিচয় বললে তিনি অতি আন্তরিকতার সাথে আমার সম্পর্কে জানার আগ্রহ দেখান। তার অসুস্থতা এবং রোগজনিত কষ্টের কথা চিন্তা করে আমার ইতিবিত্ত সংক্ষেপে তাকে জানালাম। সেই থেকে নিয়মিত তার কেবিনে যাওয়া আসা, কথা-বার্তা চলতে থাকে। এ সময় তার পরিবরের সদস্যবর্গ এবং ইব্রাহিম ভাইয়ের সহধর্মীনী মহিয়ষী ভাবীসহ মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে দেখা হতো এবং তাদের সাথে

আলাপ পরিচয় ঘটতো। ইতোমধ্যে ইব্রাহীম খলিল ভাইয়ের স্বাস্থ্যের অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকার লন্ডনে প্রেরণ করে। যাওয়ার সময় আমার প্রিজন কেবিনে সেই মহিয়ষী ভাবী বিদায় ও দোয়া নিতে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সেদিনের সে কান্নার দৃশ্য আজও আমার অন্তরে দেদীপ্যমান। একদিন পত্রিকায় দেখলাম ইব্রাহীম খলিল সাহেব আর বেঁচে নেই। লন্ডনের হাসপাতালে তিনি ২৫/ ২৬ জুন '৮১ তারিখ সম্ভাবত তিনি মারা যান। অঙ্কুরেই এক সম্ভাবনাময় নেতার জীবনাবসানে আমি দারুণভাবে মর্মাহত হয়েছিলাম।

তখনও আমি প্রিজন কেবিনেই রয়েছি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পাবো- এরকম একটি প্রত্যাশায় প্রহর গুণছি। অতঃপর সেই কাক্সিক্ষত মুক্তির পর সময় করে ইব্রাহিম ভাইয়ের পরিবারের সদস্যবর্গের সাথে দেখা করি। ভাবী ও সন্তানদের সালামত কামনা করে চলে আসি।

একে একে ৭টা মাস আমি হাসপাতালে কাটালাম। এ ক'টা মাস ডাঃ ইউসুফের স্নেহ আর মমত্ববোধের বেড়া যেন আমার চারিদিকে নিরাপত্তার বেষ্টনী সৃষ্টি করে রেখেছিল। মনে হয়েছিল এই হাসপাতালটা আমার জন্য সবচাইতে নিরাপদ আশ্রয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব আমাকে বলতেন- 'তোমাদের সংগঠনকে তৎপর হতে বলো। তাড়াতাড়ি তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করুক।' তিনি চাইতেন না আমি আবার কারাগারে অন্ধ প্রকোষ্ঠে ফিরে যাই। তিনি অন্যান্য সহযোগী ডাক্তারদের বলতেন- 'আমিনকে আমার এ জন্য ভাল লাগে যে তার মধ্যে রাখ ঢাকের কোন প্রয়াস নেই।'

অধ্যাপক ইউসুফ হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করে এসেছেন। হিন্দু মানসিকতা সম্বন্ধে আমাদের চেয়েও অনেক বেশী তিনি সচেতন। একাত্তরে আমাদের প্রতি হিন্দুস্তানের উচ্ছ্বসিত দরদের অন্তরালে কী গভীর ষড়যন্ত্র ছিল সেটা তার মত বিজ্ঞ লোকের অজ্ঞাত থাকার কথা নয়।

একাত্তরে আমাদের ভূমিকায় কি গভীর দেশপ্রেম, কি নিবিড় জাতীয় অনভূতি লুকিয়ে ছিল সেটা কিছুসংখ্যক ষড়যন্ত্রকারী পরিস্থিতির দুর্বল পর্যবেক্ষকদের মনে মনে দাগ কাটতে সক্ষম না হলেও সচেতন মানুষগুলো ঠিকই অনুভব করতো।

ডাক্তার ইউসুফ তেমনি সতর্ক মানুষ ছিলেন। এ কারণে আমার প্রতি তার দরদ ছিল অপরিসীম।

আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থাকা অবস্থায় জানতে পারলাম আমার মুক্তির দিন আসন্ন। কেননা প্রেসিডেন্ট সাত্তার ঈদ উপলক্ষে ৬ জন রাজবন্দীর মুক্তি ঘোষণা দেন তার মধ্যে রয়েছি আমিও। আমার সাথে আর যারা ছিলেন তারা সবাই মুক্ত হলেও আমি মুক্ত হতে পারলাম না। কেননা তখনও আমার আরো কিছু মামলা রয়ে গেছে ঝুলন্ত অবস্থায়।

শেষ দিকে এসে আমার দলীয় নেতৃবৃন্দের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। এতদিন কেবিনে থাকার ব্যাপারে সংগঠন উদারভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে এসেছে। মুক্তির কিছুদিন আগে দলের সমাজকল্যাণ বিভাগের দায়িত্বশীল, ইসলামী ব্যাংকের ডাইরেক্টর মুহাম্মদ ইউনুস ভাই আমাকে খবর পাঠালেন যে অতি সত্বর মুক্তির ব্যাপারে আমি কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে সংগঠনের বিশেষ কিছু করার থাকবে না অর্থাৎ আমাকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে ফিরে যেতে হবে। দুঃখ পেলাম এই ভেবে যে, সংগঠন এখনও সংকীর্ণতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

এতদিনে আমার ভুলটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ইরানের বিপ্লবের ব্যাপারে আমার যে উপলব্ধি সেটা আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসা দলীয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দের কাছে অকপটে বলতাম। ইরানের বিপ্লবের সপক্ষে আমার বক্তব্যগুলো বুমেরাং হয়ে ফিরে আসল আমার দিকে। সংগঠনের সহানুভূতি ও মদদ দুটোই আমি হারাতে বসলাম। এতে আমি মর্মাহত হইনি মোটেও কেননা ৪০ বছর কারাবাসের মানসিক প্রস্তুতি আমার এর আগেই নেয়া ছিল। তাদের এই সংকীর্ণতা আর হীনমন্যতা দেখে মহান আল্লাহ সম্ভবতঃ আড়াল থেকে হেসেছিলেন। তা না হলে প্রেসিডেন্ট সাত্তারকে দিয়ে আমার মালিক আমার মুক্তির জন্য শেষ ঘুঁটি চালালেন কেন? যাই হোক, আমার ঝুলন্ত মামলাগুলোর ব্যাপারে হাসপাতালের কেবিন থেকে আমি নিজেই তদবির করলাম। অবশেষে একাশির ২৬ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেলাম।

মুক্তি পাবার দিন হাসপাতালের ডাঃ গোফরান, ডাঃ একে এম খোরশেদ আলম, ডাঃ এনাম, ডাঃ শওকত, ডাঃ নজরুল ইসলামসহ কয়েকজন মহিলা ডাক্তার আরও অন্যান্য ডাক্তাররা আমার একটা বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সেই সভায় জামায়াত নেতা কামরুজ্জামান সাহেব, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি আবু তাহের ভাই উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রনেতা ডাঃ মোঃ ইদ্রিস আলী, মেডিকেল কলেজের জিএস জনাব সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, ডাঃ হাফিজুর রহমান, ডাঃ দীল বাহার ও অন্যান্য ছাত্ররা মিলে আমাকে একটা পারকার কলম উপহার দেন।

এখন আমার বিদায়ের পালা। মুক্ত পৃথিবীর অবারিত আলোর মধ্যেও আমি অন্ধকার দেখছি। কোথায় যাবো? আমার লক্ষ্য স্থির করতে পারছিলাম না। অধীর আগ্রহে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা করছিলাম। পরবর্তীতে মনে হলো, এ প্রত্যাশা ভুল। কেননা আমি কোন বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী নই যে আমার নেতা মানসিকভাবে চাঙা করার জন্য তার কর্মীর নিকট ছুটে আসবে। আমাদের সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আব্বাসীয় আভিজাত্যের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে একটা গাড়ী এলো, কিন্তু সেটা সংগঠনের নয়। উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক আবদুস সালাম পাঠিয়েছেন। দুঃখ-সুখের মিশ্র অনুভূতি আমাকে গ্রাস করলো। দুঃখ যে সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আমার উদ্দাম যৌবনের সোনালী দিনগুলোতে নিরলস পরিশ্রম করেছি, যাদের নির্দেশে বন্দুকের নলের মুখে দাঁড়িয়েছি, যাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১০ বছর কাটালাম কারাগারে, আমার মুক্তির দিনটিতে তাদের প্রত্যাশা করেও পাইনি। আর সুখ- যাদের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই, যার সাথে কারাগারে ক্ষণিকের আলাপ-পরিচয়, সেই তৎকালীন উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক সালাম সাহেব আমার জন্য গাড়ী পাঠিয়েছেন। কি বিচিত্র মনে হয়েছিল সেদিন। ভাই মুহাম্মদ ফারুক সহ সালাম সাহেবের বাসায় গেলাম। তার নিজস্ব লোকজন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক সভায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি। তবু উঠে এলেন, এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। কি আনন্দ লেগেছিল সেদিন। তার অভ্যর্থনা আর আপ্যায়ন আমাকে লজ্জা দিয়েছিল। হয়তো পরিবেশগত সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে আমি তার জন্য অতটুকু করতে পারতাম না। হিতাকাক্সক্ষী হিসেবে তিনি আমাকে

গাইড লাইন দিলেন। গ্রামের বাড়ীতে না যাওয়ার, কিছুদিন রাজনীতি থেকে বিরত থাকার এবং ঢাকায় অবস্থান করার উপদেশ দিলেন। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম আমি আজিমপুরে শিবির নেতা মুহাম্মদ এনামুল হক ভাই-এর মেসে। আমার সাথে ছিলেন ফারুক ও মালেক ভাই। এখানে আমি মাস খানেক অবস্থান করলাম। এনাম ভাই সেখান থেকে চলে যাওয়াতে একটুখানি সমস্যার মুখোমুখি হতে হলো। কিন্তু আমার মালিক আমার জন্য আরো সুন্দর ব্যবস্থা করে দিলেন।

প্রফেসর ডাক্তার ইউসুফের সহযোগী ডাক্তার এ কে এম খোরশেদ আলম ভাই বর্তমানে তিনি পিজির সনামধন্য প্রফেসর হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। তার কোয়ার্টার ফ্রি করেদিলেন আমার জন্য। এখানে থাকা অবস্থায় অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের অনুগ্রহে বিআইসিতে আমাকে একটা চাকুরী দেয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক নাজির আহম্মদ সাহেব। এখানে খুব বেশী দিন এ্যাডজাস্ট করে থাকতে পারলাম না। জেলে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন মত ও পথের বিভিন্ন নেতার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাদের অনেকেই আমার কাছে টেলিফোন করতেন। যা কর্তৃপক্ষ পছন্দ করতেন না। আমার অবর্তমানে টেলিফোনকারীরা সাধারণ সদ্ব্যবহারটুকুও পেতেন না। প্রায় সবাই আমাকে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন। কর্তৃপক্ষের আচার আচরণ থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে এখানে আমি একজন চাকুরীজীবী ছাড়া কিছুই নই। এখানে আমার সাংগঠনিক দাবীও কিছু নেই। এ অবস্থায় বেশি দিন থাকা সংগত মনে করলাম না। আল্লাহর পৃথিবী অনেক বড়। আমি স্বাধীনভাবে রুটি রুজীর অন্বেষণ করা অধিকতর উত্তম মনে করলাম। সামান্য পয়সার বিনিময়ে কতিপয় দাম্ভিক মানুষের কাছে আমার স্বাধীন সত্তা ও সংযত বিবেক বন্ধক রাখা কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না। আমি আর এক কারাগার থেকে উন্মুক্ত দিগন্তে ডানা মেললাম। এতে আমার কষ্ট হয়েছে, তাতেও সুখ। পিঞ্জিরায় আবদ্ধ তোতা পাখীর মত ছক-বাঁধা মুখস্থ বুলি আবৃত্তি করে কাটানোর সুখকে আমি ঘৃণা করি। আমি চাই উদ্দাম ঝড়ো হাওয়ায় দুরন্ত ডানা মেলতে। অন্তরের আবেগ উজার করে মুক্তির গান গাইতে।

আল্লাহর বিরাট পৃথিবীর আমি একজন। আর এ সমগ্র পৃথিবীটা যেন আমার। হক আর ইনসাফের দীপশিখা নিয়ে এগিয়ে চলার দুঃসাহস যার বুকে পুঞ্জীভূত সেতো বিধি-নিষেধ আর জ্যাঠামীর বেড়াজালে নিজেকে আটকে রাখতে পারে না। আমিও পারিনি।

কারামুক্তির পর বাইরের উন্মুক্ত আলো-বাতাসে এসে জীবন ও জীবিকার দিকটা যখন চিন্তা করতাম তখন আমার সামনে একরাশ নৈরাশ্য ছাড়া কিছুই দেখতাম না। জীবন থেকে আমার দশ বছর খসে গেছে। প্রগতি থেকে আমি দশ বছর পিছিয়ে গেছি। বিবর্তিত রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থানেও আমি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। যেন আমি ভিন্ন গ্রহ থেকে এসে পা রেখেছি এই গতিশীল পৃথিবীতে। জীবনের আঁকাবাঁকা পথগুলো আমার সব অচেনা। এমন সংকটের দিনগুলোতে যে লোকটি আমার হাত ধরে এই অচেনা পথে একপা একপা করে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি হলেন- সাবেক গভর্নর আবদুল মোনেয়েম খান সাহেবের পুত্র খসরু ভাই। বরাবরই তিনি আমাকে স্বাধীন জীবন ও জীবিকার কথা বলতেন। খসরু ভাই তার দরাজ দীল নিয়ে আমার পাশে আসেন। তিনি বলেন- 'আপনি তো আমার ভাই। আমি আপনার পাশে রয়েছি।'

সংকট উত্তরণে আমার একক প্রচেষ্টার পাশাপাশি অন্যান্যদের সাথে তিনি নিজে চেষ্টা তদবীর সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ার ব্যাপারে বলতেন আরোও বলতেন- 'আপনার যে কোন প্রয়োজনে আমি রয়েছি।' এমন কি তার পরিবারের সদস্য হয়ে তার গৃহে অবস্থান করার জন্যও আমাকে বলেন।

আমি কারাগারে অন্তরীণ থাকাকালে খসরু ভাই, এডভোকেট হুমায়ুন ভাই এমপি (সাবেক) তার পরিবারের সকলের নেপথ্য আন্তরিকতা আমাকে বেষ্টন করেছিল। কত যুগ আগে তার পরিবারের সাথে আমাদের আত্মিক যুগ হয়েছিল তা বলা মশকিল তবে সেই সূত্র ধরে ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানে থেকেও খসরু ভাই আত্মীয় না হলেও আমার মন-মানসিকতায় অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে আছেন।

আমার স্বাধীন জীবন যাপনের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছেন ইশ্বরদীর মজিদ ভাই, যার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া নাসের ভাইয়ের সহযোগিতা কম পেয়েছি এমনটি বলা যাবে না। ইকবাল খান, ইঞ্জিনিয়ার জমশেদ (বর্তমানে রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থানরত), ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার দিদারুল ইসলাম, সোলাইমান, আনোয়ার, কামাল, এডভোকেট আমিনুল ইসলাম, এডভোকেট তারিকুল ইসলাম (মোহন), বিশেষজ্ঞ ডাঃ আফসার সিদ্দিকী, বিশেষজ্ঞ ডাঃ আব্দুল্লাহ ভাইয়ের সহযোগিতাও আমাকে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছে। এদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আমি ঋণী। জীবনভর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি তাদের সেই ঋণ পরিশোধ করতে থাকবো।

আট

আটাত্তরের শুরু থেকে ইরানে কিছু কিছু আলোর ঝিলিক পরিলক্ষিত হচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট কার্টারের তেহরান সফরের পর শাহের ইঙ্গিতে ইরানের পত্র-পত্রিকায় ইমাম খোমেনীর ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর কলঙ্ক আরোপ করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এটা করা হয় খোমেনীর ওপর জনগণকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য। কিন্তু এটাই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে ইরানের শাহের দরবারে। ঝড় উঠে, সে ঝড় কোম থেকে তেহরান, তেহরান থেকে মাশাদ, মাশাদ থেকে শিরাজ এভাবে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। একটা বিরাট ঝাঁকুনির প্রয়োজন ছিল ইরানে। ভাবলাম সে সময় সম্ভবত সমাগত।

ষাটের দশকে পাকিস্তানের সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোর সূত্রে ইরানের যেসব প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল, তাতে আমরা দেখেছিলাম ইরানী শাহানশাহীর দু'হাজার বছরের ইতিবৃত্ত। এতে জাহেলী যুগকেও ইরানের গৌরবোজ্জ্বল দিন বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেইসব চিত্র দেখেই আমরা বুঝেছিলাম ইরানের রাজতন্ত্রের পতনের দিন আসন্ন। শাহের খোশ খেয়াল ও জাহেলী চিন্তা চেতনা সূক্ষ্মভাবে জনজীবনে প্রবিষ্ট করানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। আমেরিকার নীলনক্সা অনুযায়ী তথাকথিত শ্বেত বিপ্লবের মাধ্যমে গণচেতনার বিভ্রান্তির ধুম্রজাল বিস্তার করা হচ্ছিল ব্যাপকভাবে। ওদিকে ইরানের গণমনে যে তুষের আগুনের মত এক বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা ধিকিধিকি জ্বলছে তেমন কিছু আমরা জানতাম না। কেননা বিশ্বের সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলো এ সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রকাশ করতো না।

আটাত্তরের শুরু থেকে বিশ্বের প্রচার মাধ্যমগুলোতে এবং আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকাগুলোতে ইরানের বিপ্লব সংক্রান্ত খবর স্থান পেতে থাকে। অক্টোবর থেকে আন্দোলন আরও ব্যাপক আরও বিস্তৃত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভ আর বিক্ষোভ, মিছিলের পর মিছিল, ধর্মঘটের পর ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে তখন। সারা ইরানে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। শাহের চোখে ঘুম নেই। তবুও শাহ নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ছেন না। কেননা তাকে মদদ দেয়ার জন্য রয়েছে ২ লক্ষ দুর্ধর্ষ সৈনিক, তার নিজস্ব তৈরি সাভাক বাহিনী, সিআইএ'র উর্বর মস্তিষ্ক

আর রয়েছে আমেরিকা, ইসরাইল এবং মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন দোসররা। এরপরেও স্ট্রাটেজিক্যালি রাশিয়ার সহানুভূতিও তার পাওয়ার কথা। কেননা রাশিয়ার আওতাধীন এশিয়ার ৬টি মুসলিম রাষ্ট্রের পাশে ইসলামী চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন মৌলবাদী শক্তির বিকাশ হলে রাশিয়ার মুসলমানদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না, সোভিয়েত ইউনিয়ন এটা জানে ভাল করেই। এ কারণে রাশিয়া তার নিজস্ব যন্ত্রণায় ইরানের শাহকে ইরানী জনগণের ওপর বিজয়ী দেখতে চাইবে।

বলতে গেলে ইরানী জনগণ শুধুমাত্র শাহের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তা নয়। দুনিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে ছিল ইরানী জনতার লড়াই। কোনক্রমেই পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় সামরিক আইন জারি করা হলো। তবু বিক্ষোভ ও ধর্মঘট অবিরাম চলছে। প্যারিস থেকে আয়াতুল্লাহ খোমেনী সামরিক সরকারকে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানালেন। জনতা আরও মরিয়া হয়ে উঠল। শিরাজে সেনাবাহিনীর সাথে জনগণের সংঘর্ষ হলো। শত শত লাশ নিয়ে মিছিল এগিয়ে চলল। মহররম সমাগত। সামরিক আইন মহররমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। শাহ জনগণকে শান্ত করার জন্য প্রশাসনের কিছু রদবদল করলেন। কিছু দায়িত্বশীল অফিসারকে গ্রেফতার করলেন। এতেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না জনতার মিছিলে। তেলক্ষেত্র অকেজো হয়ে পড়ল। দুই লক্ষ ব্যবসায়ী তাদের দোকান-পাট বন্ধ করে দিল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হল অফিস আদালত। সামরিক প্রধানমন্ত্রী গোলাম রেজা পদত্যাগ করলেন। শাপুর বকতিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন। খোমেনী ঘোষণা দিলেন, কোনসরকারই গ্রহণযোগ্য হবে না। জনগণের লক্ষ্য শাহ। যুগ যুগ ধরে ইরানের জনগণের ওপর যে অত্যাচারের স্টীমরোলার চালান হয়েছে তার জবাবদিহি করতে হবে জনগণের আদালতে। শাহ দেশত্যাগ করলেন। শাপুর বখতিয়ার সর্বশক্তি নিয়োগ করেও জনতার ঢল রুখতে পারলেন না। সেনাবাহিনীর সদস্যরা জনতার কাতারে নেমে এল। অবশেষে গুলীগোলা ও আধুনিক মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে শহীদের রক্ত বিজয়ী হলো।

আমি জেল থেকে ইরানের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করতাম। আর অনুভব করতাম অপূর্ব শিহরণ। মনে হতো আমি ইরানের পথে পথে বিপ্লবী জনতার কাতারে দাঁড়িয়ে ইসলামের সবচাইতে বড় কলঙ্ক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।

ইরান আধুনিক বিশ্বে নতুন করে প্রমাণ করল, ইসলামের অর্থ আপোষহীন সংগ্রাম। প্রমাণ করল, ইসলাম একক অভিযাত্রায় দুর্লঙ্ঘ্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর এক দুর্নিবার শপথ। এ ব্যাপারে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর একটা প্রসঙ্গ টানা যায়। তখন ইরানের শাহের গুলীতে প্রত্যেক দিন শত শত লোক শহীদ হচ্ছেন। ঐ সময় কিছু ুইরানী নেতৃবৃন্দ ইমাম খোমেনীকে প্রশ্ন করেন- 'আপনি কি মনে করেন না জাতির এত যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, যে কোরবানী দিচ্ছে জনগণ, এর একটা ভয়াবহ ঝুঁকি আছে? এর ফলে লোকেরা হতাশ হয়ে পড়বে? পর্যায়ক্রমে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবে? এর চেয়ে বরং এই উত্তপ্ত অবস্থায় আন্দোলনকে থামিয়ে বর্তমান শাসক গোষ্ঠীকে রেখে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থাপনায় কিছু সংস্কার করে নেয়া ভাল?' তারা বুঝিয়েছিলেন ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই উত্তম।

আয়াতুল্লাহ খোমেনী স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন- 'আল্লাহ আমাদের যা করতে বলেছেন আমরা সে অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে যাব। এর বিনিময়ে তিনি আমাদের সাফল্য আমাদের জীবদ্দশায় দিবেন, কি পরবর্তীতে কোন ভবিষ্যতে দিবেন, তা তাঁর ইচ্ছাধীন।' ইমাম খোমেনী কোন শক্তির ওপর নয়, এমন কি জনগণের শক্তির ওপরও নির্ভর করেননি। তিনি নিষ্ঠার সাথে খোদা নির্দেশিত পথে জাতির জন্য কাজ করেছেন আর নির্ভর করেছেন আল্লাহর ওপর।

১৪শ' বছর ধরে রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ও স্বৈরতন্ত্র যেভাবে ইসলামের প্রগতিশীল শক্তির ওপর আঘাত হেনেছে, যেভাবে মুসলমানদের মন-মগজ স্থবির করে দিয়েছে, যেভাবে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মর্চে ধরানো হয়েছে; তাতে সংস্কারের মধ্যদিয়ে ইসলামের নিজস্ব জেল্লা ফিরিয়ে আনা

সম্ভব নয়। ইসলামের বাসগৃহের অবস্থা হয়েছে এমন যা চৌদ্দ'শ বছর ধরে বিভিন্ন দিকে ফাটল ধরেছে, দেয়ালে ফাটল ধরেছে, ইট কাঠ খসে গেছে, ভিত হয়েছে দুর্বল। এর সংস্কার করে একে দুর্গ বানানো তো দূরের কথা এখানে নিরাপদে কোন মতে বাস করাও সম্ভব নয়। অতএব একে ভেঙে চূর্ণ করতে হবে। এর ভিত্তি উপড়ে ফেলতে হবে। আর এটা সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা কোন মতে সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন বিপ্লব, চূড়ান্ত বিপ্লব। সংস্কার আন্দোলন করে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমিন মার খেয়েছে। শক্তিশালী সংগঠন হয়েও জামায়াতে ইসলামী এগুতে পারছে না। জামাতের বিপ্লবী কর্মীরা এখন আয়েশের সন্ধানে ব্যস্ত।

জেল থেকে ইরানী বিপ্লবকে জানার বোঝার চেষ্টা করি। ক্রমশঃ আমি তাদের আপোষহীন প্রক্রিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি। ইরানের সেই মহান বিপ্লবী নেতা ১৪শ' বছর পর মুসলমানদের যিনি চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে গেছেন তার চেহারা মোবারক দেখার ইচ্ছা তীব্রতর হয়ে ওঠে। ইরানের সংগ্রামী জনতা ও তাদের বিপ্লবোত্তর কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি।

আশির মাঝামাঝিতে নব্বই শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য কাজী আজিজুল হক ভাই কারাগারে অন্তরীণ হলেন। এতে আর যাই হোক আমার যেন মনে হয়েছে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের প্রকৃত তথ্য আমাকে জানানোর জন্য সম্ভবত তিনি খোদার তরফ থেকে উপস্থিত হয়েছেন।

তার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারলাম, ইসলামী বিপ্লব ইরানে কিভাবে সংঘটিত হলো? ইরান বর্তমানে কোন অবস্থায় রয়েছে, পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসরকে কিভাবে ইরান থেকে উৎখাত করা হয়েছে? আমেরিকা ও আরবের শিখণ্ডী সরকারসমূহ ইরাকের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে ইসলামী ইরানের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ পরিচালিনা করছে? কিভাবে একের পর এক শহরগুলোকে ধ্বংস করা হচ্ছে? ইরান এককভাবে সম্মিলিত শক্তির মোকাবেলা করছে কিভাবে? একে একে আজিজ ভাই আমার সামনে সবকিছু তুলে ধরেন। আমেরিকা ও আরবের প্ররোচনায় ইসলামের প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড

দুনিয়ার তাবৎ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে নিগৃহীত হচ্ছে। ইসলামী ইরানের সপক্ষে ভ্রাতৃত্ববোধ সঞ্জাত জনগণের আওয়াজ আমাদের সরকারও যেন সহ্য করতে পারছে না। আর পারছে না বলেই আজিজ ভাই কারা অন্তরালে। তার কারামুক্তির পরও তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করেছেন। ইরানের যাবতীয় বই আমাকে সরবরাহ করেছেন। তার সাথে খন্দকার রাশেদুল হক, মাহফুজ ভাইসহ কয়েকজন সরকারী অফিসারও আসতেন, যারা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রগতিশীল প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।

আমি কারাগার থেকে বেরিয়ে এলে আজিজ ভাই এক মহান ভ্রাতৃত্ববোধের তাগাদায় আমার কাছে প্রায় আসতেন। আমিও তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। আমার অধিকাংশ সময় কাটত জামায়াতের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সাহচর্যে। সেই পুরান ছকবাঁধা নিয়মে সাংগঠনিক কাজ। সেই গতানুগতিক কর্মপন্থা, যা আমার প্রগতিশীল চিন্তা চেতনাকে আহত করতো। আমি এখান থেকে মুক্তির পথ খুঁজতাম।

কিছুসংখ্যক বিবেক বর্জিত অসৎ আনাড়ীদের হাতে রাজনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত সৎ ও বিবেকবান লোকদের যে হেনস্তা এটি আমাকে বরাবর বিড়ম্বিত করেছে। অথচ একাত্তরের রাজনৈতিক পরাজয়ের তিলক পরে আমাদের সংগঠন আজও পুরান পাঁকে আবর্তিত হচ্ছে। সেই গতানুগতিক গণতান্ত্রিক শ্লোগান। কিন্তু দেশের কোটি কোটি মানুষ নতুন বোতল, পুরানো মদ সবকিছু ভেঙে চূরমার করতে চায়। কোন পথ না পেয়ে সবার সাথে আমিও সংগঠনের পুরানো পথ ধরে এগুতে থাকি। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকে তেহরানের রাজপথে, দেজফুল, কাসরে সিরিন আর খুররম শহর রণাঙ্গনে। ইরানের বিপ্লবী কর্মসূচী ও আপোষহীন সংগ্রামের সাথে পদ্মা-মেঘনা বিধৌত বাংলার শ্যামল প্রান্তরের জিন্দাহদীল অগণিত মানুষের মত আমিও কখন আমার অজান্তে একাত্ম হয়ে গেছি।

একদিন মাগরিবের নামাজ সবেমাত্র শেষ করেছি এমন সময় আত্মপ্রত্যয়ে সমুন্নত দুটো মানুষ আমার ডেরায় এসে ঢুকলেন। একজন আমার অতি পরিচিত। অন্যজনের সাথে আমার এখনও পরিচয় হয়নি। অপরিচিত আগন্তুকের

সাথে আজিজ ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি একজন ইরানী ছাত্রনেতা, দিল্লীতে লেখাপড়া করতেন। বিপ্লবের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ও অপরিসীম মমত্ববোধ আমার ভালো লাগলো। তিনি বলেন- 'যে রঙীন স্বপ্ন বুকে নিয়ে আপনার তারুণ্যকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন, যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য রক্তাক্ত পথ ধরে হেঁটেছেন, ১০ বছর কারাবাসে কাটিয়েছেন, আমরা অজস্র খুন আর আগুনের তুফানের মধ্যদিয়ে সেই মঞ্জিলে পৌঁছেছি। এই মঞ্জিল আপনার আমার এবং দুনিয়ার সমস্ত বিপ্লবীদের। ইসলামী ইরানের পক্ষ থেকে আমি দাওয়াত নিয়ে এসেছি।'

ইরানের এই দাওয়াত যেন পরম পাওয়া বলে মনে হলো। আমি সাথে সাথে দাওয়াত গ্রহণ করলাম। মনে হল, 'এ মেরে খাব কি তাবির এ মেরে জানী গজল।' ইরান যেন আমার স্বপ্নের মঞ্জিল আমার হৃদয়ের সংগীত।

তার সাথে প্রোগ্রাম হল- প্রথমত আমাদের যেতে হবে বোম্বে। বোম্বের ইরানী কালচারাল সেন্টারে একদিন অবস্থান করতে হবে। তার পর ইরানী এয়ার লাইন্সের বিমান আমাদের নিয়ে যাবে তেহরান।

নির্দিষ্ট দিন সমাগত। বিরাশির ৬ আগস্ট তারিখে আমি, পিজি হাসপাতালের ডাক্তার আলমগীর সাহেব ও রাশিয়ায় উচ্চ শিক্ষারত ছাত্রশিবির নেতা আজাদ সাহেব তেহরানের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। বাংলাদেশ বিমান আমাদের বোম্বে পর্যন্ত পৌঁছে দিল। এখানে ইরানের কালচারাল সেন্টারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বিপ্লবী তরুণরা ইতোমধ্যে এসে গেছেন। আমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হলাম। এখানে আমার সাথে অনেকে বক্তব্য রাখলেন। পরদিন সকালে আমরা তেহরানের উদ্দেশ্যে ইরানী বিমান 'হুমা'য় চাপলাম। ইরানে পৌঁছালে আমাদেরকে নিয়ে আসা হল তেহরানের সুসজ্জিত হোটেল পার্কে। এখানে এই হোটেলকে কেন্দ্র করে আমরা সমগ্র ইরানে আবর্তিত হয়েছি।

একদিন দুপুরে পবিত্র কোমের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। এই কোম নগরী তেহরান থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে শিরাজ ও খুজিস্তানগামী একটি মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। এখানে ইমাম মুসা কাজেমের কন্যা ও ইমাম

রেজার বোন হযরত মাসুমার মাজার রয়েছে। এখানে শহীদ আয়াতুল্লাহ মাদানী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মোতাহারী ও হুজ্জাতুল ইসলাম মোন্তাজারিরও কবর রয়েছে। এ শহরটি ইরানবাসীদের জন্য দ্বিতীয় পবিত্র নগরী। ১৮শ' বছরের পুরান এই শহরটি ইসলামী তালিম-তরবিয়তের প্রাণকেন্দ্র। ইরানে ইসলামী আন্দোলনের বড় বড় ঢেউ এখান থেকে উত্থিত হয়েছে। দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনের মহান সৈনিকদের দৃষ্টি এই কোম শহরে নিবদ্ধ। এই কোম শহরে আয়াতুল্লাহদের বাণীএক একটি ঝড়ের রূপ পরিগ্রহ করে এশিয়ার লৌহমানব ইরানের শাহ পাহলবীর রাজ প্রাসাদে আঘাত হেনেছে। এই কোমের চেতনা উৎসারিত আলেমদের আবেদন প্রচণ্ড ক্ষেপণাস্ত্রের শক্তি নিয়ে জালেমশাহীর একটার পর একটা দুর্গ ধসিয়ে দিয়েছে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখলাম এই শহরটি। দেখলাম এই নগরীর মানুষগুলোকে। নতুন ইতিহাসের স্রষ্টা এরা। ইতিহাসের গতিধারাকে পাল্টে দেয়ার মহান হাতিয়ার যেন এই কোমের প্রত্যেকটি মানুষ। এদের চোখ, মুখ, চেহারা, চাহনিতে এক অমিত তেজ বিপ্লবের আগুন যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। যেন 'ওরা জানেনা হার মানা, ওদের গতিতে প্রখর ডানা।'

বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফায়জিয়া মাদরাসায় এলাম এই সেই মাদরাসা যেখানে প্রত্যেকটা তালেবে ইলমের কলবে ঢেলে দেয়া হয় বিপ্লবের ফয়েজ। প্রত্যেকটি রুহ এই মাদ্রাসায় এসে শাহাদাতের জন্য নেশাগ্রস্ত, উন্মাদ হয়ে উঠে। শূন্য হাতে বুক খুলে এরা গর্জে ওঠা কামানের সামনে দাঁড়াতে পারে। কামানের গর্জনকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। শাহ যখন বিশ্ব জনমতকে ধোঁকা দেয়ার জন্য শ্বেত বিপ্লবের নামে তার সমস্ত অপকর্মগুলো বৈধ করার উদ্দেশ্যে গণভোট করে এবং সরকারী ঘোষণা দেয় যে বিপুল গণসমর্থন রয়েছে শাহের সপক্ষে, সে বছরই ঈদ উপলক্ষে ইমাম বক্তব্য রাখেন- 'শাসক গোষ্ঠীর বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। চরম পরীক্ষার ভয়ে ভীত হবেন না। সরকার যদি শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, নতি স্বীকার করবেন না। আমরা ইসলামের জন্য সংগ্রাম করি। কোন শক্তিই তা সে যত বড়ই হোক না কেন আমাদের স্তব্ধ করে দিতে পারবে না।'

একই বছর ২২ মার্চ কোম থেকে উত্থিত ইসলামের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য মেশিনগান সজ্জিত একদল সশস্ত্র সৈন্য কোমে প্রবেশ করে। ইমামের গৃহের চতুর্দিকে জনতার ভিড়, সেনাবাহিনীর অবস্থান থেকে ইসলাম বিরোধী শ্লোগান উত্থিত হল। সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় শাহের পালিত গুন্ডারা মাদ্রাসার ভেতরে প্রবেশ করল। বিক্ষিপ্ত ছাত্রদের মারধোর গালিগালাজ ও অত্যাচার শুরু করল। কোমের জনতা মাদ্রাসার চারিদিক বেষ্টন করে অবস্থান নিতে থাকলো। সেনাবাহিনী ও গুন্ডারা গুলীর ঝড় তুলে ছাত্রদেরকে মাদ্রাসা ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। ইমাম ঘটনাস্থলে এসে রক্তাক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বললেন- 'আপনারা শান্ত থাকুন। আপনারা এমন সব দ্বীনি নেতার অনুসারী যারা এর চাইতে আরো বেশী নির্যাতন ভোগ করেছেন। যারা এ ধরনের দৌরাত্ম ও নির্যাতন চালায় শেষ পর্যন্ত এসব তাদের কাছেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। ইসলাম ও মুসলমানদের ইজ্জত ও আযাদী রক্ষার জন্য আপনাদের অনেক দ্বীনি নেতা শাহাদাত বরণ করেছেন। সুতরাং তাদের পবিত্র উত্তরাধিকার হিফাযত করার দায়িত্ব আপনাদেরই।'

এই কোম থেকে ইমাম খোমেনী দেশের সমস্ত দ্বীনি মোবাল্লিগদের কাছে আরজ রাখলেন- 'ইসলামী জনতার ওপর শাহ যে জুলুম ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল ও তার দালাল গোষ্ঠী ইসলামের প্রতি যে সত্যিকার হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, আপনারা সে সম্পর্কে আপনাদের খোতবায় আলোচনা করুন।' তার বক্তব্যগুলো দেশের সর্বত্র চিঠি ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তেজনা বেড়েই চলেছে ক্রমশ। এক পর্যায়ে সাভাক বাহিনী হুমকি দিল, ফায়জিয়া মাদ্রাসায় বক্তৃতা দেয়া চলবে না। সেই দিনই আশুরার পড়ন্ত বিকেলে ইমাম ভাষণ দিলেন- 'আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি যে শাসক গোষ্ঠী ইসলাম ও ইসলামী নেতৃত্বের বিরোধী। ইসরাইল শাহ-এর সহযোগিতায় আমাদের ঐশী কেতাব কোরআনের অবমাননা করতে চায়। ইসলামী নেতৃত্বকে নির্মূল করতে চায়। ইহুদীরা আমাদের ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতি ও কৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়'

৫ জুন কোম অবরুদ্ধ হয়। সেনাবাহিনী ইমামের বাড়ী ঘেরাও করে। তাকে দ্রুত সামরিক গাড়ীতে তুলে নিয়ে তেহরানের কারাগারে আবদ্ধ রাখে। বিদ্যুতের মত এ খবর তেহরানের সর্বত্র ছড়িয়ে পরে। জনতার ঢল নেমে আসে রাজপথে। কোম শহর রক্তাক্ত হয়ে উঠে। নিহত হয় ৪ শত। তেহরানের রাজপথের অবস্থাও একই রকম। লালে লাল হয়ে ওঠে অজস্র শহীদের রক্তে। শাহেরমেশিনগানের গুলীতে লুটিয়ে পড়ে ১৫ হাজার জিন্দা-দীল মানুষ। তারপর ইমামকে দেশ থেকে নির্বাসন দেয়া হয়। বিপ্লবের আগুন রাজপথ থেকে সরে আসে। বছরের পর বছর ধরে রেজা শাহের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের স্তূপে চাপা পড়ে যায়। কিন্তু সে আগুন বাসা বেঁধে থাকে আলেমদের অন্তরে। সমগ্র কোম নগরী ১৫ বছর ধরে সে বিপ্লবের আগুন একইভাবে বহন করতে থাকে। শাহী আগ্রাসনের শেষ চিহ্ন মুছে দেয়া পর্যন্ত কোমের জাগ্রত জনতা তাদের তলোয়ার কোষবদ্ধ করেননি। মানুষের অন্তরকে জিন্দাদীলে পরিণত করার জন্য কোম আজও প্রচণ্ড শক্তির উৎস।

ফায়জিয়া মাদ্রাসায় আমরা আমন্ত্রিত। দুপুরের খানাদানায় আরও অনেকের সাথে আমরা অংশ নিলাম। বিকেল নাগাদ শুরু হয় অনুষ্ঠানের। এখানে একজন আলেম ভাষণ দিলেন ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর শাহাদতের তাৎপর্য বিষয়ে। তিনি ভাষণ দিচ্ছেন, বলিষ্ট তার বক্তব্য। ইমাম হোসেনকে ঘিরে কুচক্রীদের

বিস্তৃত ষড়যন্ত্রের রহস্য একে একে উদঘাটন করছেন। তার বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে সমবেত মর্সিয়ার বেদনা-বিধৃত সুরের মূর্ছনা। এতে অনুষ্ঠান আবেগ বিমণ্ডিত হয়ে উঠছে। শ্রোতাদের সবার চোখ দিয়ে একইভাবে গড়িয়ে আসছে অশ্র"র ধারা। অনুষ্ঠান হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হল। আমার দারুণ ভাল লেগেছিল। ১৪শ' বছর ধরে বিপ্লবের বহ্নিশিখা, সেই কারবালার বহ্নিশিখা এভাবেই তারা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ কারণেই আজকে প্রতিটি অন্তরের ছোট ছোট আগুন সম্মিলিতভাবে সূর্য-শিখায় পরিণত হতে পেরেছে। এ কারণেই ইরানী জনতার অভিব্যক্তি আপোষহীন। তারা নিঃশঙ্কচিত্তে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসতে পারে। আর এই ১৪শ' বছর ধরে আমরা রাজতন্ত্রীদের সাথে আপোষ করে এসেছি। রাজা, বাদশাহ, আমীর আর সুলতানদের ষড়যন্ত্র আমাদের

চেতনাকে গ্রাস করে আমাদের ইসলামী স্পৃহাকে হত্যা করেছে। আমরা ইসলামের মূল প্রেরণা থেকে সরে গিয়ে এর ক্ষয়ে যাওয়া খোলসটা আঁকড়ে ধরে বেহেশতের প্রতীক্ষা করছি।

ভাবছি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে আজও আমাদের ঘুম ভাঙছেনা কেন? কারণ ওমর (রাঃ) ঝুপড়িতে ইসলামের অনুসন্ধান না করে আমরা তাজমহলের মর্মর পাথরে ইসলামের শান শওকত খুঁজতে ব্যস্ত। আমরা বেহেশতী জেহরা ঈদগাহে ইসলামকে না খুঁজে ফাহাদের দৌলতখানায় ইসলাম খোঁজার চেষ্টা করছি। ইরানের রেজাশাহ পাহলবী ৩৭ বছর জনগণের সম্পদ লুট করে যে সুরম্য ৪টি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন সেগুলো দেখার আগ্রহ আমাদের কম ছিল না। বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ প্রসাদের মালিককে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও প্রাসাদগুলো অক্ষত ছিল। নিরস্ত্র জনতার কাছে আমেরিকার মদদপুষ্ট তথাকথিত লৌহমানবের নির্লজ্জ পরাজয়ের কলঙ্ক-চিহ্ন হিসেবে ইরান সরকার প্রসাদগুলোকে সম্পূর্ণ আগের অবস্থায় রেখে দিয়েছেন।। এর ফলে বিপ্লবের সুদৃঢ় ভিত্তিমূল আরও মজবুত হয়েছে। জনগণের কাছে যা এতদিন ছিল অবিশ্বাস্য এবং আরব্য উপন্যাসের কল্পকাহিনী, স্বচক্ষে এবং সুস্পষ্টভাবে এসব অবলোকন করে জনতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, তারা কিভাবে গুটিকতক লোক দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। চারটে রাজপ্রাসাদের জন্য এক বিরাট মূল্যবান এলাকা অনুৎপাদনশীল খাতে স্রেফ কতিপয় লোকের ভোগ বিলাসের জন্য বিনিয়োগ করা হয়েছিল। প্রাসাদের বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। আধুনিক সাজ সরঞ্জাম আর আসবাবপত্রের বিপুল সমাহার। এ ছাড়াও পৃথিবী মন্থন করে যা কিছু পাওয়া গেছে যা কিছু শাহের পছন্দ হয়েছে সবগুলোর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এখানে। বিজ্ঞানের সর্বোন্নত ও সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে প্রাসাদগুলোতে। প্রমোদ কানন, সুইমিংপুল, হেলিপ্যাড, নাচঘর সব রকম আরাম আয়েশ এবং লালসা চরিতার্থ করার সব আয়োজন এখানে বিদ্যমান ছিল। এ ছাড়াও প্রাসাদগুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বৈচিত্রময় নিরাপত্তা বেষ্টনী, সর্বাধুনিক আয়োজন ও সমকালীন শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র ও উপকরণের ব্যবহারের আধুনিকতম ব্যবস্থা ছিল। এখনও সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত সুগন্ধে সুবাসিত হাম্মামখানার কাছাকাছি গেলে মন

মাতাল হয়ে ওঠে। সবকিছু দেখে মনে হল, শাদ্দাদের বেহেশত শাহের প্রাসাদের কাছে মাথা নত করবে। প্রাসাদের খাস কক্ষগুলোতে ঢোকার অনুমতি নেই। এ কারণে তালাবন্ধ। জানালা দিয়ে সবকিছু দেখলাম। দেখে আধুনিক শাদ্দাদের জন্য দুঃখ হল। জনগণের সম্পদ লুট করার তার এত আয়োজন-উদ্যোগ। তার আভিজাত্য-স্বাচ্ছন্দের জন্য এত রক্তপাত এত প্রাণহানি। তার পরিণতিটা কি হল? খুনের আসামী হয়ে নিরাশ্রয় ছিন্নমূল তৃণের মত ভেসে বেড়াতে হল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। এক ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সব সময়। তার অপকর্মের প্রধান সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাও তাকে ঠাঁই দেয়নি। তার ভাষায়-মৃত ইঁদুরের মত আমেরিকা আমাকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। তার ঐশ্বর্য আর বিত্ত-বৈভবের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে শেষ অবধি।

ইরান সফরকালীন সময়ে একদিন তাবরিজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তাবরিজ ইরানের উত্তর পশ্চিমে সবচেয়ে জনবহুল ও বৃহত্তম প্রদেশ আজারবাইজানের রাজধানী, রাশিয়া ও তুরস্কের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত। প্রাকৃতিকভাবে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রতিবাদী ও সংগ্রামী। ষাটের দশকে কোমে আয়াতুল্লাহ খোমেনী আত্মপ্রকাশের পর সরকার বিরোধী যে আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে তার ঢেউ তাবরিজে এসে আছড়ে পড়ে। এতে শাহের নির্বিচার গুলীতে ২শ' লোক প্রাণ হারায়।

১৯৭৮ সালের শুরুতে আবার শাহ-বিরোধী বিপ্লবের গুমোট নিম্নচাপ তেহরানে ঘনীভূত হয়। তাবরিজের সংগ্রামী মানুষগুলো একটা ঝড়ের প্রতীক্ষা করতে থাকে। তারপর প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলে এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল রাজপথে নেমে আসে। শাহ তার শেষ দিন পর্যন্ত তাদের ফেরাতে সক্ষম হননি। বিক্ষোভ, মিছিল, শোকসভা ও পথসভায় রাজপথ মুখরহয়ে ওঠে। মসজিদগুলো পরিণত হয় বিপ্লবের কেন্দ্র-বিন্দুতে। সাভাক তার নির্মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় গ্যারিসনের সৈনিকদের ডাক পড়ে। কিন্তু তাবরিজের মানুষগুলোর মরিয়া মনোভাব লক্ষ্য করে গ্যারিসনের সেনাবাহিনী রাজপথে অবস্থান নিতে অনীহা প্রকাশ করে।

এক বিরাট হত্যাযজ্ঞ এড়ানোর উদ্দেশে হয়তো সেনাবাহিনী বর্বরোচিত পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকে। অতঃপর শাহের নির্দেশে হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্বিচার গুলী চলে। এতে ৫শ' প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায় চিরদিনের জন্য। এর ফলে আন্দোলনের গতি ব্যাহত হয়েছে এমনটি নয় বরং এতে বিপ্লবের প্রকৃতি আরও ভয়ঙ্কর আরও প্রচন্ড হয়ে উঠে।

এই সেই তাবরিজ যেখানে মসজিদে অনুষ্ঠিত শোকসভার ওপর বাইরের গ্যারিসনগুলো থেকে নিয়ে আসা বর্বর সৈনিকরা গুলীবর্ষণ করে। নিহত মানুষদের গোঙানী, আহতদের আর্তনাদ, প্রতিবাদী জনতার তকবীর, সাইরেন ও গুলীর শব্দে পরিস্থিতি প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। অজস্র গুলী বুকে নিয়ে জনতা ধাওয়া করে সৈনিকদের। সেনাবাহিনী পালাতে বাধ্য হয়। নিরস্ত্র জনতার এই কোরবানী, নির্বিচার গণহত্যার বাস্তব চিত্র, আর বিপ্লবের নতুন স্ফুলিঙ্গ ক্যাসেটে বাণীবদ্ধ করে গোটা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তাবরিজের ঘটনা প্রবাহ, তাবরিজে ঝরানো বিপ্লবী জনতার রক্ত ইরানের ভাগ্য পরিবর্তনের বিরাট প্রেরণা হয়েছিল শেষ অবধি।

মেহমান হিসেবে তাবরিজে অবস্থানকালে তাদের সেই প্রতিবাদী প্রচণ্ড রূপের উল্টো দিকটা দেখে বিস্মিত হয়েছি। তারা যেমন আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় প্রয়োজনে উজাড় করে রক্ত ঢালতে পারে; তেমনি মেহমানের পান-পেয়ালায় সরবত ঢেলে হাসিমুখে নিবিড়-সান্নিধ্য দিয়ে সৌজন্য উজার করতে পারে অকাতরে। তাদের মুখেই শুনেছি তারা কিভাবে নির্বিকারে অজস্র জীবন দিয়ে মহান ইসলামী বিপ্লবকে তার অন্তিম লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে গেছে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আজও তারা রণক্লান্ত হয়ে পড়েনি। শাহাদাতের মঞ্জিলে পৌঁছে তবেই যেন তারা বিশ্রাম নেবে।

ঐতিহাসিক শহর শিরাজ সমুদ্রতল থেকে ১৬শ' মিটার উচ্চে অবস্থিত। নাতিশীতোষ্ণ এই শহরটিতে আমাদের নিয়ে আসা হল। গুলিস্তাঁ-বুস্তাঁর এই শহরটির বিমোহিত করা মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে আবেগময় করে তোলার জন্য যথেষ্ট। সম্ভবতঃ এই কারণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের চারণভূমি হয়েছে। এটা প্রেয়সীর কপোলের একটা তিলের জন্য সমরখন্দ বোখারাকে

বিক্রি করতে উদ্যত ছিলেন যে সৌন্দর্যপ্রিয় কবি সেই হাফিজ এখানে ঘুমিয়ে আছেন। ঘুমিয়ে আছেন মানব সত্তার রহস্য উন্মোচনকারী কবি শেখ সাদী। বিশ্ব সাহিত্যে যেমন তাদের কর্ম মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, অনুরূপভাবে তাদের মাজারগুলোতে সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুরম্য সৌধ। পুষ্পে শোভিত সৌন্দর্য আর সুরভিতে মৌ মৌ করছে মাজার বেষ্টিত ফুলের বাগান। স্মৃতি সৌধগুলোর পুষ্পময় চত্বরগুলো দেখে মনে হল- হুসন্ আর ইশ্ক সৌন্দর্য আর প্রেমের দুটো ধারা এখানে এসে একাকার। এমন মনোরম মোহনায় এই কবিরা এলেও থমকে দাঁড়াতেন। আর তাদের হংসপাখা কথা বলত, গানে গানে মুখর হয়ে উঠত। কিন্তু গানের সেই বুলবুলিরা 'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে।'

পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত কবিদের ভক্ত অনুরক্ত দেখে মনে হল আমি গান গেয়ে উঠি 'লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া মজনুগো আঁখি খোল।' কিন্তু ফুলের জলসায় শায়িত মজনুরা কোনদিন আর আঁখি খুলবে না। তাদের সে ঘুম ভাঙার ঘুম নয়। আমি দোয়া করলাম তাদের জন্য আর বললাম- 'খোশ রহো আহলে চামান- হে বাগানবাসী তোমরা সুখে থাক'।

দেখলাম, মুসলিম স্থাপত্য আর ঐতিহ্যের জীবন্ত নিদর্শন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রাচীন জুমা মসজিদ, নয়া মসজিদ। দেখলাম নরেন জেস্তান বাগান ও পারস্য যাদুঘর।

শিরাজের সৌন্দর্য সুষমা দেখে যদি কেউ একে বেহেস্তের বাগান বলে তাহলে মনে হয় ভুল হবে না। জুন্দ রাজবংশের আমলে শিরাজকে রাজধানী করার রহস্যও সম্ভবতঃ এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ৪৯ বছর শিরাজ ইরানের রাজধানী ছিল। এখানকার রোমান্টিক কবি একটা নারীর তিলের জন্য সমরখন্দ বোখারা দিতে চাইলেও বিশ শতকের শিরাজ মহান ইসলামী বিপ্লবের শক্তিশালী দুর্গ। বুলবুলি আর গুলবাগের সুর আর সুরভির সমাহারে থেকেও শিরাজের আবাল-বৃদ্ধবনিতা আজানের বিপ্লবী আহবান ভুলেনি। শাহের নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাহাড়ের মত প্রতিরোধ মূর্তিমান হয়ে ওঠে এখানে। শিরাজের দুঃসাহসিক জনতার ব্যূহকে ভেঙে ফেলার জন্য শাহী সৈন্যরা তাবরিজের মত এখানকার

মসজিদেও নির্বিচারে মেশিনগানের গুলীবর্ষণ করে। বন্দুকের গর্জন, মানুষের আর্তনাদ, কাতর কণ্ঠের আহাজারি, প্রতিরোধকামীদের সোচ্চার তকবীর ক্যাসেটে আজও বাণীবদ্ধ হয়ে আছে। শত শত মানুষ আত্মাহুতি দেয় কিন্তু তবু মৃত্যু-পাগল মানুষগুলোর মুষ্টিবদ্ধ হাত রাজ তখতের ভিত্তিমূলে আঘাত করতে সক্ষম হয়।

আমরা আয়াতুল্লাহ শিরাজীর বাসভবনের দিকে পা বাড়ালাম। বহু মানুষ এখানে। আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হল। আয়াতুল্লাহ শিরাজী বিপ্লবের সুদৃঢ় স্তম্ভ। তার চোখ, চাওনি আর সমস্ত আদল থেকে বিপ্লব বিচ্ছুরিত। বক্তব্য রাখলেন ইংরেজীতে। কোন জড়তা নেই। সুস্পষ্ট বক্তব্য সুদৃঢ় বাচনভঙ্গী তার বাণীগুলো বিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাতের মত মনে হল। আমাদের অন্তরে অন্তরে যেন মুহূর্তেই ছড়িয়ে দিলেন এক ভয়ঙ্কর অগ্নিগিরির লাভা। অনেক দিন হয়ে গেছে অথচ তার সেদিনের বক্তব্য আজও আমাকে উদ্বেল করে তোলে।

গাড়ী চলছে। দুর্নিবার গতিতে আমাদের গাড়ী চলছে। কখনও সুদৃশ্য শ্যামল প্রান্তর, কখনও পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চলছি। ভাবছি এদেশের মানুষের অপূর্ব ত্যাগ আর কোরবানীর কথা। কতইনা রক্ত দিয়েছে এদেশের মানুষ। আজও দিচ্ছে। কোন ক্লান্তি কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। বিশ্রামের সময় নেই। সবাই ছুটছে, মোহগ্রস্তের মত ছুটছে এক অন্তিম লক্ষ্য অর্জনের জন্য। ইরানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেও এদের নেশা কাটেনি। আল্লাহর দ্বীনকে এরা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে। এদের অকুতোভয় কর্মপ্রয়াসী জাতীয় উদ্দীপনা দেখে মনে হল এরা যেন বিশ্ব বিপ্লবের জন্যই জন্মেছে। বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের বিরুদ্ধে এদের সংগ্রাম সফল লক্ষ্যে পৌঁছতে দেরী হবে না। তাদের সবারই যেন এই কথা, একই অভিব্যক্তি- 'হামদার্দ কি আফসানা দুনিয়াকো শুনা দেঙ্গে, হো যায়েগী ফির দুনিয়া আবাদ এতীমো কা- শুনিয়ে দে এই পৃথিবীকে প্রেম আর ভালবাসার বার্তা, এ পৃথিবীটা আবার হয়ে উঠবে দুঃস্থ, আর এতিমদের আবাসভূমি।

দেখতে দেখতে আমরা এসে পৌঁছলাম বেহেস্তী জেহরার দোর গোড়ায়। শত শত মানুষের ভিড়। আবাল-বৃদ্ধবনিতার সমাবেশ। অনেক মহিলা মাতম করছে তার ভাই, তার স্বামী, অথবা তার আত্মীয় পরিজনদের জন্য। এই আবেগ বিহবল বেদনার্ত অনুভূতি আমাদের আপ্লুত করে তোলে। আমাদের অজান্তেচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু"। দূর দূরান্তের মুসাফির আমরা কখন যে একাকার হয়ে গেছি এদের সাথে। বিরাট কবরগাহ। কবরগুলো সুবিন্যস্ত সাজানো। হাজার হাজার জীবন্ত মানুষ ঘুমিয়ে আছে এখানে। আল-কোরআনে এদেরই বলা হয়েছে জীবন্ত। বলা হয়েছে- 'এবং তাদের মৃত বলো না যারা আল্লাহর পথে শহীদ।' এই কবরগুলোর জীবন্ত মানুষরা গোটা জাতির জীবনীশক্তি। ওদের হাতিয়ার গর্জে উঠবেনা কোন দিনও। কিন্তু ওদের জীবন্ত কবরগুলো কিয়ামত পর্যন্ত জাতীয় প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। ওদের খুন আর খাকের দ্রবণ জাতীয় সত্তাকে সঞ্জীবিত করতে থাকবে। প্রত্যেক কবরে শহীদের ছবি টাঙানো আছে, ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দুঃসাহসিক সিপাহীদের অধিকাংশ তরুণ। শহীদদের বাবা-মা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। স্বজনহারানো বেদনাবোধ স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখেছি তাদের মধ্যে। তারা সন্তানদের শাহাদাতের জন্য গৌরবান্বিত। বাকী সন্তানদেরকেও তারা শাহাদাতের রাস্তায় যাওয়ার জন্য প্রেরণা যোগাবে বলে আমাদের জানিয়েছেন।

এই বেহেস্তী জেহরা, এই বিরাট কবরগাহ দেখে মনে হয়েছে, যে জাতি মৃত্যুর জন্য এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে তাকে দুনিয়ার কোন শক্তি মারতে পারে না। আমার মনে হল, কোন শক্তিধর পরাশক্তি ইরানের অনিবার্য বিজয় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। বাংলাদেশের কুটির থেকে ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন দেখা কবির গজলের দুটো কলি এই কবরের তোরণে লেখা থাকলে বোধ হয় মানানসই ও সঠিক হত-

'শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জামায়েত ভারী
হবে দুনিয়াতে ফের ইসলামী ফরমান জারী।'

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যকে নিয়ে চিন্তা করতাম। এতদিন যেমন ছিল আশা তেমন ছিল আশঙ্কা। আওয়ামী পঞ্চমবাহিনীর চূড়ান্ত বিজয়ের পর

বাংলাদেশে যেমন নেমেছে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের ধস, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যেমন হয়েছে দেউলিয়া, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যেমন হয়েছে বিপন্ন; তেমন একটা পরিণতির দিকে ইরান এগিয়ে যায় কিনা- এমন একটা উদ্বেগ ছিল দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনের শরীক মানুষগুলোর। কিন্তু ইমাম খোমেনীর আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব বস্তুবাদী কুচক্রুড়ী মুজিবের মত ভুল করেনি। আত্মোৎসর্গকারী তরুণদের ময়দান থেকে ঘরে পাঠিয়ে তাদের উদ্দীপ্ত চেতনাগুলোকে মরচে ধরিয়ে বিবর্ণ করেনি। কর্মক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করে কর্মবিমুখ অলস জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করেনি। বেগবান তারুণ্যকে শয়তানের ইন্ধনে পরিণত হতে দেয়নি। ইমাম খোমেনী তাদের সামনে তুলে ধরেছেন জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী।

দক্ষ অদক্ষ তরুণ কর্মী ও ছাত্ররা গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে জিহাদ শাজিন্দেগীর (পুনর্গঠন জিহাদের) কর্মসূচী নিয়ে গেছে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিধ্বস্ত বাড়ীঘর নির্মাণ, পানি সেচের ব্যবস্থা, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, এসব করছে শিক্ষিত অশিক্ষিত তরুণ কর্মীরা। আমরা দেখেছি বিধ্বস্ত ইরানকে তারুণ্যের স্পর্শে তাজা হতে।

দু'বছর স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে ইমাম খোমেনী দেশটাকে পিছিয়ে দিয়েছেন এমন নয়। বরং সমস্ত সিলেবাস, সমস্ত কারিকুলাম পরিবর্তন এবং নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য এটুকু সময়ের প্রয়োজন ছিল। আগের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রে গোলাম তৈরির সিলেবাস চালু রাখলে হাজার হাজার দেশপ্রেমিকের রক্তদান বিফলে যেতে বাধ্য হত। এ ছাড়াও দুটো বছরের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথাকথিত বামপন্থীদের সস্তা রাজনীতির আখড়াসমূহ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। এসব দেখে মনে হল, তাপস আধ্যাত্মিক নেতা কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞার অধিকারী।

ইরানে জিহাদে শাজিন্দেগী অর্থাৎ পুনর্গঠন জেহাদ সংস্থাটি অল্প কিছু দিনের মধ্যে জনমনে দাগ কাটতে সক্ষম হয় এবং দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

এককালের বিভ্রান্ত তরুনরা নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের তারুণ্যকে নিয়োগ করেছে জাতীয় পুনর্গঠনে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সবরকমের কুট-কৌশল নিঃশেষ হওয়ায়, দুনিয়ার মুসলমানদের দৃষ্টি ইরানের বিপ্লব থেকে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে শিয়া বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবের মহানায়ককে কাফের হিসেবে মুসলিম বিশ্বে উপস্থাপন করা হচ্ছে। পরস্পরকে সংঘাতের মধ্যে নিয়ে এসে কায়েমী স্বার্থবাদী লুটেরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলমানদেরকে নিরংকুশভাবে শোষণ করার পথ পরিষ্কার করছে। প্রচারণার তোড়ে বিভ্রান্ত মুসলমানদের তবু অনেক জিজ্ঞাসা। এসবের সঠিক উত্তরের জন্য ইরানের সুন্নী আলেম খোঁজ করলাম। ইরানের পার্লামেন্ট সদস্য একজন সুন্নী আলেমকে পেয়ে তার সাথে আলাপ করতে চাইলে তিনি সাগ্রহে রাজী হলেন। তার ভাষায়- 'ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ব্যাপারে সুন্নীরা নীরব ছিল অথবা শাহকে সমর্থন দিয়েছে এমন একটি ঘটনাও আমার জানা নেই। তুর্কমেন, কুর্দ, বেলুচ সব সুন্নীরা শিয়া ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার দোসর ইরানের শাহকে উৎখাত করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছে। বিপ্লবের পরে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও সুন্নীরা ভোট দিয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে।

কুর্দীস্তানের উত্তেজনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন- 'ওখানে যারা উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তারা শিয়া সুন্নী কোনটাই নয়। সস্তা শ্লোগানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের নীলনক্সা বাস্তবায়নের জন্য কিছু কুচক্রী কাজ করে যাচ্ছে। আমরা শিয়া সুন্নী উভয়ে মিলে তাদের প্রতিহত করছি, ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এখন আগের মত আর সেই অশান্ত অবস্থা নেই। ইমামকে আমাদের নেতা হিসেবে মনে করি। ইমামই আমাদের নেতা, আমাদের পথ প্রদর্শক।'

তিনি আরও বললেন- 'ইমাম মদ নিষিদ্ধ করেছেন, সুদ উৎখাত করেছেন, রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছেন, হেজাব চালু করেছেন, হক আর ইনসাফ

প্রতিষ্ঠিত করেছেণ। আমরা সুন্নীরা কি এ কথাই বলব- মদ খেতে চাই, পর্দার প্রয়োজন নেই, রাজতন্ত্র ফিরিয়ে দাও, সামাজিক সুবিচার অনৈসলামিক? যদি এসব না চাই তাহলে আপনারা বলুন, ইমামের পথ আর আমাদের পথের পার্থক্য কোথায়? ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যে এক-আধটু পার্থক্য রয়েছে এই পার্থক্যটুকু সাফী, হানাপী, মালেকী, হাম্বলী বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যেও রয়েছে। এ পার্থক্য মৌলিক নয়। অতএব আমাদের বিভেদও নেই। ইরানের সমস্ত শিয়া সুন্নী কায়েমী স্বার্থবাদী, শোষক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শক্তি। কায়েমী স্বার্থবাদী ও শোষক শ্রেণী, তা সে শিয়া হোক অথবা সুন্নী হোক, আমরা শিয়া সুন্নী সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব।'

'রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ শত শত বছর ধরে আমাদের শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদ লুট করছে। বিভেদের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মুসলিম উম্মাহকে শতধাবিভক্ত করছে। ছোট্ট একটা অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের হাতে আমরা মার খাচ্ছি। লাঞ্ছিত হচ্ছি দেশে দেশে, দুনিয়ার সবখানে। সাম্প্রদায়িকতার ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে কোথাও যেন মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে না পারে সেজন্য আপনারা যে যেখানে আছেন সেখান থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের কুট-কৌশলগুলো দুনিয়ার সামনে তুলে ধরুন।'

ইরানের সুন্নী নেতা বলে চলেছেন- 'লেবাননের সুন্নী নেতারাও ইমামকে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে শোষক ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার জন্য দুনিয়ার সকল মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।' এ ব্যাপারে ইমাম খোমেনী বলেন- 'তারা আমাদের মধ্যে মতবিরোধ বাধাতে চায়। আমাদের অবশ্যই হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কারণ আমরা সবাই মুসলমান, আল কোরআনের অনুসারী। পবিত্র কোরআন ও তওহীদের জন্য আমাদের অবশ্যই কাজ করে যেতে হবে এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।'

জুমআর নামাজের প্রকৃত তাৎপর্য ও গুরুত্ব আমরা ইরানে না এলে বুঝতাম না। নিছক একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বলে আমরা আজও বিশ্বাস করতাম। অথচ এই জুমআর নামাজই এখানে শাসক ও শাসিতের দূরত্ব দূর করে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কের সীমানায় নিয়ে এসেছে। সরকার ও জনগণের

মধ্যে তথ্যের ব্যবধান অর্থাৎ ইনফরমেশন গ্যাপ দূর করার এই যে ধর্মীয় অনুভূতিসিক্ত সর্বাধুনিক ব্যবস্থা এমনটি পৃথিবীর আর কোন রাজনৈতিক মতবাদ দিতে পেরেছে বলে আমার জানা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অজস্র সামিয়ানার নিচে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয় নামাজের জন্য। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। খোতবায়ে দাঁড়ালে হাতে থাকে অটোমেটিক মেশিনগান। এ যেন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হাতের লাঠি, ১৪শ' বছর পর অটোম্যাটিক মেশিনগানে পরিণত হয়ে গেছে। মনে হয় সময়ের এই যে ব্যবধান সেটা এখানে এসে দূর হয়ে গেছে। এ যেন সার্ভাইভাল অব দি ফিটেস্ট-এর অনিবার্য পরিণতি। পৃথিবীটা যোগ্যতমের আবাস। কালের ব্যবধানে যোগ্যতার বিবর্তনও আনতে হবে স্বাভাবিকভাবে। সময়ের গতির সাথে জীবনকেও গতিশীল করে তুলতে হবে। ইরানের সামগ্রিক নেতৃত্বে এ দিকটায় কোন ফাঁক চোখে পড়ল না। ইমামের খোতবার জন্য তিন চার স্তর বিশিষ্ট কোন মেহরাব নয়, ভূমি থেকে ১৫ ফুট উঁচু একটা ডায়াস, এর থেকে বেশ কিছু দূরে একটা স্টেজ। এমন না হলে লক্ষ লক্ষ মুসল্লীদের মধ্যে খোতবা দেয়া সম্ভব নয়। সমবেত জনতার সংখ্যা অনুমান করার চেষ্টা করলে ভুল হবে, কেননা সাড়িবদ্ধ জনতার শেষ প্রান্তটি চোখে পড়ে না।

খোতবা আমাদের দেশের মতই দুটো পর্যায়ে বিভক্ত। এ ব্যাপারে আমরা ১৪শ' বছর আগে রয়ে গেছি। অর্থাৎ সেই পুরানো দিনগুলোতে যে খোতবা পরিবেশন করা হত হুবহু সেটিকে পাঠ করা হয় মাত্র। তাও সেটা পাঠ করা হয় আরবীতে। যা অনেকেই শুধুমাত্র পুণ্যের আশায় চোখ বন্ধ করে অন্ধের মত শুনে যায়। কিন্তু গণমনে এর বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয় বলে আমার মনে হয় না।

অথচ এখানে প্রথম পর্যায়ে খোতবা দেয়া হয় চলতি ঘটনা প্রবাহ সামনে রেখে। এতে রয়েছে জাতীয় মূলনীতির আলোকে গৃহীত কর্মসূচীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচিত হয় ইসলামের হুকুম আহকাম ও তাত্ত্বিক

দিক নিয়ে। এখানে সমস্ত পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকেন।

এই কেন্দ্রীয় জামায়াত ছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একইভাবে জুম্মার জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় জামায়াত পরবর্তীতে টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয়।

ইসলামী বিপ্লব যে শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের ভিতকে উপড়ে ফেলেছে, ইমামের ভাষায় 'বড় শয়তান' আমেরিকাকে ইরানের মাটি থেকে উৎখাত করেছে তা নয়; পুঁজিবাদ ও পাশ্চাত্য জীবন দর্শনসৃষ্ট ইরানের জাতীয় সত্তার গভীরে প্রোথিত অপসংস্কৃতিকে সমূলে উৎপাটিত করতে সক্ষম হয়েছে।

তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে মেয়েদেরকে মাতৃত্বের মর্যাদার আসন থেকে সরিয়ে পুরুষদের ভোগ বিলাস ও লালসার একমাত্র সামগ্রীতে পরিণত করা হয় বিপ্লব-পূর্ব ইরানে। বারাঙ্গনা ও প্রমোদবালায় পরিণত হয় ইরানের অগণিত নারী। সমগ্র জাতীয় সত্তার অর্ধেক এই নারী সমাজকে অনিবার্য ধ্বংসের কিনার থেকে মুক্তির নব দিগন্তে টেনে আনে ইরানের ইসলামী বিপ্লব। তাই বলে ইরানে নারী সমাজকে অবরুদ্ধ করা হয়নি। নিশ্চিদ্র অবগুণ্ঠনে আবৃত করেও রাখেনি। হিজাব অর্থাৎ শালীন পোশাক পরিহিত অবস্থায় ইরানের মেয়েদের অবাধ বিচরণে কোন বাধা নেই। ইরানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কোন মেয়ে যদি একাকী হেঁটে যায় তাহলে তাকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে কেউ তাকিয়েও দেখতে পারবে না।

আজকের ইরানে একটিও বারবনিতা নেই। এ সবের ভাগারগুলো নির্মূল করা হয়েছে। পুনর্বাসন করা হয়েছে এদের। ইসলামী বিপ্লব এদেরকে বারবনিতা থেকে গৃহবধূতে পরিণত করেছে। পথে ঘাটে সবখানে আমরা দেখেছি মেয়েদের অবারিত পদচারণা কিন্তু শালীন পোষাকে আবৃত। তথাকথিত উদারনীতির নামে লালসা সৃষ্টি করার মত কোন পথই খোলা রাখা হয়নি। এখানকার মহিলারা বুঝেছে হিজাব তাদের নিরাপদ আশ্রয় ও মর্যাদার প্রতীক। বুঝেছে ইসলামী বিপ্লব মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণের উত্তম গ্যারান্টি। আজকের ইরান সিনেমা, সাহিত্য, শিল্পকলার মাধ্যমে মেয়েদের হিজাবে উদ্বুদ্ধ করছে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম

কৌশল প্রয়োগ করে। ইমামের বাণীসমূহ ইরানের সমগ্র নারী সমাজকে হিজাবে উদ্বুদ্ধ করেছে সবচাইতে বেশী। ইমামের ভাষায় : 'শত্র"রা আমাদের শহীদের রক্তকে ততটা ভয় করে না যতটা ভয় করে আমাদের বোন ও মেয়েদের হিজাবকে। হিজাব শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।'

বিপ্লবের পর হিজাব প্রচলনে তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা এর বিরুদ্ধে মহিলাদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। অত্যন্ত মুখরোচক একটি শ্লোগান সামনে নিয়ে ময়দানে নামে। তাদের দাবী- 'স্বাধীনতার বসন্তে স্বাধীনতা চাই।' বামপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থীদের প্ররোচনায় হাজারখানেক মহিলা পাশ্চাত্য পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এর কয়েক দিন পরে দু'লক্ষ মহিলা হিজাব পরিহিত অবস্থায় হিজাবের সপক্ষে মিছিল বের করে ইসলামের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের এই ষড়যন্ত্রকে গুঁড়িয়ে দেয়। আসলে ইরানে ইসলামী বিপ্লবকে তার চুড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। ১৯৭৮ সালে ৮ সেপ্টেম্বর ব্লাক ফ্রাইডে অর্থাৎ কালো শুক্রবারে তেহরানের রাজপথে গুলী চালিয়ে যে চার হাজার নিরস্ত্র জনতাকে হত্যা করা হয়, তার মধ্যে ৬শ' জনই ছিলেন মহিলা। এত বড় কোরবানী দুনিয়ার কোন বিপ্লবে মহিলারা দিয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

মেয়েদের হিজাবে উদ্বুদ্ধ করে ইরান সরকার তাদের দায়িত্ব শেষ করে দিয়েছে এমন নয়। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তার এবং আর্থিক ও সামাজিক অধিকার সংরক্ষণের আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে। মেয়েদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এমনকি সামরিক ট্রেনিংও দেয়া হচ্ছে হাজার হাজার মেয়েকে। সেদিনের অবলা মেয়ে, তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারকদের ক্রীড়নক অসহায় মেয়েরা কাঁধে বন্ধুক নিয়ে ইসলামী বিপ্লব ও জাতীয় ইজ্জত আযাদীর অতন্দ্র প্রহরীতে পরিণত হয়েছে। তেহরানের মেয়েদের শালীন অথচ দৃপ্ত পদচারণা আমি অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি আর ভেবেছি, কি এক যাদুর স্পর্শে সমগ্র ইরানের ঘরে বাইরে একইভাবে এমন একটা বিপ্লব সংঘটিত হল।

ইরানের শিল্পকলা ও সাহিত্য থেকে অপসংস্কৃতিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেয়া হয়েছে। ইসলামী ভাবধারায় অবগাহন করে সঙ্গীত এখন ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে ব্যপ্ত হয়েছে। 'তুমি'র ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বেরিয়ে জাতীয় সত্তায় বিলীন হয়েছে। ভোগ বিলাসের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। ইরানের চলচ্চিত্র নতুন জগতে প্রবেশ করেছে। ইসলামের স্পর্শে চলচ্চিত্র আজ একটি জাতীয় শক্তি। 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এমন ভোগ-বিলাসী ধারণার অবকাশ ইরানে নেই। আর্টের উদ্দেশ্য- মানুষ গড়ে তোলা। ইকবালের ভাষায়, 'আর্টের লক্ষ্য যদি হয় মানুষ গড়ে তোলা তাহলে এ আর্টই হতে পারে পয়গম্বরীর উত্তরাধিকার।' পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক কবি ইকবালের বাণীই যেন ইরানে বিমূর্ত। ইকবাল আরও বলেছেন- 'শামশিরই সনন আওয়ার তুসই রুবাব আখের।' অর্থাৎ 'তরবারী আর শৌর্যবীর্য একটা জাতির উত্থান এনে দেয় আর সেই জাতির পতনকে ত্বরান্বিত করে উদ্দেশ্যহীন গান বাজনা। ' সম্রাট বাহাদুর শাহের জলসাঘরে যখন গজল আর ঠুংরীর রেওয়াজ হচ্ছে, এস্রাজ আর তানপুরার তারে তরঙ্গ তোলা ভৈরবীর আলাপে হায়দরাবাদের নিযামের দরবার যখন তন্ময়, নবাবরা যখন শরাবে বুঁদ হয়ে মদালস ঢুলু ঢুলু বিরস চোখে সুন্দরী সাকীর দিকে চেয়ে চেয়ে রুবাইয়াতে পাঠ নিচ্ছে, ঠিক সে সময়ই ইংরেজরা সমবেত বুটের আওয়াজ তুলে রাজপথ জনপদ গিরি-কান্তার পেড়িয়ে লাল কেল্লায় করেছে পদাঘাত। তারপর ২শ'বছর জিল্লতির শিকল পরিয়ে রেখেছে উপমহাদেশের মুসরমানদের। আজও তাদের দেয়া অপ-সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত জাতীয় সত্তাকে ধ্বংস করছে। পৃথিবীর একটি মাত্র দেশ ইরান ১৪শ' বছর পর সমস্ত প্রভাব আর চক্রান্তের ব্যুহ ভেদ করে আপন মহিমায় ভাস্বর।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইরান এক অভাবনীয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে আপামর জনসাধারণের জন্য। পাশ্চাত্যের সেবাদাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র উচ্চ শ্রেণীদের জন্য উন্মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে একই শিক্ষাপদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে সব প্রতিষ্ঠানকে। যেকোন শ্রেণীর মানুষের জন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবারিত।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পুঁজিপতিদের আধিপত্য ও আমলাদের আধিপত্য বিলোপ করা হয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। শ্রমিক সাধারণের জীবনের মান পাল্টে গেছে পুরোপুরি। বামপন্থীদের একমাত্র হাতিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ইসলামী বিপ্লবের স্পর্শে পেয়েছে নতুন জীবনের সন্ধান। শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের বেতনের ব্যবধান কমিয়ে ১ঃ ৩ এ সীমাবদ্ধ হয়েছে। এমনকি ৮ ঘন্টা কর্ম সময়ের এক ঘন্টা বরাদ্দ করা হয়েছে শ্রমিকদের জীবনবোধ বিকাশের উদ্দেশ্যে, নৈতিক ট্রেনিং দানের জন্য।

ইরানের কারাগারগুলো এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিণত হয়েছে। বিপথগামীদেরকে এখানে বিভিন্নভাবে পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনার অব্যাহত প্রয়াস আমরা কারাগারগুলোতে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। দেখেছি মুজাহেদীনে খালকের সদস্যদের ও তুদেহ পার্টির তরুণ কর্মীদের ওপর বল প্রয়োগ করে নয় বরং সদাচারের মাধ্যমে এদের মন-মগজে ইসলামী চিন্তা-চেতনা প্রবিষ্ট করানো হচ্ছে। আবেগ আর প্ররোচনার পথ পরিহার করে ক্রমশঃ তারা ইসলামী জীবনবোধের দিকে ফিরে আসছে। বেশ কিছু কারাবাসীদের সাথে আমাদের কথা হয়েছিল, তাদের সবার বক্তব্য ছিল প্রায় একই। তা হল- 'আমরা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছি, পুরান মদের বোতল ভাংতে আমাদের একটুও সংকোচ নেই। বিদেশী আর বিজাতীয় গোলামী আর নয়, বিভ্রান্তির দিন আমাদের শেষ হয়ে গেছে। ইমামের নির্দেশে আমরা জাতীয় স্বার্থে কাজ করে যাব।'

সবচেয়ে বড় কথা, কারাবাসীদের পরিবারবর্গদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও সামাজিক মার্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। অপরাধী পুত্র অথবা স্বামীর কারাদণ্ড হলে সরকারই সেই পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করে থাকে অথবা কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেয়। একটা অপরাধীকে শায়েস্তা করার জন্য পাঁচটা অপরাধীর জন্ম দিতে চায় না ইরান।

ইসলাম ও তাওহীবাদের প্রকৃতিটা সম্ভবত আল্লাহ এমনই করে দিয়েছেন। যখন পৃথিবীর কোন জনগোষ্ঠী তাদের জিন্দেগী এবং তাদের সমাজে একে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে তখনই সে জনগোষ্ঠীকে দুনিয়ার কায়েমী স্বার্থবাদীরা

জোটবদ্ধ হয়ে সর্বাত্মকভাবে উৎখাতের উদ্যোগ নেবে। এমনটি না হলে বুঝতে হবে সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের সত্যিকার প্রাণশক্তি নেই। মৃত লাশকে কেউ আঘাত করে না।

রাসূলে পাক (সাঃ) সেই সমাজেরই শ্রেষ্ঠতম মানুষ হয়ে যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন, হকের এই দাওয়াত কায়েমী স্বার্থবাদীরা কবুল তো করেইনি বরং সম্মিলিতভাবে ইসলামকে অঙ্কুরে বিনাশ করার চেষ্টা করেছে। জন্মভূমি ত্যাগ করে ২৬০ মাইল দূরে মদিনায় হিজরত করেও ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পাননি তিনি।

স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে একই সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। বিজয় ছিনিয়ে আনতে ৭০ হাজার মানুষকে দিতে হল আত্মাহুতি, লক্ষাধিক মানুষ হল ক্ষত বিক্ষত। এরপরও শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠতম বিপ্লব সংকট থেকে নিষ্কৃতি পেল না। দুনিয়ার সবকটি পরাশক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা সুপরিকল্পিতভাবে ইরানের সম্মুখে সংকটের আবর্ত সৃষ্টি করল।

আমেরিকা ও তার দোসররা দুইভাবে তাদের স্বার্থে কাজ করতে শুরু করল। প্রথমত পাশ্চাত্য প্রভাবিত ব্যক্তিত্ব সমূহের ভাবমূর্তি বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল- যেমন ক্ষমতার চাবিকাঠি তাদের অনুচরদের হাতে এসে পড়ে।

আর্ন্তজাতিক প্রচার মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করা হল একই উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী নেতৃবর্গ, যারা অনমনীয় ও আপোষহীন, যাদের বিবেককে কেনা সম্ভব হবে না, তাদের জীবননাশের পরিকল্পনা নেয়া হল। বিপ্লবের মাত্র দু'মাসের মধ্যেই ইসলামী ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম চীফ অব স্টাফ জেনারেল কায়ানীকে খুনীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। ইসলামী চিন্তাবিদ আয়াতুল্লাহ মোতাহারীকে খুন করা হয়। শহীদ হলেন মোফাত্তেহ, কাজী তাবাতাই, ডক্টর বেহশ্তী, রেজাই ও বাহানোর-এর মত প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব। রাতের অন্ধকারে খুন হল বহু বিপ্লবী রক্ষী, তেহরান পরিণত হল সন্ত্রাসবাদের আখড়ায়।

বনীসদর ক্ষমতাসীন হয়ে আমেরিকান নীলনক্সা মত কাজ শুরু করল। সুপরিকল্পিত ভাবে ইমামের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্যোগ নিল। বিপ্লবের ইসলামী চরিত্র হনন করে এতে জাতীয়তাবাদী চরিত্র আরোপের চেষ্টা করা হল। জনগণকে লক্ষ্যচ্যুত করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

সিআইএর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চক্রান্ত উপলব্ধি করতে ইরানের বিপ্লবী জনতার বাকি রইলো না। বিপ্লবী ছাত্ররা গোয়েন্দাবৃত্তির আড্ডাখানা তেহরানস্থ আমেরিকান দূতাবাস দখল করল। আমেরিকার জন্য ছিল এটা প্রচণ্ড আঘাত। যুগ যুগ ধরে গোয়েন্দা তৎপরতার দ্বারা বিস্তৃত প্রচারণা চারিয়ে আমেরিকা বিশ্ববাসীর সামনে আরব্য উপন্যাসের দানব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। সেই ভাবমূর্তি ভেঙে পড়ল। যেন হিন্দুশাস্ত্রের বিশ্বসংহারী কালী মূর্তির বিসর্জন হল দূতাবাস দখলের মাধ্যমে। আমেরিকা ইরানের সম্পদ আটক করল। এতেও বরফ গললো না। জিম্মি উদ্ধার ও ইরানের কৌশলগত অবস্থানগুলোতে ধ্বংসাত্মক অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত ষড়যন্ত্র খোদার মেহেরবানীতে তাবাসের মরু বালুকায় সমাধিস্থ হল।

এরপর আমেরিকা মরিয়া হয়ে উঠল। ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার অবস্থান আর দৃশ্যের বাইরে রইল না। একদিকে উপর্যুপরি অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে এবং বনিসদরের কর্মকাণ্ড দিয়ে ধাপে ধাপে গোটা দেশকে অরাজকতার দিকে এবং অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল, অন্যদিকে ইরাককে দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হেনে ইরানকে শায়েস্তা করতে চাইল। ঘরে বাইরে সবখানে সবদিক দিয়ে ইরানকে বিপর্যস্ত করে তুলল আমেরিকা।

আশির সেপ্টেম্বরে ভয়ঙ্কর আক্রমণের মধ্য দিয়ে এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের সূচনা করল ইরাক। বোমা আর গোলার আঘাতে বড় বড় শহরগুলো বিধ্বস্ত হল। কাসরে শিরিন, আবাদান, খুররম শহর, ইলম সালামচে, দেজফুল এবং নাফত শহরের ২০ লাখ মানুষ হল বাস্তুহারা। বিরাট বিরাট দালান গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হল। বোমা ও গোলার আঘাতে ধ্বংসের অবশিষ্টটুকুও অবশিষ্টটুকুও বুলডোজার দিয়ে ধুলিস্যাত করা হল। চেঙ্গিস আর হালাকুর প্রেতাত্মা যেন সাদ্দামের ওপর ভর করল। তাতারী আক্রমণের মুখে যেমন

বাগদাদ জনমানবহীন বিধ্বস্ত নগরীতে পরিণত হয়, সীমান্তের সমৃদ্ধ শহরগুলোতে ইরাক তেমনই নৃশংসতার স্বাক্ষর রাখল। এইসব ধ্বংসস্তূপ আমি ব্যাপকভাবে ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ করেছি।

পাশ্চাত্যের সব কটি পরাশক্তির বিপরীত বলয়ে অবস্থান করেও প্রাচ্যের সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাককে সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করল। মুসলমান হয়েও আমেরিকার ইঙ্গিতে ফাহাদ, হাসান, হোসেন, সাদাত, প্রমুখরা প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করল ইরাককে।

একাশীর ২৮ জুন আমেরিকার চরেরা বোমা মেরে ডঃ বেহেশতীসহ ৭২ জন পার্লামেন্ট সদস্যকে একইদিনে একই জায়গায় শহীদ করলো। জুমআর নামাজের ইমাম আয়াতুল্লাহ মাদানী, আয়াতুল্লাহ যাদুকী, আয়াতুল্লাহ দস্তগীর, আয়াতুল্লাহ ইস্পাহানী সহ অগণিত দেশপ্রেমিক দ্বীনি আলেম ও গণনেতাদের হত্যা করা হল। শহিদী রক্তে সঞ্জীবিত হয়ে গর্জে উঠল সমগ্র জাতি। আমেরিকার দালাল বনিসদরকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হল। যুদ্ধের গতি পাল্টে গেল। প্রতিঘাতের সম্মুখীন হল ইরাকের আগ্রাসী বাহিনী। ইসলামের সৈনিকরা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল ইরাকের মাটিতে। কুচক্রীরা তখন শান্তির সপক্ষে যুদ্ধবিরতির জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার মাধ্যমসমূহ, যারা এতদিন আগ্রাসনের সপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিল। তাদের কণ্ঠে শোনা গেল নতুন গান। আশির ১৩ জানুয়ারী দি টাইমসের সম্পাদকীয়তে লেখা হল-

Never invade a revolution. (বিপ্লবকে আঘাত করো না)

একই সম্পাদকীয়তে বলা হল-

Unexpected resistance offeredby the Iranian in the face of Iraqi armoured advances. (ইরাকী গোলন্দাজের আক্রমণের মুখে ইরানের প্রতিরোধ অপ্রত্যাশিত।)

ইরানে আমরা সপ্তাদুয়েক অবস্থান করেছি। এ সময়গুলোতে মনে হয়েছে আমি আত্মীয় পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেছি আমার আপন গৃহে। ইরানের

মানুষগুলোকে মনে হয়েছে আমার আত্মার আত্মীয়। মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি ২ হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত এই দেশটিতে আমি একজন অতিথি। এখানে সম্পন্দিত হতে দেখেছি আমার আত্মার প্রতিধ্বনি, দেখেছি আমার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নের বিমূর্ত প্রকাশ। কত সৌভাগ্যবান এদেশের মানুষ। এদের জীবন, এদের মুত্যু, এদের সংগ্রাম, এদের সাধনা এক মহান লক্ষ্যে আবর্তিত হচ্ছে। এখানে এই মাটিতে মরণেও সুখ, বেঁচে থাকায় নিবিড় প্রশান্তি, সংগ্রামে অপূর্ব শিহরণ। আমার মনে হয়েছে- আমৃত্যু এখানে যদি থাকতে পারতাম। কিন্তু আজকেই ইরানে আমার অবস্থানের শেষ দিন আগামীকাল ২২ আগস্ট ১৯৮২ স্বদেশের উদ্দেশ্যে বিমানে চাপতে হবে।

আবার ভাল করে দেখার ইচ্ছা জাগলো। শেষ বারের মত দেখার ইচ্ছা হল এদেশের স্বাধীন মানুষগুলোর দৃপ্ত পদচারণা। পথে নামলাম। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে হাঁটছি। শোহাদা স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছি। দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো ইমামের প্রতিচ্ছবি। কত বিচিত্র শৈল্পিক আখরে পুরিপূর্ণ হয়ে আছে দেয়ালগুলো। ইংরেজী ফারসীতে লেখা অজস্র শ্লোগান। আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাহু ছাড়াও অজস্র কোরআনের উদ্ধৃতি, যেদিকে তাকাই সেদিকে চোখ পড়ে। ইংরেজীতে লেখা Neither East nor West, Islam is the best. এ শুধু দেয়ালের লিখন নয়। দুই পরাশক্তিকে ইরানীরা দুই কনুইয়ের গুতোয় দুই প্রান্তে সরিয়ে রেখেছে। ঐশী নির্দেশকেই তারা মনে করে তাদের একমাত্র পথ। ইতিহাসের গতিধারায় মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক পথ পরিক্রম করে ইসলাম আজকের ইরানে যেন সেনথিসিসের অনিবার্য পরিণতি হয়ে এসেছে। দান্দ্বিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে তো এটা এমনিতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদ থিসিস, সমাজতন্ত্র এন্টিথিসিস, ইসলাম সেনথিসিস। যে কোন বিছার বিশ্লেষণে ইসলাম একটি তৃতীয় স্রোত, আল কোরআনের ভাষায় মধ্যপথ।

একটা দেয়ালের লিখন চোখে পড়ল। ইরানের বিপ্লবী জনতার এই লিখন সমাজতন্ত্রের আবেগে তাড়িত দুনিয়ার নিগৃহীত মানুষের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট। জুলুম নিপীড়ন শোষণ বঞ্চনা অবসানের সমাজতন্ত্রের একচেটিয়া ইজারাদারীর বিরুদ্ধে এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ বলতে হয়। দেয়ালে লেখা ছিল-

Mr. Marks, Is religion opium of the society? Arise and see, the religion has created a revolution, not economic forces.
(মিঃ মার্কস, ধর্ম কি সত্যি আফিম! ওঠো, উঠে দেখ, অর্থনৈতিক শক্তি নয়, ধর্মই সৃষ্টি করেছে একটি বিপ্লব)
আমি পড়লাম। বার বার পড়লাম। মনে হল আমার দেশের বিপ্লবী তরুণদের জন্য অনেক কিছু পেয়ে গেছি। এক নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। আগামী কাল ঢাকায় ফিরে যাব।

নয়

'দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে।' এ শুধু জাতীয় কবি কাজী নজরুলের স্বপ্ন নয়। এ স্বপ্ন বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলমানের প্রাণের অভিব্যক্তি। বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলমানের আবেগ বিদ্ধৃত হয়েছে কাজী কবির সেই মরমী গানের প্রথম কলিতে কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে জোটে। আজন্ম লালিল এ স্বপ্ন ছিল আমার, মার ইচ্ছে ছিল, আমি জেল থেকে বেরুলে আমাকে নিয়ে হজ্জে যাবে। রাসূলের দেশে। রাসূলে পাকের (সাঃ) পদচারণায় পবিত্র মাটির সাহচর্যে হাবীবে খোদার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্জাত নির্মল হাওয়ার সংস্পর্শে সেই আরাফাত, সেই খানা-এ-কাবা, সেই রওজা মোবারক, সেই মসজিদে নববীতে আমাকে নিয়ে মায়ের ঘুরার কত যে সাধ ছিল সে আমি জানি। সেই অপূর্ণ সাধ বুকে নিয়ে মা আমার চির নিদ্রার কোলে ঘুমিয়ে গেছেন। মা ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু মায়ের সেই স্বপ্ন, সেই সাধ আমার মধ্যে প্রবাহিত রেখেছেন। বাইরে এসে মুক্ত আলো বাতাসেও মায়ের সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, অপূর্ণ সাধকে ঘুমাতে দিইনি। সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলাম।

ইতোমধ্যে ইরান সফর শেষ হয়েছে। রক্ত আর আগুনের তুফান বছরের পর বছর বয়ে চলেছে যে মাটিতে। সেই শহীদী খুন আর খাকের ছোঁয়া নিয়ে আমার সংগ্রামী চেতনাকে শানিত করে এসেছি। এখন রাসূলের দেশের উত্তপ্ত বালুকায় দাঁড়িয়ে লু হাওয়ার আগুনে জ্বলে পুরে খাঁটি হতে চাই, নিখাদ করতে চাই আমার প্রত্যয়কে। এর জন্য দিন রাত আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছি। আল্লাহর রাস্তায় চলা মুসাফিরের নিজের ইচ্ছা বলে তো কিছু থাকতে নেই। ৪০ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত একজন কয়েদীর ১০ বছরের মধ্যেই খালাস হলাম, সেওতো আল্লাহর ইচ্ছা। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে আমার মালিকের সাথে আমি একাকার হয়ে গেছি। তাঁর ইচ্ছার কাছে সমর্পিত করেছি নিজেকে। আমার মায়ের অন্তিম ইচ্ছা এই হজ্জ পালনের সুযোগ তিনিই আমাকে করে দিয়েছেন। নিয়মনীতির বেড়া ডিঙিয়ে হজ্জের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে। এক পা এক পা করে সেই দিনটিও এসে উপস্থিত।

বিরাশি ১৪ অক্টোবর। তখন রাত। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ আগে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উপস্থিত হলাম। আমি ও কাজী আজিজুল হক ভাই, বিশেষজ্ঞ ডাঃ মঞ্জুর মোর্শেদ ভাইয়ের সহযোগিতায়। আলোয় ঝলমল চারিদিক। একটা জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার রমণীর মেকআপ করা মুখ যেন এই ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। মনে হল, দারিদ্র-স্পর্শতায় বিবর্ণ, বিবস্ত্র রমণীর মুখাবয়বে বেনারসীর ঘোমটা। গোটা দেশে অন্ধকারের অমানিশা আর এখানে আলোর বন্যা। মনে হল জীর্ণ দেহটার সমস্ত রক্ত সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে এনে সমস্ত মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কি বিচিত্র এদেশ সেলুকাস! 'নিরানব্বাই'-এর ঘাড়ে পা রেখে 'এক' এমনি করে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত আর কতদিন দাঁড়িয়ে থাকবে?

মঞ্জুর ভাই যিনি এই শীতের রাতে কষ্ট স্বীকার করে বিমান বন্দরে আমাদের নিয়ে এলেন এবং আমাদের বিমান আকাশে পাখা মেলার পরেও আজকের রাতটা বিমান বন্দরেই তাকে কাটাতে হবে। এই মঞ্জুর মুরশেদ ভাই তার প্রাইভেট কারে বসে কথা বলতে গিয়ে একসময় আমাকে জানিয়েছিলেন তার জীবনের সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা। মঞ্জুর ভাই পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য হিসেবে ঢাকা কলেজে কাজী আজিজুল হক ভাইয়ের নেতৃত্বে কাজ করতেন। মেধাবী ত্যাগী সদালাপি প্রশান্ত-চিত্ত মিষ্টিভাষী সাহসী কর্মী হিসেবে ৬০'র দশকে তার সুখ্যাতি ছিল। হামিদুর রহমান তথাকথিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে আজিজ ভাইয়ের সাথে তিনিও কারাবরণ করেন। '৭১ সালে জাতীয় যুগসন্ধিক্ষণে ব্লাক ১৬ ডিসেম্বরের পর তার প্রতিবেশী তাকে মুক্তিফৌজের হাতে ধরিয়ে দেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকে অত্যন্ত অশালীনভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হচ্ছিল। এই দুর্যোগপূর্ণ সংকটময় মুহূর্তে তিনি দৃঢ়তার সাথে তার ভূমিকা যে সঠিক ছিল সে কথা ব্যক্ত করতে ভুলেননি। তিনি এও বলেন যে, 'ঈমানী দায়িত্ব মনে করেই আমরা দেশ ও জাতির আদর্শ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এই কাজ করেছি। আমাদের ভূমিকা ছিল নিখাদ দেশপ্রেম থেকেই উৎসারিত। আপনাদের সাথে আমাদের পার্থক্য শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির।' এভাবে মঞ্জুর ভাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কোন রকম জড়তাও রাখঢাক না রেখে যথার্থ জবাব

দিয়েছিলেন। তাকে আলবদর কমান্ডার হিসেবে পৃথকভাবে রাখা হয় কিন্তু আল্লাহর কুদরতি রহমতে তিনি সেখান থেকে অলৌকিকভাবে সাধারণ বন্দীদের সাথে মিশে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। বর্তমানে তিনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে দেশে-বিদেশে সুখ্যাতির সাথে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

রাত ১০টায় বাংলাদেশ বিমানের এক বোয়িং এ আমরা পা রাখলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে বাতাসে ভর দিয়ে বিমান প্রচণ্ড বেগে উড়ে চলল। ভোর হয় হয়। সূর্যটা তখনও উঠেনি। ঘোষণা-শুনলাম-'কিছুক্ষণের মধ্যে বিমান জেদ্দার মাটি স্পর্শ করবে। যে যার সিটের বেল্ট বেঁধে নিল। আমি ইচ্ছে করেই বাঁধলাম না।' কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। বুঝলাম বোয়িংটি মাটি স্পর্শ করেছে। আজিজ ভাই বললেন- এসে গেছি। পা পা করে দরজার কাছে এগিয়ে চললাম। নেমেই বিমান বন্দরের গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ীটি নিয়ে এল আমাদের গন্তব্যের দোর গোড়ায়। কাস্টমস ও অন্যান্য অফিসার আমাদের মালামাল চেক করলেন। চেক করলেন কাগজপত্র। অনেক বৃদ্ধ আর প্রৌঢ়দের মধ্যে সউদী অফিসাররা সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তাদের ব্যবহারে শালীনতা ও সভ্যতার অভাব দেখলাম। হতে পারে, আমরা তাদের দৃষ্টিতে মিসকিন দেশের মানুষ বলে আমাদের প্রতি তাদের আচরণ এমনটি। তাছাড়া এরা দেখেছে আমাদের নেতৃবৃন্দকে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তাদের শাহী দরবারে ধর্ণা দিতে। এরপরে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অসৌজন্যমূলক আচরণ যদি করে থাকে তাতে ওদের দোষ খুব একটা দেয়া যায় না।

বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে আমরা মক্কার উদ্দেশ্যে একটা গাড়ীতে উঠলাম। প্রশস্ত আর মৃসণ পথ। প্রচণ্ড গতিতে গাড়ী এগিয়ে চলছে। কিন্তু ঝাঁকুনির লেশমাত্র নেই। দু'পাশে সবুজের সমারোহ। আমাদের দেশের মত অকৃত্রিম প্রকৃতির অবিন্যস্ত সৌন্দর্য নেই। ধনকুবেরী শাহী খেয়ালে পরিকল্পিতিভাবে সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে গাছগুলো লাগান হয়েছে। গাড়ী এগিয়ে চলছে। সিনেমার পর্দার মত পারিপার্শিক দৃশ্যগুলো অত্যন্ত দ্রুত পিছু হটছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মরুভূমির শূন্যতা আর মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত মরুদ্যান চোখে পড়ল। ঘরির দিকে তাকালাম ঘন্টা পেড়িয়ে গেছে সামনে ছোট ছোট পাহাড়, পাহাড়গুলো যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে। এক সময় আমাদের গাড়ী পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথে এসে পড়ল। এবার দু'পাশে পাহাড়। পাহাড়গুলোতে ঘড় বাড়ী। প্রাচীনত্বের কোন ছাপ নেই, নতুন নতুন ডিজাইনে এগুলো তৈরী। মক্কা শহরে এসে পড়লাম। মনটা অনাবিল পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

গাড়ী খানা-এ-কাবার কাছাকাছি এসে থামল। আমরা সকলে খানা-এ-খাবার চত্বরে প্রবেশ করলাম। তওয়াফ শেষে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মিম্বর সামনে রেখে দু'রাকাত নামাজ পড়লাম। এই মিম্বারে দাঁড়িয়ে তিনি খানা-এ-কাবার নির্মাণ কাজে তদারকী করতেন।

কোন পরিচিত মুখ চোখে পড়ে কিনা এমন উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা খানা-এ-কাবার আশেপাশে ঘুরাফিরা করছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মালেক ভাইকে আমার চোখে পড়ল। কোন এক সময় তিনি ছাত্রশিবিরের কর্মী ছিলেন, এখন জামায়াতে ইসলামীর সদস্য। কারাগারে থাকা অবস্থায় মাঝে মাঝে তিনি আমার সাথে দেখা করতেন। মালেক ভাই আমাকে নিয়ে শহীদ ভাইয়ের বাসায় গেলেন। শহীদ ভাই মক্কা মোয়াজ্জেমায় অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বিশেষ প্রতিনিধি। সউদী আরবে কর্মরত জামায়াত সমর্থকদের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা তার কাজ। শহীদ ভাই আলবদর ছিলেন। ঢাকা কারাগারে তার সাথে আমার সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। তিনি আমাকে দেখে বিস্মিত হলেন। আমার উপস্থিতি অবিশ্বাস্য ঠেকছিল তার কাছে। কেননা ১০ বছরের মধ্যেই আমি ছাড়া পাব এমন ধারণা তার ছিল না। আমাকে পেয়েই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর জানতে চাইলেন আমার মুক্তির ইতিবৃত্ত। খুলে বললাম। সংগঠনের সাথে সম্পর্কের কথা জানতে চাইলেন। তাও বললাম। কিন্তু আমার উত্তর শুনে আমাকে মুরতাদ ভাবলেন কিনা জানিনা তবে খুশী যে হতে পারলেন না, বুঝা গেল স্পষ্ট। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন- আমরা আপনার কাছে এমন কিছু আশা করিনি, সংগঠনের অগ্রগামী ভূমিকায় আপনাকে দেখতে চেয়েছিলাম।

বললাম- আমিও এমন প্রত্যাশা নিয়ে জেলখানায় মুক্তির প্রহর গুনেছি। কারা প্রকোষ্ঠে থেকেও আমি জামায়াতের দাওয়াত দিয়েছি। তরবিয়তী প্রোগ্রাম চালু রেখেছি। বাইরে এসে অনেক চেষ্টা করেও এ্যাডজাস্ট করতে পারলাম না। দীর্ঘ দিন ধরে যে বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা অনেক ঝড়-ঝাঁপটার মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছি, সেটাকে বিপ্লবী বিমুখ কোন সংগঠনে জড়িয়ে নষ্ট করতে চাইনি। এটা যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে হয়তো হয়েছে খোদার কাছেই এর জবাবদিহি করব।

শহীদ ভাইরের সাথে কোন উত্তপ্ত আলোচনায় জড়াতে চাইনি। তিনিও প্রসঙ্গটা বেশী দূর গড়াতে চাইলেন না। তিনি আমাদের জন্য মেহেরবানী করে থাকা খাওয়ার আয়োজন করে দিলেন। যদিও ব্যয়টা আমাদেরই বহন করতে হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট সৌদী আরবে অবস্থানরত বাঙালীরা আমাদের কাছে আসতে লাগলেন। দেশে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা, জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতি, বিভিন্ন প্রসঙ্গ আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। আমরা জামায়াত বিরোধী কোন মিশন নিয়ে সৌদী আরবে এসেছি এমনটি নয়। অথচ প্রসঙ্গ আসাতে আমাদের অনেক কিছু বলতে হয়েছে। বলতে হয়েছে, ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে প্রকারান্তরে খাটো করার জন্য জামায়াতের সাংগঠনিক তৎপরতার লক্ষ্য কি? সৌদি আরবের মদদকে অব্যাহত রাখার জন্য তথাকথিত ডেজার্ট ডেমোক্র্যাসী নিয়ে মাতামাতি কেন? তরুণদের ক্ষুরধার চেতনাসমূহে মরচে ধরানোর আত্মঘাতী ষড়যন্ত্র কোন লক্ষ্যে? ইসলামের সামগ্রিক আবেদন বাদ দিয়ে পুরান কায়দায় পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নিয়ে রাজনৈতিক চর্চার উদ্দেশ্য কি? আয়েশী জীবন যাপনের জন্য জেহাদের ময়দান ছেড়ে জামায়াতের সংগ্রাম বিমূখ বাণিজ্যিক কর্মসূচীর প্রবণতা কোন দিকে? আমাদের আলাপ আলোচনা বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন জামায়ত সমর্থক ও কর্মীদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

শহীদ ভাই অনুভব করলেন যে আমরা এখানে থাকলে জামায়াতে ইসলামী কর্মীরা তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। হয়তো আগামীতে চাঁদা দেওয়াও বন্ধ হতে পারে। এমন সম্ভাবনা আঁচ করে আমাদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত করার

ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন। অবস্থা দেখে আমার মনে হল যে তিনি আরও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন। পুলিশকে সংবাদ দেয়াও বিচিত্র নয়। শাহী পুলিশেরা বিপ্লবী মানসিকতার বহু লোককে নির্বিচারে খুন করেছে এমন ইতিহাসও আছে। আমি ও আজিজ ভাই পরামর্শ করে সেখান থেকে কেটে পড়লাম।

ইতোমধ্যে ইরানীদের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়ে গেছে। ইসলামের মূল প্রাণশক্তির দিকে বিশ্বের মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্য ইরানীরা লিফলেট ও পোস্টারের মাধ্যমে হাজীদের আহ্বান জানাতেন। এ ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ও তাদের সেবাদাস প্রতিক্রিয়াশীল শাসক চক্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনমত সৃষ্টির জন্য ইরানীরা সক্রিয় ছিল। আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দ্বীনি দায়িত্ব মনে করে তাদের এই মহৎ কাজে শরীক হলাম।

একদিন আমি কিছু লিফলেট নিয়ে বাংলাদেশী হাজীদের মধ্যে বিলি করছি। এমন সময় দেখলাম, কিছু পুলিশ আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। আরও দেখলাম তারা নড়ে চরে উঠল। চারিদিক থেকে পুলিশ আমাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। তাদের গতিবিধির ওপর রয়েছে আমার সতর্ক দৃষ্টি। বেকায়দা অবস্থা আঁচ করে জনতার ভিড়ের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে হারিয়ে গেলাম। তারপর সুযোগ বুঝে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সরে গেলাম অনেক দূরে।

কয়েকদিন পেরিয়ে গেল। আমাদের কি মনে হল, শহীদ ভাইয়ের বাসায় ইচ্ছে করে এলাম। হতে পারে এটা অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া, প্রানের টানও বলা যায়। কেননা এক সময় আমরা পরস্পরের সহযোগী হয়ে একই আন্দোলন এবং অনুভূতির একই স্তরে দাঁড়িয়েছিলাম।

দেখলাম জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলী ও অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাই আসছেন। দেখে খুশিই হলাম। তারাও আকস্মিকভাবে আমাকে খোদ মক্কায় দেখে হতবাক। অবশ্য বিমূঢ় বলা যাবে না। কেননা এখানে আমাদের আসাটা তেমন আহামরি কোন ঘটনা নয়। মোহাম্মদ আলী ভাই বললেন- 'উপরে আসেন।' আমার ওপর তার আদর্শিক দাবী নিয়ে তিনি

হয়তো উপরে আসতে বললেন কিন্তু আমি বড় ভাইয়ের আদেশ মনে করে তাকে অনুসরণ করলাম। সাথে আজিজ ভাইও রয়েছেন।

মোহাম্মদ আলী ভাই আন্তরিকতার সাথে কথা পাড়লেন। বললেন- 'আমরা তো রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর দাওয়াতে এসেছি। পাকিস্তান থেকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মিয়া তোফায়েল আহমদ সাহেবও এসেছেন। কিন্তু আপনারা?' প্রশ্ন রাখলেন তিনি।

বললাম- 'অন্যান্যরা যেমন এসেছেন আমরাও ঠিক তেমনি এসেছি। তবে এই পাঁকে জেহাদের ফরজ এক আধটু আদায় করার চেষ্টা করছি।'

জিজ্ঞেস করলেন- 'তার মানে?'

বললাম- 'ইরান পবিত্র মক্কাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিপ্লবের সপক্ষে যে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে চাইছে আমরা তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশীদার।' মোহাম্মদ আলী ভাই চমকে উঠলেন। উত্তেজিত হয়ে বললেন- 'কি বলতে চাচ্ছেন?'

আমরা সুস্পষ্টভাবে কোন রকম রাখঢাক না করে বললাম, রুশ-মার্কিন-ইসরাইল ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে আমরা কাজ করছি। প্রতিক্রিয়াশীল তাবেদার আরব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও আমরা সোচ্চার। ইসলামের পবিত্র এলাকাসমূহ বিশেষ করে খানা-ই-কাবাকে তাবেদারীর মসিলিপ্ত রাজতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করতে চাই।' আমাদের প্রতিটি শব্দ যেন মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের কলিজায় তীরের মত বিদ্ধ হল। উত্তেজনা তুঙ্গে উঠল। তার মস্তিষ্কে যেন প্রচন্ড ঝড় বয়ে চলেছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন- 'আপনারা জানেন ইরানীরা শিয়া?' বেশ কিছু দুর্বল হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে তার কথার যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। শয়তান কোথায় বাসা বেঁধেছে তার উক্তি থেকে আমরা সুস্পষ্ট বুঝে ফেললাম। কোরআনে বলা হয়েছে- 'শয়তান ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, সম্মুখ থেকে, পেছন থেকে আক্রমণ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে।' বিপ্লব-বিমুখ অলস মস্তিষ্কে শয়তান ডেরা বাঁধবে এটাই তো স্বাভাবিক। এক ভয়াবহ কারবালার পথ অতিক্রম করে,

শত শত বছরের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটানো ইরানের নতুন সূর্যোদয় যাদের চোখে পড়ে না, বুঝতে হবে তারা এখনও কোন শরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। অথচ সুদীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এরাই এক নতুন সূর্যোদয়ের স্বপ্ন দেখে আসছে।

আজিজ ভাই বললেন- 'ইরানীরা শিয়া এটা নতুন কিছু নয়। দুনিয়ার সবাই জানে। ইমাম খোমেনী সুন্নীর দাবী করেছেন এমন ঘটনা আমাদের জানা নেই। তবে আপনাদের এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রশ্ন একটাই, যা খুলেমেলে আপনারা বলছেন না। তা হল- শিয়ারা কোন অধিকারে ১৪শ' বছর পর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করল? সুন্নী রাষ্ট্রসমূহে মদ, জুয়া মেয়েদের বেলেল্লপনা, পুঁজিবাদী শোষণ, সমাজতান্ত্রিক নিপিড়ন কায়েমীভাবে বহাল থাকা সত্ত্বেও আয়াতুল্লাহ খোমেনী এসব উৎখাত করলেন কেন? কে অধিকার দিল তাকে? খাদেমুল হারামাইন সৌদি শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পদলেহন করা সত্ত্বেও মার্কিনীদের ঘাঁটি সমূহ উৎখাত করা হল কেন? এ প্রশ্নগুলোর জবাব সত্যিই কঠিন। কাজগুলো কাফের ছাড়া আর করবে কে?'

আমাদের কথা শুনে মোহাম্মদ আলী ভাই একটু নরম সুরে বললেন- 'ইরানের ইসলামী বিপ্লব নির্ভেজাল ইসলামী বিপ্লব কিনা সেটা সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনও সময় আসেনি, আরও আমাদের পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন।'

বললাম- 'সাম্রাজ্যবাদীর কালো হাত ইরানের কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। আপনারা চাচ্ছেন ইরান বিধ্বস্ত হলে তার ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে যুগের পর যুগ গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নিবেন ইরানী বিপ্লব ইসলামী ছিল কিনা, এইতো! বিপ্লবের ৩ বছর পরও যারা বিপ্লব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না তারা নিজস্ব আন্দোলনকে কোনদিনও তার মঞ্জিলে নিয়ে যেতে পারবে না। তাছাড়া জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ও মূল ব্যক্তিত্ব মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী যখন ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে তার 'হৃদয়ের স্পন্দন' বলে বর্ণনা করেছেন। সে ক্ষেত্রে সেই বিপ্লব সম্বন্ধে আপনাদের অনিহা থেকে কি আঁচ করব আমরা।'

মোহাম্মদ আলী ভাই এবার বলেন- 'শিয়া সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। তাছাড়া ইসলামের নামে কোন কিছু ঘটলে এ নিয়ে আমাদের মাতামাতি করতে হবে এমন কোন কথা নেই। আপনারা যেখানে সহজ উপলব্ধি নিয়ে চিন্তা করবেন, আমাদের সেখানে গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে হবে।'

আমরা বললাম- 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর সতর্কভাবে মন্তব্য করতে হবে এ সত্যটুকু মেনে নিলেও এটা বলতে হয়, ইখওয়ানুল মুসলেমীনের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারে আপনারা যেমন মাতামাতি করেছেন, সেই একই দাবী নিয়ে ইরানীরা আপনাদের নৈতিক সমর্থন আশা করে। কেননা ইসলামের জন্য তাঁদের কোরবানী সবচাইতে বেশী। নির্ভেজালের প্রশ্ন তুলতে পারেন। রাসূলুল্লাহর প্রত্যক্ষ আন্দোলন ছাড়া নির্ভেজালের দাবী আর কেউ করতে পারে না। এমন কি জামায়াতে ইসলামীও প্রশ্নাতীত নয়। আমরা মনে করি, ইসলামের আওয়াজ পৃথিবীর যে প্রান্ত আর যার দ্বারা উত্থিত হোক না কেন, তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিরীক্ষণ করে তাৎক্ষণিকভাবে সমর্থন দেয়া প্রত্যেকটি মুসলমানের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্বনুভূতি যাদের ভেতরে নেই, তাদের সম্বন্ধে এটাই ভাবতে হবে যে, হয় তারা পরিস্থিতি সম্বন্ধে গাফেল নয়তো কোথাও তাদের বিবেক বন্ধক হয়ে আছে। আপনাদের সম্বন্ধে আমরা কোন মন্তব্য রাখতে চাই না। শুধু এটুকু বলতে চাই আমাদের সচেতন বিবেকের উপলব্ধিকে আহত করার চেষ্টা করবেন না। এমন একদিন ছিল, আপনাদের কথায় অন্ধের মত চলেছি। এত ঝড় ঝঞ্ঝা, এত ঘাত-প্রতিঘাত, এত চড়াই উৎড়াইয়ের মধ্যে এগিয়ে আসার পর আজও আপনারা চান আমরা আপনাদেরকে অন্ধের মত অনুসরণ করি। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না। আপনাদেরকেও আমরা বাজিয়ে দেখব আপনারা কতখানি নিখুঁত, কতখানি নির্ভেজাল।

আলোচনা আর বেশী দীর্ঘায়িত করতে চাইলাম না। এতে তিক্ততা বাড়বে বৈ কমবে না। আমরা শেষ করতে চাইলাম। তারাও এমন চাচ্ছিলেন। কোন রকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া সমাপ্তি ঘটল। আলোচনার শুরুতে যে আন্তরিকতা ছিল

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুস্পষ্ট হওয়াতে শেষটায় আর তেমন থাকল না। আমরা ফিরে এলাম আমাদের অবস্থানে।

মক্কায় থাকা অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থে আমাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে হতো। কেননা সাম্রাজ্যবাদী চক্র এখানেও তৎপর। তাবেদার সউদী বাদশাহ তার গোয়েন্দা বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের খুঁজে বের করার জন্য। পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সন্ধানী চোখ থেকে নিজেদের গা বাঁচিয়ে আমরা বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে কাজ করে চলেছি। বাংলাদেশ হাজী সমিতির সভাপতি জনাব কাজী আজিজুল হক ভাই ও সাধারণ সম্পাদক আমি হাজীদের বিভিন্ন শিবির ঘুরে ঘুরে হজ্জের সত্যিকার স্পিরিট এবং এর আন্তর্জাতিক মূল্য বিশ্লেষণ করেছি। বুঝিয়েছি হজ্জ কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা নয়। একে মুলমানদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হিসেবে তুলে ধরেছি। পৃথিবীর মুসলমানদের সমস্যা এখানে উপস্থাপিত হতে হবে।মক্কা মোয়াজ্জমা মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয়। সাম্রাজ্যবাদীদের চাপে কোথাও কোন মুসলমান তার স্বাধীন বক্তব্য রাখতে না পারলেও হজ্জে এসে নির্বিঘেœ দুনিয়ার মুসলমানরা তাদের সমস্যা উপস্থাপন করবে, দুনিয়ার মুসলমানদের সাহায্য কামনা করবে, সমস্ত মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কিন্তু হোয়াইট হাউসের ইঙ্গিতে স্বাঘোষিত খাদেমুল হারামাইনের প্রতিক্রিয়াশীল তাবেদার সউদী শাসকগোষ্ঠী সেটা হতে দিতে চায় না। তার ঝুলির বিড়াল বেরিয়ে আসতে পারে অথবা প্রগতিশীল ইসলামী শক্তিসমূহকে পেছন দিক থেকে আঘাত হানার জন্য জুব্বার ভেতরে লুকান কৃপাণের সন্ধান দুনিয়ার মুসলমানরা পেয়ে যেতে পারে। এমন এক আশঙ্কায় সউদী শাসকেরা শঙ্কিত। এই আশঙ্কা ছিল আবু লাহাব, আবু জেহেলের। ইসলামের বিজয় সূচিত হলে তাদের কায়েমী স্বার্থ ও কর্তৃত্বের ভিত উপড়ে যাবে।

যাইহোক, আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে ইরানীদের সাথে যৌথ কর্মসূচী নেয়ার জন্য তাদের সাথে বিভিন্ন গোপন বৈঠক মিলিত হচ্ছি। একদিন সিদ্ধান্ত নেয়া হল আগামীকাল একটা মিছিল বের করা হবে। কথা হল- যেখানে প্রায় ১০টা রাস্তা এসে মিশেছে সেখান থেকে নির্দিষ্ট সময়ে

একটি মিছিল পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে মক্কা মোয়াজ্জমার প্রধান সড়ক পরিক্রম করবে এবং হেরেম শরীফে নামাজ আদায় করবে। কিন্তু হাজার হাজার পুলিশের সন্ধানী চোখ এড়িয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল কি করে সম্ভব হবে? কিন্তু সেটাও সম্ভব হল। নির্দেশ ছিল- আশে পাশে বিভিন্ন কাজের অছিলায় সবাইকে অবস্থান করতে হবে। মিছিল শুরু হওয়ার ৫ মিনিট আগে বিদ্যুৎগতিতে সমবেত হতে হবে ঐ মোড়ে এবং তাৎক্ষণিকভাবে মিছিল এগিয়ে যাবে। যেই কথা কাজও ঠিক তেমনি হল। মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষ জমে গেল। মিছিল এগিয়ে চলছে। পুলিশ কিছু বুঝবার আগেই মিছিল গতি পেয়ে গেছে। লক্ষ জনতার ঢল। এ ঢল 'রুখবি কি দিয়া বালির বাঁধ।'

গতি রুখা সম্ভব হল না। মিছিল এগিয়ে চলছে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর বিভিন্ন প্রস্তুতি ছিল। ছাদের উপর ইট পাটকেল নিয়ে সাদা পোষাকে পুলিশ বাহিনী তৈরী ছিল। তৈরী ছিল গরম পানির গাড়ী। রাবার বুলেট নিক্ষেপ করার জন্য পুলিশেরাও ছিল প্রস্তুত। মিছিল এগিয়ে চলছে, একযোগে হামলা শুরু হল। রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হল শত শত মানুষ। ইরানী স্বেচ্ছাসেবীদের একটি দল শুধুমাত্র আহতদের হাসপাতলে পৌঁছানোর জন্য নিয়োজিত ছিল। তারা বিদ্যুৎবেগে তাদের কাজ করে চলেছে। পুলিশের বিরাট বিরাট দল মাঝে মাঝে আকস্মিক বেষ্টন দিয়ে গ্রেফতার করেছে মিছিলকারীদের কিছু কিছু লোককে। কিন্তু তবু মিছিলের গতি অনিরুদ্ধ। মিছিল এগিয়ে চলছে। আমাকে পুলিশ বেষ্টন করল। তাদের এক কথা হিন্দ হিন্দ' অর্থাৎ আমি হিন্দুস্তানী। আমার পোষাক আশাক থেকে তারা এমন আন্দাজ করেছিল। আমার পরনে ছিল আলীগড়ি পায়জামা আর পাঞ্জাবী। আমরা পুরোপুরি পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে, পালানোর কোন পথ নেই।

হঠাৎ দেখলাম, মিছিলের হাজার হাজার মানুষ পুলিশদের ঘেরাও করে ফেলেছে। টানা-হেঁচড়া আর হাতাহাতি চলছে। এক ফাঁকে আমি কেটে পড়লাম। ইরানীরা পুলিশের হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য এমনটি করেছে বলে আমার মনে হল। মক্কা নগরী শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠল। মিছিল এগিয়ে

চলছে। এ যেন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সেই মক্কা বিজয়ের দিন। সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী মিছিল হেরম শরীফে এসে শেষ হল।

আমরা সবাই আরাফাতে রওয়ান হলাম। হেঁটেই চলেছি। পায়ে হেঁটে ১ ঘণ্টায় পৌঁছান যায়। পাহাড়ের পথ কেটে কেটে রাস্তা তৈরী হয়েছে। দুনিয়ার মুসলিম এক জামায়াতে নামাজ আদায় করলাম। দুনিয়ার সাদা-কালো, আমীর-গরীব, বাদশাহ ফকীর আরাফাতের উন্মুক্ত অঙ্গনে এসে একাকার ইসলামের সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের সুমহান আবেদন এখানে মুর্তিমান হয়ে উঠেছে। উন্মুক্ত আকাশের নিচে উত্তপ্ত রোদের প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও যোহর আছরের নামাজ আদায় করলাম। আমরা মুজদালেফায় মাগরিব এশা এক সাথে আদায়ের পর সেখানে কি এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করলাম। সেটা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই।

মিনায় এসে নজরুলের একটি কবিতার প্রথম চরণ মনে পড়ল- 'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।' কোরবানীর এত বিপুল আয়োজন কেন? কেন লক্ষ লক্ষ পশুকে মিনার ময়দানে জবেহ করা হয়? শুধুমাত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সুন্নতকে সমুন্নত রাখার জন্য? না, তা নয়। খোদার সন্তুষ্টির জন্য কোরবানী দেয়ার এক মানসিক প্রস্তুতি। এখানকার পশু কোরবানী একটা প্রতীক মাত্র। এ কোরবানীর অর্থ খোদার দরবারে পুনরায় অঙ্গীকার করা যে, মওলা আমরা প্রস্তুত, তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমরা প্রস্তুত।

'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ।' উন্মুক্ত আকাশের নিচে সারারাতবর নৈশ্য এবাদত যেন আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড়গুলো ঘুমিয়ে আছে। পাহাড়ের পর পাহাড়। ছোট বড় পাহাড়ের বিচিত্র সমাবেশ এখানে। মানুষ স্বাধীনভাবে যে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান নিয়ে নৈশ্য এবাদতে মশগুল হয়ে গেছে। আকাশে লক্ষ লক্ষ তারকা যেন পর্যবেক্ষকের মত পাহারা দিচ্ছে। রাতের প্রত্যেকটি মানুষের এবাদত বন্দেগীর এক একটি সাক্ষী যেন ওরা এত বিরাট গণসমাবেশ অথচ নিঃশব্দ চারিদিক। নৈসর্গিক পরিবেশে সারারাত এবাদত করলাম। প্রাণভরে ডাকলাম আমার প্রভু, আমার মওলা, আমার মালিককে।

মুজদালেফা থেকে মিনা। মিনা থেকে মক্কায়, তারপর মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। দু'পাশে বালি আর বালির সমুদ্র। পাড়ি দিচ্ছি আমরা। আজ থেকে ৫০ বছর আগে এ দুর্গম মরু পার হত মানুষ উটের পিঠে। তখন কী দুঃসহ ছিল এই পথ-পরিক্রমা। আল্লাহর কাছে আমাদের শুকরিয়া যে তিনি বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখে মানুষের কষ্টকে কত লাঘব করে দিয়েছেন।

ফজরের নামাজ শেষ হলে মিনায় এসে হাজিরা প্রায় প্রত্যেকে কোরবানী দেয়। লক্ষ লক্ষ পশু জবেহ হল এখানে। আজিজ ভাই আর আমি রোজা রেখে কোরবানীর দায়িত্ব এড়িয়ে গেলাম। এখানে হাজার হাজার টন গোশত্ আর লক্ষ লক্ষ পশুর চামড়ার অপচয় দেখে আমাদের খারাপ লেগেছে। মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর পরামর্শে সউদী সরকার গোশত্ সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা নিয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ ব্যাপারে দুনিয়ার মুসলমানদের চিন্তা-ভাবনা করে সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়া উচিত। অবশ্যি পবিত্র মক্কা মদীনার খাদেম কোন এক বিশেষ রাষ্ট্র হলে দুনিয়ার অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব তেমন থাকে না।

যাইহোক আমরা মদীনায় এসে পড়লাম। এসেই গভীর আগ্রহে মসজিদে নববীর দিকে এগুলাম। এই সেই মসজিদ, নবী করীম (সাঃ) এখান থেকেই তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এখান থেকেই সৈন্য পরিচালনা করে সমকালীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ভিত্তি উপড়ে ফেলেছেন। প্রশাসনিক আদেশ-নির্দেশ এখান থেকে দেয়া হত। এখানে বসেই বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সাক্ষাৎকার দিতেন। এখানেই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এ মসজিদ থেকেই পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টেছেন তিনি।

কিন্তু যেদিন মসজিদ থেকে প্রশাসনকে বিচ্ছিন্ন করা হল সেদিন থেকেই অধঃপতিত হল ইনসাফ। একপা একপা করে অধঃপতরেন দিকে এগিয়ে চলল ইসলাম ও মুসলমান! আল্লাহর অনুশাসন বদলে এল ব্যক্তিগত মর্জি আর খোশ-খেয়াল। এক কথায় স্বৈরাচার। ইকবালের ভাষায়- 'জুদা হো দ্বীন সিয়াসাত সে তো রাহযাতী হ্যায় চেঙ্গিজী- দ্বীন থেকে রাজনীতি বিচ্ছিন্ন করলে সেখানে

বিরাজ করে চেঙ্গিসের বর্বরতা। আজকের অধঃপতিত মুসলমানরা চেঙ্গিজের সেই বর্বরোচিত দুঃশাসনে আবর্তিত হচ্ছে। রাজপ্রাসাদ আর রাজকীয় ঐশ্বর্যের ওপর দাঁড়িয়েও আরবের শাসকরা আজ পরাশক্তির কাছে নতজানু।

ধীরে ধীরে মসজিদের দিকে এগিয়ে চলছি। রাসূলেখোদার (সাঃ) পদধুলি নিয়ে যে মসজিদ আর গৌরবের শীর্ষে সেখানে নামাজ পড়ে দোয়া করে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ পাবার গভীর প্রত্যাশায় মনটা উদ্বেল হয়ে আছে। মসজিদে পা রাখছি এমন সময় কানে বাজল অনেক মানুষের করুণ কান্না। গণ-গুঞ্জনের মত কান্না মসজিদের ভেতর থেকে ভেসে আসছে। বিস্ময় আর বিহ্বলতা নিয়ে এগিয়ে চললাম। দেখলাম অনেক মানুষ যাদের অনেকের পা নেই, হাত নেই। অথচ তাদের আদল থেকে ঐশ্বরিক জ্যোতি ঠিক্রে বেরুচ্ছে। ওরা কাঁদছে, ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

দুটো হাত উপরে তুলে প্রার্থনা করছে ওরা। অন্তরে জমাট বাঁধন ব্যথার অশ্রু যেন ইশকের উত্তাপে গলে গলে ঝরছে। ওরা কাঁদছে- ওদের সকরুণ কান্নার উচ্ছ্বাস, ওদের ব্যথা নির্গলিত আবেদন, ওদের অশ্রু নিসিক্ত মিনতি, ওদের বেদনার্থ আহাজারিতে মনে হল একটা ঝড় উঠছে, প্রলয়ঙ্করী ইশকের তুফান। এই তুফানে আশেক আর মাশুক একাকার হয়ে গেছে। মনে হল, আল্লাহর আরশের সাথে এসব নির্যাতিত মানুষের ব্যবধান এক মিলিমিটারও নেই। আমরা অনেক মানুষ, দেশে বিদেশের অনেক মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখছিলাম। অভিভূত হয়ে দেছিলাম। এই অনিন্দ সুন্দর ঐশ্বরিক দৃশ্যটি। হৃদয় বিগলিত উচ্ছ্বাসে আমরাও যেন থরথর করে কাঁপছি। ইশকের মাতম যেন আমাদের ছুঁয়ে গেছে। সবার চোখে বাঁধভাঙা অশ্রু।

এইসব ইরানী যুবক, এক দিকে এদের ত্যাগ আর কোরবানী, অন্যদিকে খোদার প্রতি গভীর আস্থা আর নিবিড় আসক্তি দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। প্রত্যেকটি মানুষের নীরব জিজ্ঞাসা- কি অপরাধ ছিল এসব তুরুণদের? অপরাধ তো একটিই। বাতিল মতবাদকে উৎখাত করে এরা আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল এরা। আরবের আইয়ামে জাহেলিয়াতের ধারক

রাজা বাদশাহ আর আমীর ওমরাহ, ইসলামের দুশমন আমেরিকার ইঙ্গিত সাদ্দামের ওপর ভর করেছে। আরব জাতীয়তার নামে তথাকথিত কাদেশিয়ার নামে ইসলামী ইরানকে আঘাত হেনেছে। ইরানের আবালবৃদ্ধবনিতা আল্লাহর নামে জানবাজি রেখে প্রচণ্ড প্রতিঘাত করেছে। সেইসব রণাঙ্গণে আহত তরুণ এরা। এদের কোরবানী এদের রক্তাক্ত ইতিহাসও একদিন আরবের তরুণদের তৌহীদবাদে উদ্বুদ্ধ করবে। তরুণ প্রাণের তাজা রক্ত পান করেই একদিন জাহেলিয়াত মুক্ত হবে আরব। আমাদের দোয়া, বিশ্ব মুসলমানদের দোয়া, এইসব নির্যাতিত তরুণদের দোয়া থেকে একদিন নিম্নচাপ সৃষ্টি হবে আরব সাগরে। তারপর প্রলয়ঙ্করী প্রচণ্ড ঝড় উঠবে। এরপর মেঘ কেটে যাবে। আকাশ পরিষ্কার হবে। নতুন করে আবারও ইসলামের বিকাশ ঘটবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন- 'আমার মেহরাব ও রওজার মর্ধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের টুকরা বিশেষ।' এই স্থানটিতে নামাজ পড়ার বিশেষ ফজিলত মনে করে বহু হাজী এখানে ভিড় জমায়। আমি ও আজিজ ভাই এখানে সকালে এসে দুপুর পর্যন্ত অবস্থান করি। এখানে নামাজ কালাম ও তসবিহ-তাহলিলের মধ্যে আমাদের সময় অতিবাহিত হয়। খোদার বিশেষ রহমতে আমরা এখানে এতখানি সময় পেয়েছিলাম, যা কোনভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।

মসজিদে নববীর সামন্য দক্ষিণে রওজা শরীফ। এখানে রাসূলে পাক (সাঃ) শায়িত রয়েছেন। তাঁর কবরের পাশে ইসলামের মহান খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ), হজরত ওমর (রাঃ) শায়িত রয়েছে। সমস্ত রওজা শরীফ লৌহপ্রাচীর বেষ্টিত। আমরা অনেক মানুষের ভিড়ে রওজা শরীফের নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করলাম।

এখানে এসে মানুষ আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। আমরা আমাদের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম রাসূলে খোদা (সাঃ) ও নিকটতম সাহাবাদের উদ্দেশ্যে।

মসজিদে নববী থেকে জান্নাতুল বাকীর দূরত্ব মাত্র পোয়া মাইল। ইসলামের আত্মোৎসর্গকারী মহান সৈনিকদের অনেকেই ঘুমিয়ে আছেন এখানে। এখানে

রয়েছে হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত ফাতিমা (রাঃ), ইমাম হাসান (রাঃ), জয়নাল আবেদীন (রাঃ), ইমাম মালেক (রাঃ) প্রমুখ মহান ব্যক্তিত্ব। এখানে শায়িত মহামানবদের উদ্দেশ্যে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদিত হল। আমরা দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলাম।

মদীনা থেকে রওয়ানা হলাম জেদ্দা। আমরা যে গাড়ীতে উঠেছি সে গাড়ীতে আর যারা ছিল এদের সবাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোক। বাহরাইনে কর্মরত রয়েছেন। জেদ্দা পর্যন্ত আমরা একই পথযাত্রী। মনে মনে বললাম, ভালই হল এক সাথে কিছুক্ষণ আলাপ হবে। আজিজ ভাই তাদের কাছে আমার পরিচয় দিলেন আমার ইতিবৃত্ত টেনে। আমার ১০ বছর কারাবাসের ভোগান্তির কথাও বাদ রাখলেন না। এর ফলে তাদের সাথে আমার সম্পর্ক আন্তরিক হয়ে উঠলো। তাদের সদ্ব্যবহার, তাদের অন্তরঙ্গ সংলাপ, তাদের অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ববোধ আমার দারুণ ভাল লাগল। তারা বললেন- তিনি কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি। আমার হিসেবও এই তিনজনের নাম রয়েছে। শীর্ষে মুজিব- ভুট্টো- ইন্দিরা। এই তিন জনের যৌথ কূট- চক্রান্ত পূর্বাঞ্চলের ৮ কোটি মানুষকে টেনে এনেছিল এক ভয়াবহ সংকটের দোড় গোড়ায়। দেখলাম তাদেরও একই অনুভূতি!

মুসলমান রক্তাক্ত হল। দেশ ছিন্নভিন্ন হল, ফায়দা নিল হিন্দুস্তান। ওরা বললেন- 'ফির মিলেঙ্গে হাম দোনো' আমি ভাবলাম- 'সবকুছ্ লুটাকে হুঁসনে আয়াতো কেয়া কেয়া।' মুখে বললাম, 'আপনাদের অনুভূতি আর আমাদের জনগণের অনুভূতি তো একই ছিল ভাই। কিন্তু আমাদের শাসকগোষ্ঠীরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছে, বিভ্রান্ত করেছে আমাদের নেতারা। চটকদার শ্লোগানে আমরা ভূলেছি, ভুল পথে চালিত হয়েছি।'

আরও বললাম- 'আপনারা ভ্রাতৃত্ব বোধ নিয়ে যে একত্রীকরণের চিন্তাভাবনা করছেন সেটা কোন দিনও আর সম্ভব হবে না।' তারা বললেন- 'আগের মত না হলেও অন্তত কনফেডারেশন তো হতে পারে।'

বললাম- 'কনফেডারেশনের স্বপক্ষে হয়তো কোন দিন রায় পাওয়া যেতে পারে। একত্রীকরণের চিন্তাভাবনা একেবারে ভুল। বরং এটাই ভাল আমরা দূর থেকে এক ভাই আর এক ভাইকে সমবেদনা জানাব। প্রয়োজনে সাহায্য করব। কেউ আগ্রাসনের মুখোমুখি হলে আমরা পরস্পরের পাশে দাঁড়াব।

জেদ্দা থেকে ফিরে চললাম আবার মক্কায়। এখন আমাদের ঘরে ফেরার তাগাদা। কাফেলার পর কাফেলা ফিরে যাচ্ছে। জীবনের নতুন দিক- নির্দেশনা নিয়ে ফিরে চলছে তারা আপন গৃহে। হাজীদের উপলব্ধির নতুন ফসলকে কতটুকু কুড়াতে পেরেছে জানিনা। পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতি ও বিষাক্ত চিন্তাধারার প্লাবনে ভেসে যাওয়া পৃথিবীর বিরান ময়দানে হাজীরা তাদের কুড়ানো ফসলের কে কতটুকু ছড়াতে পারবে তাও আন্দাজ করা মুশকিল। কেননা রুশ- আমেরিকা প্রভাবান্বিত প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীরা চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে এমন তো হতে পারে না। তারা গাফেল হলেও সিআইএ কেজিবি গাফেল থাকবে এমতো নয়। হাজীদের নতুন চেতনা নতুন উপলব্ধি প্রতিক্রিয়াশীল চক্ররা কেড়ে নিতে কতক্ষণ! তবু দোয়া করবো আল্লাহর কাছে- 'সবাইকে তোমার দ্বীনের জন্য কাজ করার তওফিক দিও, মালিক।

পরিশিষ্ট- ১

আল বদর একটি নাম। ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী পবিত্র এ নামের সাথে জড়িয়ে আছে একটি প্রতিরোধ যুদ্ধের ইতিহাস। এখন থেকে তিন যুগ আগে একটি বিশেষ সময়ে একটি সম্ভাব্য দুর্গতির প্রেক্ষাপটে একটি বিশেষ কার্যকারণে এই নামের পশ্চাতে সংগঠিত হয়েছিল এদেশের সচেতন দেশপ্রেমিক দায়িত্বশীল তরুণরা। বাংলাদেশোত্তর পরিস্থিতিতে একটি বিশেষ মহল থেকে সময়ে অসময়ে এত বেশী বিষোদগার করা হয়েছে যে সত্যপ্রিয় অনুসন্ধিৎসু অসংখ্য মানুষ আজ সেই অপ-প্রচার বিভ্রান্তি ও ঘৃনার ঘুর্ণাবর্তে খাবি খাচ্ছে। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে সত্যিকার ইতিহাস বিকৃতি ও বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে আজ।

ঐতিহাসিক পটভূমি

আল বদর নামকরণটি উদ্ভুত হয়েছে ১৪০০ বছর আগে মদিনার দোরগোড়ায় বদরপ্রান্তে সংঘটিত হক ও বাতিলের প্রথম সংঘাতের ইতিহাস থেকে। যখন ইসলামের অভ্যুদয় হয় তখন শুধুমাত্র আরবের নয় সমগ্র বিশ্বে বিরাজ করছিল জাহেলিয়াত ও বর্বরতা। সমকালীন রোমান সভ্যতা ও পারস্য সভ্যতার মধ্যে নিহিত ছিল জাহেলিয়াত। সর্বত্র চলছিল নির্মম শোষণ নিদারুণ বঞ্চনা ও জুলুম নির্যাতন। দুই সভ্যতার প্রাচুর্য ও অহংকারের অন্তরালে ছিল শোষিত বঞ্চিত ও দুর্গত মানুষের হাহাকার। আর সমকালীন আরবে বিরাজ করছিল গোত্রীয় বিবাদ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অমূলক-অযৌক্তিক সংঘাত। রক্তপাতই ছিল এখানকার গণমানুষের নিত্যকার কর্ম। অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে নারী সমাজ ছিল অধিকার বঞ্চিত। বিশ্ব মানবতার এই দুঃসময়ে দুর্গতির দিকে ধাবমান মানব সভ্যতাকে শান্তি-শ্বস্তি ও প্রগতির সড়কে ফিরিয়ে আনার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ইসলামের অভুদ্যয় হয়েছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবের মরু প্রান্তরে।

মহান আল্লাহর পরিকল্পনা মত সর্বশেষ রাসূল ও মহানবীর আবির্ভাব হল। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে প্রস্তুত

করা হল সেই মরু প্রান্তরে যেখানে বিরাজ করেছিল (মুস্তাকবেরিন) প্রভূত্বকামী শক্তি এবং মুফসেদিন) ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী শক্তি এই দুই যৌথ অপশক্তির দাপট। অন্যদিকে ছিল ৯০ শতাংশ (মুসতাদাফিন) নির্যাতিত মানুষের আহাযারী আর্তনাদ ও নীরব কান্নার গুমোট। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট সমাজে (সালেহীন) সৎকর্মশীল এবং (মুহসিনীন) নেককার মানুষরা সেখানে ছিল একান্ত অসহায় এবং নীরব দর্শক। তারা প্রভূত্বকামী ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী শক্তির অপকান্ডের সম্মুখে ছিল নিরূপায় ও নিষ্ক্রিয়।

মানবতার এই দুর্দিন ও দুঃসময়ে রাসূল (সা) এলেন এবং সোচ্চার কণ্ঠে বললেন- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নাই কোন মাবুদ, নাই কোন শক্তি আল্লাহ ছাড়া। তার কণ্ঠে উচ্চারিত হল ঐশিবাণী- 'হে আহলে কিতাব এস সেই কথার দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন। তাহলো আল্লাহ ছাড়া যেন আমরা কেউ কারো এবাদাত না করি।' (৩ : ৬৪) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এই একটি মাত্র বাক্যের কারণে কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি নড়ে উঠল এবং উন্মত্ত আক্রোসে ফুঁসে উঠল। অন্যদিকে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর যারা সচেতন তারা সঙ্গোপনে রাসূলের দাওয়াত কবুল করলেন। প্রভূত্বকামী শক্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা সংঘবদ্ধভাবে রাসূলের দাওয়াত কবুলকারী নও-মুসলিমদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। দুঃসহ জুলুম নিপীড়নের মধ্যে ও নও-মুসলিমদের সংখ্যা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। এই সাথে নওমুসলিমদের ওপরও নির্যাতন বৃদ্ধি পেল। এই দুর্বিসহ নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য অনেকেই আশ্রয় নিল আবিসিনিয়ায়। রাসূলের সাথে যারা মাটি আকড়ে পড়ে রইলেন তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হল। গিরি আবর্তে অবরোধ অবস্থায় অমানবিক জীবন-যাপন করতে হল রাসূল (সাঃ) ও তার পরিবার এবং অন্যান্য মুসলমানদের।

এতেও যখন একত্ববাদের আওয়াজ স্তব্দ হলো না তখন রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হল। এই ষড়যন্ত্র পরিকল্পনার চূড়ান্ত মুহূর্তে রাসূল (সাঃ) মহান আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করলেন। মদিনাবাসী রাসূল ও তার সহযোগিদের আশ্রয় দিল। এরপর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা

মুসলমানরা মদিনায় সমবেত হতে থাকে। কিন্তু প্রভূত্বকামী ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী শক্তি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারী মুসলমানদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে মদিনায় যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে। মদিনার মুসলমানরা সুসংহত হওয়ার পূর্বেই আবু জেহেল ও তার সহযোগীদের আক্রমনের শিকার হল। এইসব সংঘবদ্ধ অপশক্তির আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার ৩১৩ জন মুসলমান মদিনার অদূরে বদরপ্রান্তে সমবেত হয়। এখানেই সংঘটিত হয় প্রচন্ড যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রভূত্বকামী শক্তির বিপর্যয় হয় এবং আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে বিজয় হয় মুসলমানদের। এই যুদ্ধই হল ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ। এই কারণেই এই যুদ্ধের স্মৃতি মুসলমানদের জন্য শুকতারার মত দিক-নির্দেশক হয়ে রয়েছে। মূলতঃ আজ অবধি বদর যুদ্ধ মুসলিম দুনিয়ায় প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রেরণা।

মুসলমানরা তাদের দুঃসময়ে অপরাজেয় প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রতীক হিসাবে বদরের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে উদ্দীপ্ত হতে থাকে এবং সেই ইতিহাসের প্রেরণা তারা পূঞ্জীভূত করে তাদের সাংগঠনিক কর্ম চাঞ্চল্য। কাশ্মীর, আফগানিস্তান, সুদান এমনকি ফিলিস্তিন ইসরাইল বিরোধী যুদ্ধে বদর কথাটি তাদের সংগঠনে সন্নিবেশিত করেছে। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের বিপর্যয়ের মুখে যখন পূর্ব পাকিস্তান ঘিরে ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্র এবং দিল্লীর আগ্রাসী তৎপরতা স্পষ্ট, তখন দেশপ্রেমিক সচেতন তরুণরা ইসলামের ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাবে এটাই স্বাভাবিক। আর স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে পূর্বপাকিস্তানে আল বদর সংগঠনটির অভ্যুদয় হয়। সংগঠনটি স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল না-কি ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল এনিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আর এ জন্য পেছনে ফেলে আসা ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাতে হবে।

একাত্তরের ভারতীয় আগ্রাসন কেন?

যারা দেশ শাসন করে তাদের চরিত্রের প্রতিফলন ঘটবে তাদের প্রণীত শাসন কাঠামোতে এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণীতে। এখন বিশ্লেষণ করতে হবে ভারতের

প্রকৃত শাসক কারা তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি? ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্য এবং কেন্দ্রের দিকে তাকালে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাব প্রকৃতপক্ষে ভারত শাসন করছে ব্রাহ্মণরা। ভারতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ রয়েছে ৫ শতাংশ আনুসঙ্গিক অর্থাৎ সহযোগী ব্রাহ্মণ রয়েছে আরো ১০ শতাংশ সর্বমোট ১৫ শতাংশ। এই ১৫ শতাংশ ব্রাহ্মণ ৮৫ শতাংশ জনগণের মাথায় ছড়ি ঘুরিয়ে থাকে। ভারত শাসনে এদেরই প্রাধান্য রয়েছে। ব্রাহ্মণরা বহিরাগত, ভারতের ভূমি সন্তান অথবা আদিবাসী নয়। শ্রী অমিত কুমার লিখেছেন- 'খৃস্টের জন্মের ২ হাজার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় ৪ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কাছে আর্য জাতির এক শাখা পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হয়। তাহাদের পূর্বে এদেশে কোল-ভিল সাওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি এবং দ্রাবিড় নামক প্রধান সু-সভ্য জাতি বাস করিত।'

আধুনিক গবেষণায় এও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ব্রাহ্মণরা ইহুদীদের হারিয়ে যাওয়া একটি দল যারা কালপ্রবাহে ভারতে এসে ঠাই নেয়। শুরুতে এই আর্যদের সাথে ভারতের দ্রাবিড় ও অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যুদ্ধ শুরু হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে তারা এদেশের ভূমি সন্তানদের উপর বিজয়ী হয়। এখানকার উচ্চতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে তারা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে মিশ্র সংস্কৃতিক ধারার সূচনা করে। দীর্ঘ সময় ক্ষমতার রাজদণ্ড কাজে লাগিয়ে তাদের সৃষ্ট মিশ্র সংস্কৃতি সহনশীল করে তোলে। দূর দেশ থেকে ভয় সংকুল পথ অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে সংকটকালীন সময়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখার কৌশল রপ্ত করার ফলে তারা দক্ষতার সাথে দ্রাবিড়দের মুকাবিলাই শুধু করেনি, তাদেরকে প্রভাবিত করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর শীর্ষে তারা অবস্থান নেয় এবং তাদের সৃষ্ট জাতিভেদ প্রথার প্রচলন করে, একটি পিরামিডের সর্বনিম্ন স্তরে ভারতের আদিবাসীদের ঠেলে দেয়।

ভারতের ভূমি সন্তানদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেও তাদের নিবর্তনমূলক রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে জন্ম নেয় বৌদ্ধবাদ। কালক্রমে নিপীড়িত জনগোষ্ঠী বৌদ্ধবাদে

আকৃষ্ট হয়ে উঠলে এক পর্যায়ে বৌদ্ধবাদ প্রবল হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। বৌদ্ধবাদ কেন্দ্রিক নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টির লক্ষ্যে হিন্দুরা চানক্য কৌশল অবলম্বন করে। বৌদ্ধদের মধ্যকার অধৈর্য অর্থাৎ যারা যে কোন মূল্যে তাদের স্বার্থ ও সমৃদ্ধির জন্য মরিয়া এমন লোকদের ছলেবলে কৌশলে উৎকোচ ও অর্থনৈতিক আনুকুল্য দিয়ে বৌদ্ধবাদের চলমান স্রোতের মধ্যে ভিন্ন স্রোতের সৃষ্টি করে- যা কালক্রমে বৌদ্ধদের বিভক্ত করে দেয়। বৌদ্ধবাদকে যারা একনিষ্ঠভাবে আকড়ে থাকে তাদেরকে বলা হত হীনমানব। আর ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের পাকে যারা পা রেখেছিল, যারা তাদের বুদ্ধি পরামর্শ মত কাজ করছিল তাদেরকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ মহামানব বলে অভিহিত করত।এদের কর্মকাণ্ডে ব্রাহ্মণ্য সমাজ মহত্বের প্রলেপ দিয়ে প্রগতিশীল বলে অভিহিত করে, এরাই প্রকৃতপক্ষে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, এরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সমর্থন প্রশংসা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বৌদ্ধ ধর্মের মহান আদর্শ পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজা শুরু করে। এতে বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিমূল নড়ে ওঠে। বৌদ্ধদের এই শ্রেণীকে কাজে লাগিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ভারত ভূমি থেকে প্রথমতঃ নির্ভেজাল বৌদ্ধবাদের উৎখাত করে। যারা একান্তভাবে বৌদ্ধ আদর্শ পরিত্যাগ করে হিন্দু সভ্যতাও সংস্কৃতির মধ্যে তাদের জাতি সত্তাকে বিসর্জন দেয় তারাই টিকে থাকে। এ কারণেই বৌদ্ধবাদীদের সংখ্যা বৌদ্ধবাদের জন্ম ভূমিতে হাতে গোনা।

এই হল ব্রাহ্মণ্যবাদী চরিত্র। এরা দুর্বল ও সবল কোন প্রতিপক্ষকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানে এরা বিশ্বাসী নয়। এখানে একটি জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠেছে। তৎকালীন পূর্ব-পকিস্তানে আল বদর সংঘটিত হওয়ার সাথে ব্রাহ্মণ্য চরিত্রের কোন সম্পৃক্ততা রয়েছে কি, যে কারণে ব্রাহ্মণ্য চরিত্রের অবতারণা প্রয়োজন হল। এর জবাবে বলতে হয় প্রসঙ্গটি যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বৌদ্ধবাদের উৎখাতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ভূমিকা প্রসঙ্গটির মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী চরিত্রের খণ্ডাংশের প্রতিফলন হলেও এতটুকু যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে আরো বিস্তৃত আরো ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনার কারণে সংক্ষিপ্ত কিছু ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের

অবতারণা করা হবে। এর মধ্য দিয়ে আল বদর সংঘটিত হওয়ার কার্যকারণ উপস্থাপিত হবে বলে আমি মনে করি।

উপমহাদেশ থেকে বৌদ্ধবাদের উৎখাতের পর বহিরাগত আর্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এখানকার মূল অধিবাসীদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলেও অপরাজেয় শক্তি হিসাবে মুসলমানদের উপস্থিতি তাদের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দেয়। মুসলমানরা বহিরাগত ব্রাহ্মণ সৃষ্ট বর্ণবাদের শিকার এদেশের সাধারণ মানুষকে মুক্তির নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ করে দেয়। বিধ্বস্ত অবস্থায় ছোট ছোট অবস্থানে হিন্দু শক্তি তার বিক্ষত অস্তিত্ব কোন মতে ধরে রাখলেও বৃহত্তর পরিসরে শেষ পর্যন্ত বাংলাই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির দৃশ্যমান সর্বশেষ দুর্গ। সব শেষে বাংলা থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি উৎখাতের পর তাদের প্রাধান্য বিস্তারে রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। এসত্বেও তাদের পুনরুত্থানের আকাঙ্খা চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হয়নি। সংগ্রাম সংঘাতের মধ্য দিয়ে আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে কয়েক সহস্রাব্দের অভিজ্ঞতা ও কৌশল পূঁজি করে দুর্দমনীয় মুসলিম শক্তি বিনাশের জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। সেই সুযোগটা এসে যায় ইলিয়াস শাহী সালতানাতের মুসলিম শক্তি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতার মধ্য দিয়ে। মোহাম্মদ তুগলকের শাসনামলের শেষ পর্যায়ে উপমহাদেশের মুসলিম শক্তি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে বাংলার ইলিয়াস শাহী সালতানাতকে ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। যুদ্ধ ও অবরোধের মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ইলিয়াস শাহকে বিপর্যস্ত হতে হয়। এই বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে নিজস্ব শক্তি পুনর্গঠন ও সুসংহত করার জন্য সুলতানকে স্থানীয়ভাবে সৈন্য সংগ্রহ করতে হয় হিন্দু জন গোষ্ঠীর মধ্য থেকে। এ কারণে হিন্দু প্রধানদের সদিচ্ছা ও সমর্থনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রীয় নীতি কৌশল পুনর্বিন্যাসে হিন্দু প্রধানদের স্বার্থ বিবেচনায় আনতে হয়।

আর এ সময়ই রাজা গনেশ সুলতানের দরবারে স্থান করে নেয়। শুধু গনেশই নয়, এই সাথে আরো কতিপয় প্রভাবশালী হিন্দু ইলিয়াস শাহের দরবারে সংশ্লিষ্ট হয়। মুহাম্মাদ শাহের পুত্র ফিরোজশাহ তুগলক বাংলা পুণরুদ্ধার প্রয়াসে বিহার আক্রমণ করার ফলে ইলিয়াস শাহ এবং তার পুত্র সিকান্দার শাহ যে

করুণ অবস্থার সম্মুখীন হন সেটা অবলোকন করে রাজা গনেশ তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেন এবং গভীর মনোযোগী হয়ে উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। ফিরোজ শাহ তুগলকের মৃত্যুর পর দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বেশ কটি স্বাধীন সালতানাতের অভ্যুদয় এবং তৈমুর লং কর্তৃক দিল্লী লুণ্ঠনসহ বেশ কিছু ঘটনাপ্রবাহ বাংলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুপ্ত আকাঙ্খা ব্রাহ্মণ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহমান হয়ে উঠে। সালতানাতের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে রাজা গনেশের নেতৃত্বে হিন্দু রাজন্যবর্গ তাদের কুট কৌশল প্রয়োগ করে শাহী দরবারের সভাসদদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের শাসনামলের ঔদার্যের ফলে রাজা গণেশ প্রাধান্যে এসে যান। সুলতানের মৃত্যু অথবা অপমৃত্যুর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সালতানাতের সবচেয়ে বিচক্ষণ মন্ত্রী খানজাহান ইয়াহিয়ার হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার পর ১৪১১-১২ সাল নাগাদ রাজা গনেশ সালতানাতের রাজনীতির পুরো ভাগে এসে পড়েন। ধারণা করা হয় যে, এসব অপমৃত্যু ও হত্যা কাণ্ডের অন্তরালে রাজা গনেশের চক্রান্ত বিদ্যমান ছিল। সাইফ আল দ্বীন হামযার স্বল্পকালীন শাসনামলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে। হামযা শাহকে কোন এক পর্যায়ে রাজা গণেশ ক্ষমতাচ্যুত এবং হত্যা করেন। ইতিপূর্বে রাজা গণেশ হামযা শাহকে নামে মাত্র ক্ষমতাসীন রেখে সমস্ত ক্ষমতা নিজে কুক্ষিগত করে রাখেন। এমন অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে হামযা শাহ এর গোলাম শিহাব সাইফুদ্দিন রাজা গণেশের গভীর ষড়যন্ত্র অনুধাবন করেন এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেন। শিহাব সাইফুদ্দিন রাজা গণেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং রাজাকে সাময়িকভাবে স্তব্দ করে দিতে সক্ষম হন। অতঃপর শিহাব সাইফুদ্দিন বায়জিদ শাহ নাম ধারণ করে ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু বৈদিক চক্রের কাছে অবশেষে তাকে পরাজিত হতে হয়। রাজা গনেশ তাকে ক্ষমতাচ্যুত এবং হত্যা করেন। বায়জীদ-এর সন্তান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ গনেশের অপকর্মের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। ক্ষমতার এই টানাপোড়েন ৪ বছর স্থায়ী হয়। রাজা গনেশের কুট চক্রের কাছে অবশেষে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ পরাস্ত হন এবং তার ভাগ্যে রক্তাক্ত পরিণতি জুটে।

ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে রাজা গনেশ মুসলমানদের উচ্ছেদ করার মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি তাদের প্রতি খড়গ হস্ত হয়ে উঠেন- যারা মোটামুটি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অতি ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে মুসলিম নিধন শুরু করা হয় এবং বহু জ্ঞানী-গুণীদের হত্যা করা হয়। সমকালীন প্রভাবশালী মাশায়েখ শেখ বদরুল ইসলাম এবং তার পুত্র ফাইজুল ইসলাম রাজাকে অভিনন্দন জানাতে অস্বীকার করলে তাদেরকে দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। রাজা গনেশ তার শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করার অপরাধে পিতা পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। একই দিনে রাজার নির্দেশে অসংখ্য গুণী জ্ঞানী মানুষকে নৌকা ভর্তি করে মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। হেমিলটন বুকানন লিখেছেন, নির্যাতন ও নিষ্পেষনের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলার নেতৃস্থানীয়রা শেখের চত্তরে ভিড় জমায়। নূর কুতুবুল আলম দ্বিরুক্তি না করে জৌনপুরের সুলতানের প্রতি বিপর্যস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উদ্ধারের আমন্ত্রণ জানান। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম সসৈন্যে ফিরোজপুর উপকণ্ঠে এসে ডেরা গাড়লেন। রাজা গণেশ মুসলিম সৈন্যদের প্রতিরোধের দুঃসাহস করলেন না। রাজা গনেশ নূর কুতুবুল আলমের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। শেখ বললেন, রাজা গণেশের ইসলাম গ্রহণ ছাড়া জৌনপুরের সেনাবাহিনী প্রত্যাহৃত হবে না। প্রথমত রাজা গণেশ সম্মত হলেও তার স্ত্রীর প্ররোচনায় ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে পিছিয়ে গেলেন। বিনিময়ে তার পুত্র যদুকে ইসলামে দাখিল করলেন। শায়েখ যদুকে ইসলামে দীক্ষিত করে নতুন নাম দিলেন জালাল উদ্দিন। জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে জৌনপুরের সৈন্যরা বাংলা ত্যাগ করে। বাংলা থেকে জৌনপুরের সৈন্য প্রত্যাহারের পর রাজা গনেশ পুনরায় স্বরূপে আবির্ভূত হলেন, নতুন করে শুরু শুরু হল মুসলিম নিপীড়ন। রাজা গনেশ তার ধর্মান্তরিত সন্তান যদুকে ব্রাহ্মণদের পরামর্শে প্রায়শ্চিত্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করানোর উদ্যোগ নেন। তার মুসলিম বিরোধী কর্মকাণ্ড এমনই ভয়ংকর হয়ে উঠে যে নূর কতুবুল আলমের পুত্র শেখ আনোয়ারকে ফাঁসীতে ঝুলানো হয়। এই একই দিনে গনেশ বিরোধী ক্ষোভ তীব্র হয়ে এমন ভয়াবহ রূপ নেয় যে, তাৎক্ষণিক বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়ে গনেশ উল্টে যায়। রাজা গণেশ শুধু উৎখাতই হলেন

না তাকে হত্যা করা হল এবং জালাল উদ্দিন মুহাম্মদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া হল। রাজা গণেশের পুত্র নব দিক্ষীত মুসলমান জালাল উদ্দিন দক্ষ সুলতান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি পুনরায় বাংলার সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন। বাংলার ভিন্নমুখী স্রোত আগের মতই প্রবাহিত হতে শুরু করে।

উপমহাদেশ প্রসঙ্গ

১৫৬২ সালে সম্রাট বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী দখল করেন। দিল্লীতে তখনও তিনি পরিপূর্ণ শিকড় গাড়তে সক্ষম হননি। দিল্লী দখলের ১ বছরের মাথায় রাজপুত নামালব ও মধ্য ভারতের ১২০ জন রাজা মহারাজা সংঘবদ্ধভাবে মুসলিম শক্তি উৎখাতের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাদের ৮০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫শ' রণহস্তী এবং অসংখ্য পদাতিক বাহিনীর মুকাবিলায় বাবরের মাত্র ১০ হাজার সৈন্য মরনপণ লড়াই করে। আগ্রার অদূরে খানুয়ার যুদ্ধে সংঘবদ্ধ হিন্দু শক্তি বিধ্বস্ত হওয়ার পর শক্তি দিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলার উচ্চাশা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মন থেকে উধাও হয়ে যায়।

শেষ অবধি ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও হিন্দু রাজন্যবর্গ সম্মুখ সমর পরিহার করে মুসলমানদের চরিত্র হননের বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই চরিত্র হনন প্রক্রিয়া শুরু হয় হুমায়ুনের শাসন কাল থেকে। হুমায়ুন শের শাহের কাছে পরাজিত হয়ে পলাতক জীবন যাপনকালে হিন্দু রাজা মহারাজাদের সাহচর্যে এবং ইরানে আশ্রিত জীবন যাপন কালে শরাব সাকী এবং হেরেম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তার দিল্লী পুনর্দখলের পর হেরেম জীবনের সুখানুভূতির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। পিতা বাবরের সংগ্রামী জীবনের পথ পরিহার করে অবশেষে হুমায়ুন ভোগ বিলাসী জীবন যাপনের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ে। রাজপুত ও হিন্দু রাজা মহারাজা এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা সে সময় যাবতীয় প্রমোদ উপাচার সুরা এবং নৃত্য গীত পটিয়সী সুন্দরী সরবরাহের যোগানদার হয়ে উঠে। তাদের সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চতুর রমনীরা তাদের সুনিপুণ অভিনয় ও চাতুরী দিয়ে শুধু মুঘল সম্রাটই নয় আমীর ওমরাহদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং পরবর্তীতে মুঘল রাজনীতিকে পঙ্কিলতার আবর্তে নিক্ষেপ করে। অবশেষে হুমায়ুনের মৃত্যু ব্রাহ্মণ্যবাদী কুচক্রীদের জন্য বড় রকমের সুযোগ এনে দেয়। ১৩ বছরের কিশোর

আকবর তখনো যার মধ্যে ভাল মন্দ উপলব্ধি করার শক্তি সুসংহত হয়নি এমন একজন অশিক্ষিত নাবালক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। এই অশিক্ষিত কিশোর সম্রাটকে রাজপুত হেরেম বালারা তাদের রূপ যৌবন ছলাকলা দিয়ে বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে চলে সফলভাবে। হিন্দু দর্শন ও জীবনাচার আকবরের মন মগজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। রাজা মহারাজাদের অনেকেই আকবরের হাতে ভগ্নী ও কন্যা সম্প্রদান করে মুঘল পরিবারে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলে। জয়পুরের রাজা বিহারী মল (মান সিংহের পিতামহ) তার কন্যা জয়পুরী বেগমকে বিয়ে দেন ১৯ বছরের তরুণ সম্রাট আকবরের সাথে। এই আত্মীয়তার সুবাদে পিতা পুত্র এবং পৌত্র যোগ দান করেন আকবরের সেনাপতি পদে। বিকানীর ও জয়সলমীরের রাজারাও আকবরকে কন্যা দান করেন। মানসিংহ তার বোন রেবা রানীকে বিয়ে দেন জ্যেষ্টপুত্র ভাবী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে এবং কন্যাকে বিয়ে দেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ট পুত্র ভাবী সম্রাট খসরুর সাথে। (An Advanced history : Re Mayodan, P-441-43)

উত্তর মধ্য ভারতের অন্যান্য রাজা মহারাজারাও এই মহাজন পন্থা অনুসরণ করে মুঘল যুবরাজ ও ওমরাহদের আত্মীয়ভুক্ত হন। অতঃপর নিকটাত্মীয়ের দাবীতে মুঘল বাহিনীর প্রায় সবগুলো গুরুত্বপুর্ণ সেনাপতির পদ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের করায়ত্ত হয়। তারা সোয়া তিনশত বছর ধরে সারা ভারতে জেঁকে বসা তাদের পুরানো শত্রু তুর্ক আফগান মুসলমানদের নির্মূল করেন মুঘলদের সাথে নিয়ে। রাজ দরবারে ফৈজী, আবুল ফজল প্রমুখ আমীর ওমরাহের প্রতিপক্ষে বীরবল ও টোডরমল হিন্দু সভাসদবর্গ আসন গ্রহণ করে। (ইতিহাসের অন্তরালে ফারুক মাহমুদ, পৃঃ ১৯৭)

জাহাঙ্গীরের সময় নুরজাহান এবং আসফজাহর রাজনৈতিক তৎপরতা এবং শায়েখ আহমদ সরহিন্দের বলিষ্ঠ ভূমিকায় ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের দুর্নিবার অগ্রযাত্রা অনেকখানি ব্যাহত হলেও মুঘল প্রাসাদে আকবরের আমলে যে বিষ বৃক্ষ রোপিত হয়েছিল সেটা ইতিমধ্যে মহীরুহে পরিণত হয়ে গেছে। ভোগ বিলাসী আত্ম সর্বস্ব যুবরাজ ও আমীর ওমরাহ প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও আত্মঘাতী সংঘাতের মধ্য দিয়ে আত্মবিনাশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। এই সুযোগে মুসলিম শক্তিকে উৎখাত করে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে রাজপুত, জাঠ ও শিখ সম্প্রদায়। এর পেছনে সক্রিয় ছিল বর্ণ হিন্দুরা। যে ভাবে বৌদ্ধ

ধর্মালম্বীদেরকে ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল অনুরূপ পন্থায় মুসলিম শক্তিকে উৎখাত করার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'মারাঠারা সমগ্র মধ্য ভারত জয় করে দিল্লী শহর লুণ্ঠন করে। মারাঠা রাজপুত জাঠ শিখদের বিভিন্ন সসস্ত্র বাহিনী, উপবাহিনী সমগ্র মধ্য পশ্চিম ও উত্তর ভারতের মুসলিমদের অসংখ্য মসজিদ ধ্বংস করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং তাদেরকে দলে দলে হত্যা করতে থাকে।' কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুঘলদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। তারা এবং আমীর ওমরাহ সকলে নিজেদের নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে। উপমহাদেশের মুসলমানদের এই নিরূপায় অবস্থায় দিল্লীর মুজাদ্দিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর আহ্বানে আফগান বীর আহমদ শাহ আবদালী পর পর ৯ দফা ভারত আক্রমণ করে মারাঠাদের ঔদ্ধত্য গুড়িয়ে দেন। দিল্লীর সন্নিকটে একটি রণ ক্ষেত্রে ১ লক্ষ মারাঠা সৈন্য প্রাণ হারায়। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাদের মুসলিম বিধ্বংসী তৎপরতা অব্যাহত থাকে। তবে আগের দুর্নিবার গতি অনেকটা হ্রাস পায়। কিন্তু সুবাহ বাংলায় সেই একই তৎপরতা প্রচ্ছন্নভাবে সমান গতিতে এগিয়ে চলে। নবাবদের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের অজ্ঞাতে তাদের উৎখাতের ষড়যন্ত্র ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে। একদিকে পর্যায়ক্রমিক ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্র উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করে, অন্যদিকে 'দক্ষিণের পথ ধরে বর্গী বলে অভিহিত মারাঠা বাহিনী সুবাহ বাংলা অবধি লুটতরাজ চালায়। তাদের শিকার হয়েছিল সুবাহ বাংলার সম্পদশালী মুসলিম পরিবারগুলো।

পলাশী বিপর্যয়ের পশ্চাতে

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সম্মুখ সমর পরিহারের নীতি অবলম্বন করে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তারা অতি ধৈর্য্য সহকারে নেপথ্য ষড়যন্ত্রের পথে এগুতে থাকে। তোষণ ও আনুগত্যের অভিনয় করে এক দিকে যেমন সংশ্লিষ্ট শাসকদের আস্থা অর্জন করে, অন্যদিকে অনুরূপ ষড়যন্ত্রের নিত্য নব নব কৌশল অবলম্বন করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে।

এই কর্ম প্রয়াস শুরু হয় উপমহাদেশের সর্বত্র। যেমন মুর্শিদাবাদে শুরু হয় মুর্শিদকুলিখানের শাসনামলে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি পলাশী ট্রাজেডীর

মূল নায়ক ছিলেন জগৎশেঠ। ইতিহাস বলে মীরজাফর ছিলেন শিখণ্ডী, পুরানের ভাষায় অধৈর্য্য। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রতিপক্ষের প্রভাবশালী অধৈর্য্য ব্যক্তিত্বকে অর্থবিত্ত এবং ক্ষমতায়নে প্রলুব্ধ করে এবং তাকে সামনে রেখে ষড়যন্ত্রকে সর্বব্যাপী করে তুলে।

জগৎশেঠ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হীরানন্দ সাহা। তিনি মারোয়ারের নাগর থেকে পাটনায় এসে সুদের কারবার শুরু করেন। ১৭১১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মানিক চাঁদ সুদের কারবার শুরু করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত মুর্শিদ কুলিখানের আস্থাভাজন হয়ে উঠেন। মুর্শিদ কুলিখান তার দিওয়ানী দপ্তর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করার সাথে সাথে মানিক চাঁদও ১৭১২ সালে মুর্শিদাবাদে এসে পড়েন। একই বছর তিনি নবাব কর্তৃক নগর শেঠ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৭১৪ সালে মানিক চাঁদের মৃত্যু হলে তার ভাগিনা ফতেহ চাঁদ সাহা তার উত্তরাধিকারী হন। মুর্শিদ কুলিখানের সুপারিশে ফতেহ চাঁদ দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক জগৎশেঠ অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হন। তুর্ক আফগান সামন্তদের বিদ্রোহের আশংকায় মুর্শিদ কুলিখান তার কৌশল পরিবর্তন করে বর্ণ হিন্দু রাজা মহারাজাদের অতিরিক্ত সুবিধা দিতে শুরু করেন এবং তাদের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নবাব, মুসলিম মুদ্রা ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ত্যাগে বাধ্য করেন। ডক্টর মোহর আলী লিখেছেন, একচেটিয়া মুদ্রা ব্যবসা ও সরকারী টাকশালে বিদেশী বণিকদের স্বর্ণতাল ও মুদ্রা তৈরীর একচ্ছত্র ক্ষমতা শুধু জগৎশেঠকে প্রদান করা হয়। মুর্শিদকুলি খানের উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার সুজাউদ্দিন ছিলেন ভোগ বিলাসী চরিত্রহীন। অপূত্রক নবাব তার নাতি অর্থাৎ সুজাউদ্দিনের পুত্রকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং দিল্লীস্থ তার প্রতিনিধি বালকিষাণকে বাদশাহর স্বীকৃতি আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। শুরু হয় ষড়যন্ত্র নাটক। নবাবের আস্থাভাজন জগৎশেঠ ফতেহ চাঁদ নবাবের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতি গোপনে সুজাউদ্দিনকে প্ররোচিত করেন এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও সমর্থন দিয়ে সুজাউদ্দিনের প্রত্যাশা ও অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। এমন কি পরবর্তীতে নবাব হিসাবে স্বীকৃতি লাভের ব্যাপারে দিল্লীর দরবারকে প্রভাবিত করেন। নবাব মুর্শিদকুলির নিজের প্রতিনিধি বালকিষাণ বাবু তার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব

গোপন রেখে তার প্রেরিত নজরানা উপঢৌকন ব্যবহার করেই সুজাউদ্দিনের পক্ষে দিল্লীর দরবারে তদবীর করেন এবং মুর্শিদ কুলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুজা উদ্দিনের নামে পরবর্তী নবাবীর সনদ সংগ্রহ করেন। [তারিখে বাংলা পৃঃ ১২৪, উদ্ধৃতি মোহর আলী : হিষ্ট্রি অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল]

মুর্শিদকুলীখানের শয্যা পাশে বসে জগৎশেঠ সুজাউদ্দিনকে মুর্শিদাবাদ আক্রমনের সংকেত পাঠান। সুজাউদ্দিনের সৈন্যরা মুর্শিদাবাদ অবরোধ করে। নবাব পত্নীও তার কন্যা সুজাউদ্দিনের স্ত্রীর হস্তক্ষেপে মনোনীত নবাব সরফরাজ খান পিতা সুজাউদ্দিনকে নবাব হিসাবে মেনে নেন। সুজাউদ্দিন জগৎ শেঠকে তার অতি বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্টজন হিসাবে গণ্য করেন এবং ৪ সদস্য বিশিষ্ট প্রশাসনিক পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

১৭২৭ সালে বিশ্বাসঘাতকতার সাফল্য জগৎশেঠ এবং তার সহযোগীদের অতি উৎসাহী করে তুলে। মুসলিম শাসনকে দুর্বল করে তোলা এবং বৈষয়িক ফায়দা অর্জনের জন্য ব্রাহ্মণ্য চক্র আর এক নতুন খেলা শুরু করে মুর্শিদাবাদের নবাবী নিয়ে। জগৎশেঠ আলম চাঁদ বাবুকে নিয়ে হাজী আহমদ ও আলীবর্দী খানের সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। এদের লক্ষ্য ছিল আলীবর্দীখানকে মুর্শিদাবাদের নবাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। সেটা আলীবর্দীর প্রতি দুর্বলতার কারণে নয়, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সুসংহত মুসলিম শক্তিকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আত্মবিনাশের দিকে ধাবিত করানো এবং সংঘর্ষ, ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের ডামাঢোল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ হাতিয়ে নেয়া।

যাইহোক মুর্শিদাবাদের নবাব সুজাউদ্দিনের যখন মৃত্যু হল সে সময় নাদির শাহ দিল্লী দখল করে নেন এবং সুবাহ বাংলার আনুগত্য ও রাজস্ব দাবী করেন। নাদির শাহ মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট চিঠি লেখেন। নাদির শাহের পত্র পাওয়া মাত্র সরফরাজ খানের অনুমতি নিয়ে ব্যাঙ্কার জগৎশেঠ তাৎক্ষনিকভাবে রাজস্ব পরিশোধ করে দেন। কুচক্রী জগৎশেঠ এবং বাবু আলম চাঁদের পরামর্শে সুজাউদ্দিন অতিরিক্ত আনুগত্য প্রকাশের জন্য নাদির শাহের নামে খুতবা পাঠ করেন এবং মুদ্রা প্রচলন করেন। এটাও ছিল জগৎশেঠ

গংদের ষড়যন্ত্র। ওদিকে কয়েক মাসের মধ্যে নাদির শাহ দিল্লী ত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে মুহাম্মদ শাহ তার সিংহাসনে পুনরারোহন করেন। এই সুযোগে দিল্লীর আনুকুল্য পাবার প্রত্যাশায় জগত শেঠ গোপনে তথ্য প্রমাণ সরবরাহ করে দিল্লীর দরবারকে জানিয়ে দেন যে সরফরাজ খান বিদ্রোহী। (তারিখে বাংলাহ পৃঃ ১৫৫-৫৬) । ব্রাহ্মণ্য চক্র এখানেই থেমে থাকল না। সরফরাজ খানের বদলে আলীবর্দী খানকে বাংলার সুবাদার করার ব্যাপারে দিল্লীর দরবারকে প্রভাবিত করলো। অবশেষে তারা আলীবর্দীর নামে সনদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো। এই বাবু গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের পরামর্শে সরফরাজ খান তার সেনাবাহিনীর অর্ধেক হ্রাস করলেন। ওদিকে ব্যাঙ্কার জগত শেঠ ২৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বর্তমান মুদ্রামানে ৫ শত কোটি টাকা আলীবর্দী খানের নিকট প্রেরণ করেন সুজার বরখাস্তকৃত সৈন্যদের তার সেনা বাহিনীতে নিয়োগ দেয়ার জন্য। অন্যদিকে বিহারের হিন্দু জমিদারদের আলীবর্দী খানকে নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন দানের জন্য প্ররোচিত করেন। আলীবর্দী খানের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে জগৎশেঠ তাকে মুর্শিদাবাদ আক্রমনের আহ্বান জানান।

সামরিক গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ তেলিয়া গিরি অতিক্রম করে আলীবর্দীখানের বাহিনী মুর্শিদাবাদের ২২ মাইল দুরত্বে অবস্থান নেয়। নবাব সরফরাজ খান আকস্মিক অবরোধে কিছুটা বিচলিত হলেও তাৎক্ষনিকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন। এই অবরোধে তার আমাত্যবর্গের যোগ সাজশ সম্পর্কে তার ধারণা বদ্ধমূল হয়। তার সন্দেহ বহুলাংশে সঠিক হলেও পঞ্চম বাহিনীর মূল হোতাকে তিনি চিনতে ভুল করলেন। জগৎশেঠের বদলে তিনি হাজী আহমদকে বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য কারারুদ্ধ করলেন। পঞ্চম বাহিনীর দুই হোতা বাবু আলম চাঁদ ও জগৎশেঠের সাথে সরফরাজ খানের সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়ে উঠল। এই দুই কুচক্রী পরামর্শক হিসাবে সরফরাজ খানের যুদ্ধ যাত্রার সঙ্গী হলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে আলীবর্দী খানের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে উঠল। নিশ্চিত পরাজয় থেকে বাবু আলম চাঁদ আলীবর্দী খানকে উদ্ধার করলেন সরফরাজ খানকে যুদ্ধ মূলতবী ঘোষণার পরামর্শ দিয়ে। যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য বাবু আলম চাঁদ এবং জগৎশেঠ বিভিন্নভাবে যোগসাজশ সলাপরামর্শ

করে এবং সরফরাজ খানের সেনাপতিদেরকে মুচলেকা অর্থ বিত্তের বিনিময়ে পক্ষ ত্যাগে প্রলুব্ধ করে। পরদিন পূর্বাহ্নের যুদ্ধে সরফরাজ খানের বিজয় নিশ্চিত হয়ে উঠলে বাবু আলম চাঁদ তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে মনে করে আত্মহত্যা করলেন। ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক জগৎশেঠ ধরা ছোয়ার বাইরে রয়ে গেলেন শেষ অবধি। এমতাবস্থায় জগৎশেঠ তার নেপথ্য ষড়যন্ত্র আরো জোরদার করলেন। দুপুরের পর যুদ্ধ পরিস্থিতি বদলে গেল। অবশেষে সরফরাজ খান নিহত হলেন। জগৎশেঠ সাদর সম্ভাষন জানিয়ে বিজয়ী আলীবর্দী খানকে রাজধানীর অভিমুখে নিয়ে চললেন। বিশ্বাসঘাতকদের রক্তাক্ত আঙ্গিনা পেরিয়ে আলীবর্দী খান ক্ষমতাসীন হলেন। সম্ভবত সেদিনই সবার অলক্ষ্যে আর এক মর্মান্তিক বিপর্যয়ের ইতিহাস নিয়তির অদৃশ্য কাগজে লেখা হয়েছিল, লেখা হয়েছিল আলীবর্দীর বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাধের অনিবার্য্য পরিণতি হিসেবে।

এরপর জগৎশেঠ মুর্শিদাবাদের দরবারে সবচেয়ে প্রতাপশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। মুসলমানদের চূড়ান্ত বিপর্যয় ডেকে আনার জন্য জগৎশেঠ নতুন প্রেরনায় নবতর চক্রান্ত জাল বিস্তারের জন্য উন্মাতাল হয়ে উঠে।

মুঘলাই সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী বাংলার মুসলিম আমীর ওমরাহ ও উচ্চ শ্রেণী যাবতীয় নৈতিকতা ও সততা বিসর্জন দিয়ে ভ্রাতৃঘাতী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তবে বাংলার জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান থাকার কারণে এবং বাংলার কোন বিশেষ অঞ্চল বর্ণ হিন্দুদের শাসনাধীনে না থাকায় বর্ণবাদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক ভূমিকা নিতে অথবা নেয়াতে সক্ষম হয়নি। এ সত্ত্বেও বাংলার বর্ণ হিন্দুরা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মুসলিম বিরোধী ভূমিকায় পিছিয়ে ছিল না। তারা প্রকাশ্য যুদ্ধ না করলেও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে মুসলমানদের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধনে তৎপর ছিল।

সমস্ত মুসলিম বিরোধী তৎপরতার মূল নায়ক ছিলো জগৎশেঠ। একদিকে যেমন আলীবর্দী খানের উপর ছিল তার প্রভাব অন্যদিকে মুদ্রা ভাংগানী ব্যবসার সূত্রে ইংরেজদের সাথে গড়ে উঠে সখ্যতা। আলীবর্দীখানের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সহযোগী হওয়ার কারণে ঘষেটি বেগমের বিশ্বস্ত প্রাদেশিক দেওয়ান রাজ

বল্লভ এবং বিহারে নিযুক্ত প্রথম গভর্নর জানকী রাম ও পরবর্তী গভর্নর রামনারায়ণের সাথে নবাবের দিওয়ান চিনুরায় বাবু বীরু দত্ত, আলম চাঁদের পুত্র বারারায়ান করাত চাঁদ ও উমিচাঁদের সহযোগিতায় রাজস্বের জামিন ব্যাংকার হিসাবে সারা বাংলার জমিদারদের সাথে ছিল স্বরূপ চাঁদ জগৎশেঠের নিয়মিত যোগাযোগ। সেনাবাহিনীর প্রধান প্রভাবশালী সৈন্যাধক্ষ, রায় দুর্লভ, রাম বাবু, মানিক চাঁদ, রাজা নন্দ কুমার, মোহন লাল প্রমুখও ছিলেন তার আপন জন। যেসব হিন্দু বেনিয়া মালামাল সরবরাহ করত সেই সব প্রতিষ্ঠিত বণিকদের সাথেও জগৎ শেঠের ভাল সম্পর্ক ছিল। এই কারণে জগৎশেঠ মধ্যমনি হয়ে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে অতি সহজে সক্ষম হন।

বর্গী হামলা প্রতিহত করার নামে বর্ধমানের মহারাজার সাথে মিলে জগত শেঠ মুর্শিদাবাদের নবাবের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। অবশ্য ধরা পড়ে বর্তমান মুদ্রামানে দু হাজার কোটি টাকা নবাবকে ফেরত দিতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে বর্গী হামলার হাত থেকে রক্ষার নামে ইংরেজদের সাথে ব্যবসারত বর্ণ হিন্দু বণিকদের চাঁদার টাকায় কোলকাতা নগরীকে ঘিরে মারাঠা রক্ষা প্রাচীর ও পরিখা গড়ে তুলে সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার বিত্তশালী বর্ণ হিন্দু ব্যক্তিদেরকে এমনভাবে জমায়েত করা হয় যে ১৬৯০সালে প্রতিষ্ঠিত কোলকাতার জনসংখ্যা ১৭৫৭ সালের আগেই হয়ে দাঁড়ায় লক্ষাধিক এবং এই জনসংখ্যার এক শতাংশও মুসলমান ছিল না। এর ফলে কোলকাতা কুচক্রীদের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হলো।

পলাশী নাটকের গ্রীণরুমে

ডক্টর মোহর আলী লিখেছেন- দুই অপশক্তি অতি সন্তর্পনে এক অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। উভয় দলের উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাদের লক্ষ্য ছিল এক। সেটা হলো সিরাজের পতন অনিবার্য করে তোলা। একটির উদ্দেশ্য ছিল শোষণ লুণ্ঠনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সাফল্যকে চূড়ান্ত করার জন্য ঔপনিবেশিক প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যটির উদ্দেশ্য ছিল সিরাজের পতন ঘটিয়ে মুসলমানদের বিনাশ করে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাদের একটা সহজ হিসাব ছিল মুসলমানরা ভারত বর্ষের যেখানেই প্রবেশ করেছে সেখানকার মাটি

ও মানুষের সাথে একাকার হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের শিকড় অনেক গভীরে প্রথিত হয়ে যায়। এজন্য তাদের উৎখাত করা বর্ণ হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ কারণে তারা ভাবতে শুরু করল ইংরেজদের সাহায্য সহযোগিতায় মুসলমানদের পতন সম্ভব হলে কালক্রমে বৃটিশদের বিতাড়িত করা তাদের জন্য কঠিন হবে না। কেননা সাতসমূদ্র তের নদীর ওপার থেকে ভারতে তাদের প্রাধান্য বজায় রাখা বৃটিশদের পক্ষে অসম্ভব হওয়াই স্বাভাবিক।

উভয় পক্ষই তাদের আপাত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। প্রথম বর্ণবাদী হিন্দুচক্র এবং বৃটিশ বেনিয়া নিজেদের মধ্যে সখ্যতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেয় এবং নিজেদের কৌশল সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় করে। এই সাথে বিভিন্নভাবে গুজব ছড়িয়ে নবাবের চরিত্র হননের উদ্যোগ নেয়। সার্বিকভাবে নবাবের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে উভয় পক্ষ।

তৎকালীন বাংলার পরিস্থিতির উপর আলোচনা রাখতে গিয়ে প্রফেসর এমাজউদ্দিন লিখেছেন- তৎকালীন সামাজিক পরিবেশও ছিল ষড়যন্ত্রের উপযোগী। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "পশ্চিমবঙ্গে তখন বীরভূম ছাড়া আর সব বড় বড় জায়গাতেই হিন্দু জমিদার . . . । প্রকাশ্যে না হলেও ভিতরে ভিতরে প্রায় সব জমিদারই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রধান নদীয়ার রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়। বর্ধমানের রাজার পরই ধনে মানে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম। বাংলার মহাজনদের মাথা জগৎশেঠদের বাড়ীর কর্তা মহাতাব চাঁদ। জগৎশেঠরা জৈন সম্প্রদায়ের লোক হলেও অনেকদিন ধরে বাংলায় পুরুষানুক্রমে থাকায় তাঁরা হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কর্মচারীদের পাণ্ডা হলেন রায় দুর্লভ রাম।. . . হুগলীতে রইলো নন্দকুমার।" জগৎশেঠ এবং উমিচাঁদের আশ্রিত ইয়ার লতিফ খাঁ আর একজন ষড়যন্ত্রকারী। সবার শীর্ষে ছিলেন আলীবর্দী খাঁর এক বৈমাত্রেয় ভগ্নীর স্বামী মীরজাফর আলী খাঁ। নবাব হবার বাসনা তার অনেক দিনের। বর্গীয় হাঙ্গামার সময় আলীবর্দী খাঁকে হত্যা করিয়ে বাংলার নবাবী গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হলে জগৎশেঠ শওকত জঙ্গের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রের আর এক গ্রন্থি রচনা করেন। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

এবারে জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, উমিচাঁদের সহযোগী হিসেবে মাঠে নামেন। সিরাজের সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেনা নায়ক মোহন লাল এবং মীর মদন বা মীর মর্দান (২৩ জুনের পূর্বে বাংলার 'মুক্তির চুক্তি' নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মীরজাফর এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে। অক্ষয় কুমার মৈত্রের রচিত মীর কাসিম গ্রন্থের ২২৩-২৪ পৃষ্ঠায় ১২ দফার এই চুক্তির বিবরণ রয়েছে। মীরজাফরের স্বাক্ষরে চুক্তিতে বলা হয় : 'আমি আল্লাহর নামে ও আল্লাহর রাসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার জীবনকালে আমি এই চুক্তিপত্রের শর্তবলী মানিয়া চলিব।'

আগে উল্লেখ করেছি ভারতের মারখাওয়া ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে কিভাবে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হচ্ছিল, কিভাবে তারা তাদের লক্ষ্যের দিকে সন্তর্পণে এগুচ্ছিল সেটা সমকালীন প্রতিষ্ঠিত শাসকরা আঁচ করতে পারেনি। কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদী কুচক্রীদের তোষামুদিতে সম্মোহিত হয়ে ছিল তারা। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতি সংক্রান্ত গভীর উপলব্ধি ছিল বৃটিশদের। ১৭৫৪ সালে জনৈক ইংরেজ স্কটের পত্র থেকে সেটা জানা যায়। হিন্দু জমিদারদের মনোভাব সম্পর্কে তিনি লিখেন- 'হিন্দু রাজা ও জমিদাররা মুসলিম শাসকদের প্রতি সর্বদা হিংসাত্মক ও বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করে। গোপনে তারা মুসলিম শাসনের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে।'

একই সময় কোম্পানীর একজন মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার তার বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন- 'যদি ইউরোপীয় সেনাবাহিনী তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে সঠিকভাবে হিন্দুদের উৎসাহিত করতে পারে তবে হিন্দুরা অবশ্যই যোগ দিবে তাদের সাথে, উমি চাঁদ ও তাদের সহযোগী হিন্দুরাজা ও সৈন্য বাহিনীর উপর যাদের আধিপত্য কাজ করছে তাদেরও টানা যাবে এ ষড়যন্ত্রে।' কে কে দত্তের আলীবর্দী এন্ড 'হিজ টাইম' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- '১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংসহাসন চ্যুত করার ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছিল হিন্দু জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী লেখক রাজীব লোচন লিখেছেন- 'হিন্দু জমিদার ও প্রধানগণ সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। [কে, কে. দত্ত. আলীবর্দী এন্ড হিজ টাইম, পৃঃ ১১৮]

পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ক্লাইভের সাথে বর্ধমান, দিনাজপুর ও নদীয়ার জমিদারদের পত্র যোগাযোগ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, অগ্রিম আনুগত্য প্রকাশ করে তারা ক্লাইভকে যুদ্ধযাত্রার দাওয়াত জানান [শিরীন আক্তার]। নদীয়া, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, বীরভূমের রাজা-মহারাজারা মুর্শিদাবাদে সমবেত হয়ে দেওয়ান-ই-সুবা মহারাজা মহেন্দ্রের কাছে অনেকগুলো দাবী পেশ করেন- তাদের ক্রমবর্ধিষ্ণু দাবী মিটাতে নবাব অপারগ হলে জগৎশেঠের পরামর্শে তারা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে-এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সিরাজদ্দৌলাকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সভার পক্ষে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোলকাতায় মিঃ ড্রেকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আহবান জানান এবং সর্বমুখী সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন। (Ierrititial Aristocracy of Bangla the Naelia Raj : C.R. 1872 1.V., 107-110.) সুবে বাংলার কুলিন বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাজারা আলাবর্দীকে দিয়ে নবাব সরফরাজকে উচ্ছেদ করে যেরূপ ফায়দা হাসিল করেন, নবাব আলীবর্দীর মৃত্যু মুহূর্তেও তেমনি দেওয়ান রাজবল্লভের নেতৃত্বে তাদের একদল সিরাজের বড় খালা ঘষেটি বেগমকে উস্কানি দিয়ে, সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ আক্রমনের জন্য নগরীর দ্বারপ্রান্তে হাজির করেন। সিরাজউদ্দৌলা তাঁর খালার মন জয় করে তার সমর্থন পেয়ে যাওয়ায় দিশেহারা দেওয়ান রাজবল্লভ নিজ পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে দিয়ে নবাবের ঢাকাস্থ যাবতীয় অর্থবিত্ত সম্পদ-সম্ভার কোলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পাচার করে দেন। অন্যদিকে সিরাজের খালাতো ভাই পুর্নিয়ার গভর্নর শওকত জংকেও শ্যামসুন্দর বাবুরাই উস্কানি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ করেন।

ইংরেজদের সাথে বিরোধের সূচনা

আসকার ইবনে শায়েখ লিখেছেন- নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামলে (১৭৪০-৫৬) ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভকে হিসাবপত্র নিরীক্ষণের জন্য

কাগজপত্রসহ মুর্শিদাবাদে তলব করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে তহবিল তসরুফের প্রামাণ্য অভিযোগ ছিল। কিন্তু হিসাব পরীক্ষার পূর্বেই তিনি কাশিম বাজার কুঠির প্রধান উইলিয়াম ওয়াটসের নিকট তাঁর পুত্র ও পরিজনের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ দাস বা কৃষ্ণবল্লভ ৫৩,০০০০০ টাকা মূল্যের নগদ অর্থ ও সোনা রূপাসহ কলকাতায় আশ্রিত হন। এই কৃষ্ণবল্লভকে প্রত্যার্পণের জন্য নবাবের দরবার হতে বার বার নির্দেশ ও তাগিদ দেয়া সত্বেও কোম্পানীর গভর্নর রজার ড্রেক তা পালন করতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৭৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। নবাবের নিষেধ সত্বেও ইংরেজরা তাদের ফোর্ট উইলিয়াম (কলকাতায়) দুর্গটিকে সামরিক সাজে সজ্জিত করে তুলতে শুরু করে। বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দী এ দুটি ঘটনার 'প্রতিকার করে যেতে পারেননি।

নবাবী লাভ করেই সিরাজউদ্দৌলা কৃষ্ণবল্লভকে প্রত্যার্পণ করতে গভর্নর ড্রেককে এবং দুর্গ দেয়াল ভেঙ্গে পরিখা বন্ধ করে দিতে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলকে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ সিংহ নামক একজন বিশ্বস্ত দূতকে ইংরেজদের মনোভাব যাচাই করার জন্য কলকাতা পাঠালেন। কিন্তু ইংরেজরা নারায়ণ সিংহকে অপমান করে কলকাতা হতে তাড়িয়ে দেয়। নবাব আবার অন্যতম ব্যাংক ব্যবসায়ী খাজা ওয়াজিদকে একই উদ্দেশ্যে কলকাতা পাঠান। পরপর চার বার তিনি কলকাতা যান, কিন্তু ইংরেজরা তার সঙ্গেও সংযত আচরণ বা আপোষমূলক মনোভাব প্রদর্শন কোনটিই করেনি।

এভাবে নবাবের আন্তরিক সদিচ্ছা ব্যর্থ হবার ফলে তিনি দুর্লভরাম ও হুকুম বেগকে কাশিম বাজার কুঠি অবরোধের নির্দেশ দিলেন। মির মোহাম্মদ জো খান হুগলীতে জাহাজ নির্গমনের পথ রোধ করলেন এবং নবাবের উপস্থিতিতে কাশিম বাজারের পতন ঘটল। কুঠি প্রধান ওয়াটস্ এবং কলেটকে সঙ্গে নিয়ে নবাব কলকাতার দিকে অগ্রসর হলেন। কাশিম বাজার অবরোধ ও পতনের মাধ্যমে সমঝোতায় আসতে ইংরেজদের উপর চাপ সৃষ্টি করাই নবাবের উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী ঘটনায় তার প্রমাণ মিলে। খাজা ওয়াজিদের মিশন ব্যর্থ হবার পর উমিচাঁদ ও শ্রীবাবু নামক জনৈক ব্যবসায়ী সমঝোতার প্রস্তাব দেন।

মীমাংসায় আসার জন্য নবাবের নিকট একজন দূত পাঠাতে ড্রেককে অনুরোধ করে পত্র লেখেন উইলিয়াম ওয়াটস্ ও কলেট। এ পত্র পাঠান হয় ওলন্দাজ এজেন্ট বিসডোমের মাধ্যমে। ড্রেক তাও রক্ষা করেননি। অবশেষে ফরাসী দেশীয় ম্যাকুইস দ্যা সেন্ট জ্যাকুইস এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠানো হয় কোলকাতায়। উত্তরে উদ্ধত রজার ড্রেক প্রস্তাবকারীকে পক্ষ পরিবর্তনের উপদেশ দেন।

সুতরাং অনিবার্য হয়ে উঠল সংঘাত। ১৭৫৬ সালে ১৩ জুন নবাব ফোর্ট উইলিয়ামে পৌঁছান এবং যথারীতি কোলকাতা অবরুদ্ধ হয় ১৯ জুন। নাটকের উদ্ধৃত অহংকারী নায়ক রজার ড্রেক সঙ্গী মিনকিন, ম্যাকেট ও গ্রান্টসহ সগৌরবে পিছন দিকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সংগে সংগে ইংরেজ শিবিরে পলায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত সংক্রমিত হয়ে পড়ে। এক ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজদের সকল জাহাজ পলাতকদের নিয়ে ভাটির পথে পাড়ি জমায়. . . ।

. . . ড্রেক ও অন্যান্যদের পলায়নের পর ফোর্ট উইলিয়ামের মাত্র আটজন যুদ্ধ পরিষদের সদস্য অবশিষ্ট রইল। তাদের মধ্যে হলওয়েল রজার ড্রেকের স্থলবর্তী গভর্নর নিয়োজিত হলেন। হলওয়েল পলায়নের কোন নৌকার অভাবেই কলকাতায় থেকে যেতে বাধ্য হন এবং তিনিই পরবর্তীকালে তথাকথিত কাল্পনিক অন্ধকুপ হত্যার গল্প কাহিনীর জন্ম দান করেন। হলওয়েল গভর্নর হয়ে এক দুপুর টিকে ছিলেন; তার পর আত্মসমর্পন ভিন্ন কিছুই আর তাঁর করবার রইল না। ২০ জুন বিকেল চারটায় কলকাতার পতন ঘটে।

১৭ জুলাই বন্দীদের নবাবের সামনে হাজির করা হয়। অন্যদিকে কাশিমবাজার ও কলকাতার পতন সংবাদ পর পর মাদ্রাজ পৌঁছে। ফলে প্রথমে মেজর কিলপেট্রিক-এর নেতৃত্বে দুটি জাহাজ এবং পরে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে-প্রচুর সৈন্য, গোলাবারুদ ও সাজ-সরঞ্জামসহ বারটি জাহাজ পাঠান হয় বাংলায়। এই অভিযানের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়;

ক. নবাবের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে কোম্পানীর ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা পরিবর্তন

খ. কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের চন্দন নগর হতে উৎখাত।

২৫ ডিসেম্বর ফুলতা পৌঁছেই ক্লাইভ ও ওয়াটসন ‘কলমের সঙ্গে সঙ্গে তরবারির মহড়া শুরু করেন। ৩০ ডিসেম্বর তাঁরা বজবজ দখল করেন এবং ২ জানুয়ারী (১৭৫৭) কলকাতা পুনুরুদ্ধার করে ড্রেক ও তাঁর কাউন্সিল সদস্যদের ফোর্ট উইলিয়ামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিজয়ের গৌরবে ইংরেজরা ৩ জানুযায়ী নবাব ও তাঁর দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। হুগলী শহরটি ব্যাপকভাবে লুণ্ঠিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। সেদিনই নবাব তাঁর এক ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে হুগলীর উত্তরে পৌঁছেন। ইংরেজরা ফিরে যায় কলকাতা। ফরাসী ও ওলন্দাজেরা নবাব ও ইংরেজদের বিবাদে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ইংরেজরা তাদের কাউকে বিশ্বাস না করে এবার খাজা ওয়াজিদের মাধ্যমে তাদের দাবীর কথা জানিয়ে দেয় ২২ জানুয়ারী। বলা হয়, কাশিমবাজার ও কলকাতা দখলের ক্ষতিপূরণ, ১৭১৭ সালের ফরমান অনুযায়ী সকল সুবিধা, কলকাতায় সামরিক দুর্গ নির্মাণের অনুমতি এবং কোম্পানীর নিজস্ব মুদ্রা তৈরীর অধিকার দিতে হবে।

বৃটিশদের ঔদ্ধত্য ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে নওয়াব দারুণভাবে বিব্রত ও ক্ষুব্ধ হন। ওদিকে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর আমন্ত্রণে আফগান বীর ভারতবর্ষে আগমন করেন মূলত মারাঠা ঔদ্ধত্য গুড়িয়ে দেয়ার জন্য। তার আক্রমণের লক্ষ্য সুবাহ বাংলা ছিল না। কিন্তু দরবারের কুচক্রী সৃষ্ট আহমদ শাহ আবদালীর বাংলা আক্রমণ সংক্রান্ত গুজব নতুন আশঙ্কার জন্ম দেয়। এ আশঙ্কা নবাবকে অনেকটা হত বিহবল করে ফেলে। উদ্বিগ্ন নবাব আবদালীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। সে সময় ইংরেজদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ নবাবের কাছে গৌণ বলে অনুভুত হয়। নবাব ইংরেজদের সাথে আপোষের কথা ভাবতে থাকেন এই কারণে যেন আবদালীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে মনযোগী হতে পারেন। ওদিকে নবাবের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার উদ্দেশ্যে নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্র পোক্ত হওয়ার জন্য ইংরেজদেরও সময়ের প্রয়োজন ছিল। উভয়ের প্রয়োজনে ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্র“য়ারী নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই সন্ধির পর নবাব আফগান আক্রমণ প্রতিরোধে মনোযোগী হলেন। এই অবকাশে ইংরেজরা

একদিকে নবাবের পারিষদবর্গ ও সেনা নায়কদের প্রলুব্ধ ও প্রভাবিত করার সুযোগ পেল এবং অন্যদিকে ফরাসীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল সম্ভাব্য বিপর্যয় নাটকের দৃশ্য থেকে ফরাসীদের বিদায় করার জন্য। বাংলার প্রেক্ষিত নয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সামনে এনে ইঙ্গ ফরাসী যুদ্ধের দোহাই পেড়ে ইংরেজরা ১৪ মার্চ ফরাসী অধ্যুসিত চন্দন নগর অবরোধ করে।

(১৭৫৭) চন্দন নগর অবরোধের সংবাদ পেয়ে নবাব দুর্লভরাম ও নন্দকুমারকে আবার ফরাসীদের সাহায্যের জন্য পাঠান। ইংরেজদের দেয়া ঘুষে এবারও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ২৩ মার্চ চন্দন নগরের পতন ঘটে। ফরাসীরা বাংলায় তাদের সবগুলো কুঠি ইংরেজদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাদের কিছু সৈন্য কাশিম বাজারে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে, কিছু প্রাণ দেয়, কিছু বন্দী হয়। ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করে নিহত দেশীয় সিপাহীদের ইংরেজ সেবার নিদর্শন স্বরূপ জনপ্রতি দশ টাকা করে পুরস্কার দেয়া হয়।

ডক্টর মোহর আলী লিখেছেন- 'ইংরেজদের চন্দন নগর আক্রমনের প্রাক্কালে নবাব তাদের প্রতিরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু বিপুল পরিমাণ ঘুষের বিনিময়ে প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা নন্দকুমার বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং রায় দুর্লভ রাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণে সিরাজকে বাধা দিতে থাকেন। ক্ষমতা লাভের ছয় মাসের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল পরিপক্ক হয়ে ওঠে। এই লোকগুলোর সহযোগিতায় ক্লাইভ খুব সহজেই নবাব প্রশাসনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিকল করে ফেলেন এবং নবাবের গোপন কাগজ ও চিঠিপত্র হস্তগত করেন। নবাব এসব ষড়যন্ত্রের সবকিছু জানতে পারেন। কিন্তু ব্যাপক বিস্তৃত এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তখন তাঁর কিছুই করার ছিলো না। কারণ, তিনি কাউকেই বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করতে পারেননি।' প্রফেসর আব্দুর রহিম লিখেছেন, ২৩ এপ্রিল (১৭৫৭) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোলকাতা কাউন্সিল নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসন চ্যুত করার জন্য একটি প্রস্তাব পাস করে। হিল লিখেছেন যে, ক্লাইভ উমিচাঁদকে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করেন।'

অন্যদিকে ডক্টর মোহর আলী- ১৭৫৭ সালের পয়লা মে অনুষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম সিলেক্ট কমিটির বিবরণ দিয়ে লিখেছেন- 'সিরাজকে উৎখাতের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনা গ্রহণের পর মুর্শিদাবাদের অদূরে পলাশী প্রান্তরে ক্লাইভ তাঁর সৈন্য সমাবেশ শুরু করেন। মীরজাফর ও দুর্লভ রামের নেতৃত্বে নবাব ১৫,০০০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এদিকে মুর্শিদাবাদের ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াটস তখনই যুদ্ধ না বাঁধিয়ে সৈন্য প্রত্যাহার করে কলকাতায় সুযোগের প্রতীক্ষা করতে ক্লাইভকে উপদেশ দেন। ক্লাইভ তা মেনে নেন এবং নবাবকেও তাঁর সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। ইংরেজদের আচরণ নবাবের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে; তিনি তাঁর বাহিনী অপসারণের নির্দেশ দিলেন। ক্লাইভ তাঁদের আচরণের সততার প্রতি নবাবের সন্দেহ দূর করার জন্য এক কুটচাল চালেন। মারাঠাদের লিখা এক চিঠি দিয়ে তিনি স্ক্রেফটনকে মুর্শিদাবাদ পাঠান। এ চিঠিতে ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে বাংলাকে ভাগ করে নেবার প্রস্তাব ছিল। এবার নবাব ইংরেজদের বিশ্বাস করলেন এবং তার বাহিনীকে মুর্শিদাবাদ ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন।

'নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারেন। তিনি মীরজাফরকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করেন এবং আবদুল হাদী খানকে সে পদে নিয়োগ করেন। আবদুল হাদী ও মীর মদন মীরজাফরকে ধ্বংস করিবার জন্য নবাবকে পরামর্শ দেন। কিন্তু জগৎশেঠ ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক উপদেষ্টাগণ নবাবকে পরামর্শ দেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির জন্য মীরজাফরের সহযোগিতা লাভ করা নবাবের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হবে। নবাব তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি মীরজাফরের বাড়ীতে গিয়ে নবাব আলীবর্দীর নামে তাঁহার নিকট ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য মর্মস্পশী আবেদন জানান। পবিত্র কুরআন হাতে লইয়া মীরজাফর এই সময় অঙ্গীকার করেন যে, তিনি নবাবের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। (প্রফেসর আব্দুর রহিম)

সাময়িক পদচ্যুতির অপমানে মীরজাফর দারুণভাবে প্রতিহিংসা পরায়ণ ও ক্রোধান্ধ হয়ে উঠলেন। সিরাজের আশু পতন অনিবার্য করে তোলার জন্য

সর্বাত্মক উদ্যোগ নিলেন। মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করার জন্য বার বার ক্লাইভের নিকট বার্তা প্রেরণ করে তাগাদা দিতে থাকেন। এমন মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষায় ছিলেন ক্লাইভ। এই সুযোগে তিনি আরো অতিরিক্ত শর্ত যুক্ত করলেন। পরিণতির কথা না ভেবেই মীরজাফর সব দাবী অকপটে মেনে নিলেন। জগৎশেঠের প্রোথিত বিষাক্ত বীজ অঙ্কুর থেকে বৃক্ষে পরিণত হল, অতঃপর মহীরুহে। ম্লেচ্ছ যবন মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে নব উত্থান সম্ভাবনায় ব্রাহ্মন্যবাদীরা উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

'অতঃপর ষড়যন্ত্রকারীগণ জগৎশেঠের বাড়িতে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, মীরজাফর, রাজবল্লভ এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বৈঠকে যোগ দেন। ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্ট ওয়াটস মহিলাদের মত পর্দা-ঘেরা পাল্কিতে জগৎশেঠের বাড়িতে আসেন। 'এই বৈঠকে সিরাজউদ্দৌলাকে সরাইয়া মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওয়াটস এই কাজে ইংরেজদের সাহায্যের প্রতিশ্র"তি দেন। ইহার পর কোম্পানীর প্রধানগণ চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুত করেন এবং ১৯ মে ইহাতে দস্তখত করেন। মীরজাফরসহ ৪ জন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন'।

এই মুক্তির চুক্তি মীরজাফর সত্যি আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করেছিলেন। প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে তিনি রনাঙ্গনে ছবির মত দাঁড়িয়ে ছিলেন শুধু ব্রাহ্মণ্য চক্রের ফাঁদে পড়ে। তিনি প্রধান সেনাপতি হয়ে নবাবের পতন উপভোগ করলেন প্রাণভরে। মুর্শিদাবাদের পতন হল। পুনরুদ্ধারের আশায় নবাব ছুটে চললেন বিহারে তার অনুগত বাহিনীর নিকট। তার আশা পূর্ণ হলো না। পথে গ্রেপ্তার হলেন। মীরজাফর তনয় মিরন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করল। তার রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সমগ্র সুবাহ বাংলার স্বাধীনতা ১৯০ বছরের জন্য মহাকালের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সমগ্র জাতি শৃংখলিত হল ঔপনিবেশিক অক্টোপাশে। সে ইতিহাসও অতি মর্মান্তিক। ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সিরাজের পতনের মধ্যে তারা দেখতে পেল তাদের উত্থান সম্ভাবনা।

পলাশীর পরে

পলাশী যুদ্ধের প্রহসনমূলক নাটক শেষ হতে না হতেই লুণ্ঠিত হল মুর্শিদাবাদের রাজকোষ। সে সময় রাজকোষে কি পরিমাণ সম্পদ ছিল?

মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকাল থেকে দীর্ঘ ৫৫ বছরের সঞ্চয় একত্রিত হয়ে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার কোষাগারে পূর্ণিয়া যুদ্ধের পর সঞ্চিত ছিল সার্জন ফোর্থের প্রদত্ত হিসাব মতে মনিমুক্তা হিরা জহরতের মূল্য বাদ দিয়ে, তৎকালীন মুদ্রায় ৬৮ কোটি টাকা [S. C. Hill. Bengal in 1757-67, P.108] যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটের সাথে তুলনীয়।'

পলাশীর নাটক শেষ করে সিরাজ-উদ্দৌলারই দীওয়ান রামচাঁদ বাবু মুনশী নবকিষেণ, লর্ড ক্লাইভ ও মীরফাফরকে নিয়ে নবাবের কোষাগারে হাজির হন বিত্ত-সম্পদ লুট করার জন্য। দীওয়ান বাবুর তালিকার সাথে মিলিয়ে প্রাপ্ত সম্পদ তারা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেন। সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদে ও অন্দরমহলে রক্ষিত সম্পদ ভাগ করে নেন দীওয়ান রামচাঁদ, মুনশী নবকিষেণ, মীরজাফর আলী খান ও আমীর বেগ খান। (সিয়ারে মতাযেলি, ২য় খণ্ড (অনুবাদ) পৃ-২৩।

মুর্শিদাবাদের রাজকোষ থেকে পাওয়া গেল পনের লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ ৩০ কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ। ক্ষতিপূরণ হিসাবে বৃটিশ নৌবাহিনী এবং স্থল বাহিনীর ৬জন সদস্যকে দিতে হল ৮কোটি টাকা। সিলেক্ট কমিটির ৬ জন সদস্যকে দিতে হল ৯ লক্ষ পাউন্ড (১৮ কোটি টাকা), ক্লাইভ তার নিজের জন্য আদায় করলেন ২ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড (প্রায় ৩ কোটি টাকা), কাউন্সিল মেম্বাররা পেলেন এক থেকে দেড় কোটি টাকা করে।

অবশেষে কোম্পানীর ছোট বড় সব কর্মচারী এবং তাদের দলগত চক্র শোষণ লুণ্ঠনের দুঃসহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সমগ্র বাংলাব্যাপী। আর মুসলমানদের উচ্চবিত্ত আমীর ওমরাহর দল শিখণ্ডী নবাব হবার অভিলাষে তাদের সম্পদ উজাড় করে ইংরেজদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে এবং বৃটিশদের অর্থতৃষ্ণা মেটাতে থাকে। মীর কাশিম একই উদ্দেশ্যে ২ লক্ষ্য পাউন্ড (৪

কোটি টাকা) বর্তমান মুদ্রামানে ৮ হাজার কোটি টাকা কোম্পানীর হাতে তুলে দেন। মীর জাফরের পুত্রও কোম্পানীকে দেয় ১ লক্ষ ৪৯ হাজার পাউন্ড অর্থাৎ ৩ কোটি টাকা, বর্তমান মুদ্রামানে ৬ হাজার কোটি টাকা।

ওদিকে বাংলার জনপদ তার জেল্লা হারিয়ে নৈরাশ্য, হতাশা এবং বিশৃংখলার দিকে ধাপে ধাপে এগুতে থাকে। ক্লাইভের স্বীকৃতি থেকে তৎকালীন পরিস্থিতি কিছুটা অনুধাবন করা যায়। ক্লাইভের ভাষায়- "আমি কেবল স্বীকার করতে পারি, এমন অরাজকতা বিশৃংখলা, উৎকোচ গ্রহণ, দুর্নীতি ও বলপূর্বক ধনাপহরণের পাশব চিত্র বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও দৃষ্ট হয়নি।" অথচ নির্লজ্জ ক্লাইভই এ শোষণযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর, আব্দুল ওয়াদুদ, পৃ. - ৬০-৬২)

ব্রিটিশ আমলে বাংলার অর্থনীতি মানেই হলো- সুপরিকল্পিত শোষণের মর্মভেদী ইতিহাস। ঐতিহাসিকরা মোটামুটি হিসাব করে বলেছেন, ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত মাত্র তেইশ বছরে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে চালান গেছে প্রায় তিন কোটি আশি লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ সমকালীন মূল্যের ষাট কোটি টাকা। কিন্তু ১৯০০ সালের মূল্যমানের তিনশো কোটি টাকা। (বর্তমান মুদ্রামানে ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা)। (Miller quoted by Misra. P-15.)

মীর জাফরকে নির্দেশ দেয়া হল সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেয়ার জন্য। কোম্পানীর নির্দেশকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা শিখণ্ডী নবাবের ছিল না। বাধ্য হয়ে তিনি ৮০ হাজার সৈন্যকে বরখাস্ত করলেন। এর আগে মীর কাসিমের ৪০ হাজার সৈন্য ছত্র-ভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। মোটের উপর পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধ নাটকের পর থেকে সেনাবাহিনীর দেড়লক্ষাধিক সৈন্য এবং এ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ৫০ হাজার কর্মচারী চাকুরীচ্যুত হল। এদের সবাই ছিল মুসলমান। এর ফলে বাংলার অসংখ্য মুসলিম পরিবার এগিয়ে চললো বেকারত্বে।

শতাব্দীকালের প্রতিরোধ যুদ্ধ অতঃপর হতাশা

সিরাজের পতন অতঃপর মীর কাসিমের প্রতিরোধ যুদ্ধের অবসান হলে ইংরেজরা শুধু মাত্র শোষণ এবং এদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ

রাখেনি। তাদের সহযোগী, তাদের জুনিয়ার পার্টনার বর্ণবাদী হিন্দুদের সহযোগিতায়ই মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙলো। অতঃপর শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা সবকিছু থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখল। একদিকে বৃটিশদের বিমাতাসূলভ আচরণ, নীলকরদের অত্যাচার অন্যদিকে হিন্দু জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারে এদেশের মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ল। মুসলমানরা চাকুরি হারাল, আয়মা লাখেরাজ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হল। লক্ষাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ায় সমগ্র জাতি ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। বিলাতী বস্ত্রে ছেয়ে গেল দেশ। লক্ষ লক্ষ তাঁতী হল কর্মহীন। লবন ব্যবসা চলে গেল ইউরোপীয়দের হাতে। নীলকরদের অত্যাচারে সর্বশান্ত হল কৃষকরা। খাজনা আদায়ের ভার দেয়া হল হিন্দুদের। জমিদার হয়ে বসল হিন্দুরা। অর্থনীতির সব সেক্টর থেকে মুসলমানরা হল বিতাড়িত।

এই সর্বহারা মুসলমানরা পরাধীনতার ঘোর অন্ধকারে তাদের হারানো ইতিহাস ঐতিহ্য হাতড়ে ফিরল। দেখল তাদের সব কিছু ধ্বংস স্তূপের নীচে চাপা পড়ে আছে। সেখান থেকে পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিল। দেখল ঔপনিবেশিক শক্তি এবং তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী সহযোগীরা বিঘ্নের পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিপীড়নের মধ্য দিয়ে নিষ্পেষিত জনগণের প্রতিরোধ শক্তি দানা বেধে উঠল। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পরিণত হল গণ প্রতিরোধে। সিরাজের পতন পর্যায়ে যে জনগণ ছিল প্রতিক্রিয়াহীন সে জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পৃক্ত হল।

যারা সবকিছু চাওয়া পাওয়ার বাইরে অবস্থান করছিল সেই ফোকরা গোষ্ঠি সংঘবদ্ধ হল এবং এগিয়ে এলো প্রতিরোধ যুদ্ধে। হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য জানবাজি রাখতে তৈরি হল। ইতিহাসে যেটা পরিচিত ফকীর বিদ্রোহ নামে। শুধুমাত্র বাংলায় স্থানীয়ভাবে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ত্রিশটি বছর বিদ্রোহে বর্ণবাদী হিন্দুরা ছিল ঔপনিবেশবাদী বৃটিশদের সর্বাত্মক সহযোগী। তাদের প্ররোচনায় কোন নিপীড়নকারী হিন্দুদের কোন একটি অংশও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি। এককভাবে মুসলিম জন গোষ্ঠী স্বাধীনতা সংগ্রামে একটানা একশ বছর 'বিরামহীন ভাবে লড়াই করেছে। ফকির বিদ্রোহ থেকে মুজাহিদ আন্দোলন সবখানে ছিল মুসলমানদের সক্রিয় ভূমিকা। শুধুমাত্র ভারত কাঁপানো

সিপাহী বিদ্রোহে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই এবং তাতিয়া তোপি এবং অবাঙালী সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দিলেও বাঙালী বাবুরা এ বিদ্রোহে থেকে দূরেই শুধু অবস্থান করেনি তারা সিপাহী বিপ্লবের সময় ইংরেজদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে নিজেদের ঔপনিবেশিক দালাল হিসাবে চিহ্নিত করেছে। স্বার্থপর শিখরা সিপাহী বিপ্লবের সময় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের কথা চিন্তা করেনি। তারাও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র এবং বাঙালী বাবুদের মত ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছিল শংকিত। একজন বাহাদুর শাহর পরিবর্তে একজন ডাল হৌসীর প্রয়োজন ছিল তাদের কাছে অনেক বেশী। 'ভারত উপমহাদেশে সিপাহী বিপ্লবের প্রচন্ড ঝড়কে চোখ বন্ধ করে উপেক্ষা করেছে শিখ ও কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু এলিট গোষ্ঠী বর্ণ হিন্দু ও তার প্রভাবিত বাঙালী হিন্দুরা। এরা ঝড়ের ঝাপটা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইংরেজদের পক্ষপুটের নিবিড় আশ্রয়ে নিরাপদ অবস্থান নিল। যখন ঢাকার পথে গাছের ডালে ডালে মুক্তিকামী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লাশ ঝুলছিল তখন কোলকাতার বাবুদের ঘরে ঘরে চলছিল বিজয়ের মহোৎসব। যখন সমস্ত উপমহাদেশের মুসলমান ও সংশ্লিষ্ট অবাঙালী হিন্দুদের বুক বিদীর্ণ হচ্ছিল বন্দুকের গুলিতে তখন কোলকাতায় আতসবাজী দিয়ে বিজয়ী বৃটিশদের জানান হচ্ছিল সাদর অভিনন্দন। যখন মুসলিম রমনীদের চোখে নতুন করে ঝরছিল স্বজনহারা বেদনার অশ্রু" তখন কোলকাতার হিন্দু কুল বধুরা উলুধ্বনি দিয়ে জানাচ্ছিল সম্ভাষণ। যখন লালবাগের ভাঙা কেল্লায় রক্তাক্ত সিপাহীরা আর্তনাদ করছিল তখন নির্মিত হচ্ছিল বাবুদের জন্য ইংরেজদের বিশেষ উপহার কোলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়।

সিপাহী বিপ্লবের প্রজ্জ্বলিত শিখা যখন ছড়িয়ে পড়েছে উপমহাদেশের সর্বত্র তখন ইশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় তৎকালীন বাঙালী অর্থাৎ হিন্দু সমাজের উদ্দেশ্যে উপদেশ প্রদান করে বলা হয়- 'হে বাঙালী মহাশয়েরা এ বিষয়ে আপনাদের যুদ্ধ করিতে হইবে না। আপনারা শুধু একান্ত চিত্তে কেবল রাজপুরুষদের মঙ্গলার্থে সাস্ত্রায়ন করুন।'

সিপাহী বিপ্লবের আগুন স্তিমিত হল। মুক্তিকামী সিপাহী ও জনতার লাশ মাড়িয়ে ইংরেজ সেনাপতি দিল্লীতে প্রবেশ করলে কোলকাতায় বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। হিন্দু মানস উল্লসিত হয়ে ওঠে। পণ্ডিত গৌরী চন্দ্র সম্পাদিত সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়- 'হে পাঠক সকল উদ্বাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য কর'।

কোলকাতার বাবুরা বৃটিশদের এতখানি আস্থাভাজন হয়েছিলেন যে, সমগ্র ভারতের ১৪টি শহরে সামরিক আইনের এবং ঔপনিবেশিক নিপীড়নের স্টীম রোলার অব্যাহত ভাবে চললেও কোলকাতা সামরিক আইনের আওতার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এছাড়াও বাংলার বাইরে বাঙালী হিন্দুদের গৃহে 'ক্যালকাটা বাবুজ' লেখা থাকলে সেটাও জুলুম মুক্ত নিরাপদ গৃহ হিসাবে বিবেচিত হতো।

ডক্টর আনিসুজ্জামানের মন্তব্যে বলা হয়েছে- সিপাহী বিপ্লবের সমস্ত দায়িত্বটা কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের ঘাড়ে এসে পড়েছিল। দেশে এবং বিলেতে শাসক মহলে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুঘল শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানরা এ বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মোটা অংশই তাদের ভাগ্যে জুটেছিল।

১৮৫৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ইংরেজ কর্তৃক দিল্লী দখলের পরদিনের বিবরণ দিয়েছেন জনৈক ইংরেজ- 'আমাদের সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করার পর নগর প্রাচীরের মধ্যে যাকে পেয়েছে তাকেই বেয়নটের আঘাতে হত্যা করেছে। কোন কোন বাড়ীতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লুকিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় তাদের সংখ্যা বেশ ছিল। এরা বিদ্রোহী নয় শহরের অধিবাসী মাত্র।'

সিপাহী বিপ্লবের মর্মান্তিক পরিণতির পর মুসলমানদের পুনরুত্থান ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতাকামীদের যারা বেঁচে ছিলেন তারা বনে বাদাড়ে অথবা নিভৃত পল্লীর অপরিচিত পরিবেশে স্থান নিলেন শুধু মাত্র ক্ষুদ কুড়ো দিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য। নৈরাশ্য- হতাশা ও নীরব কান্নায় গুমড়ে মরছিল সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী। হিন্দু বেনিয়া ও বৃটিশদের প্রতিশোধ স্পৃহা এবং তাদের বৈরী নীতি মুসলমানদেরকে অধঃপতনের দোর গোড়ায়

নিয়ে এল। পাশাপাশি হিন্দু জনগোষ্ঠীর সৌভাগ্য আকাশ চুম্বী হয়ে উঠল। মুসলমানদের শুধুমাত্র দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কোন অবলম্বনই অবিশষ্ট রইল না।

কোম্পানীর রাজস্ব নীতি

হেষ্টিংস প্রতিটি জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করলেন এবং এদের সহযোগী কর্মচারীদের নেয়া হল হিন্দু জনগোষ্ঠী থেকে। এর ফলে রাজস্ব আদায়ে লিপ্ত মুসলমান কর্মচারীরা অপসারিত হল। ইংরেজ কালেক্টররা জেলার দায়িত্বভার গ্রহণ করেই নিলামে রাজস্বের বন্দোবস্ত দেয়ার উদ্যোগ নেয়। যারা অধিক পরিমাণে রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত হল তাদের হাতেই তুলে দেয়া হল জমিদারী। এ প্রেক্ষিতে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হল।

রাজস্ব বিভাগ কোম্পানীর পরিচালনাধীন হওয়ার পর কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে হিন্দু ও ইংরেজ আদায়কারীগণ অতিমাত্রায় শোষণ নিষ্পেষণের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে কোম্পানীর রাজকোষ পূর্ণ করতে থাকে। ইতিপূর্বে প্রজাদের নিকট থেকে আদায়কৃত সকল অর্থ দেশের জনগণের মধ্যে তাদেরই জন্যে ব্যয় হতো। কিন্তু তখন থেকে আদায়কৃত অর্থ ইংল্যাণ্ডের ব্যাংকে ও ব্যবসা কেন্দ্রগুলিতে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

নীতি এবং দায়-দায়িত্বহীন কার্যক্রম, অনাবৃষ্টি, নির্যাতিত কৃষক সমাজের অস্থিরতা এবং বেহাল অবস্থা করুণ পরিণতির দিকে টেনে আনল বাংলার জনপদকে। সমগ্র বাংলা বিহারে এলো মহামন্বন্তর, হৃদয়বিদারক দুর্ভিক্ষ। খাদ্যের অভাবে নির্মমভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল এদেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ। কিন্তু তবু করুণার উদ্রেক হল না বেনিয়া এবং তাদের দালাল চক্রের।

লর্ড কর্নওয়ালিস দশশালা বন্দোবস্তে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয়ে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী ভিত্তিতে জমিদারী প্রথা চালু করলেন। সূর্যাস্ত আইনের অছিলায় মাত্র ২ বছরের মধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে বাংলার অর্ধেক জমিদারী নিলাম হয়ে গেল। নিলামে এসব জমিদারী ক্রয় করল কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বিত্তশালী ও সুবর্ণ শ্রেণীর মহাশয়েরা। শুরু হল নতুন উদ্যোগে অত্যাচার। (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, এম আর আখতার মুকুল, পৃ- ৬৯।)

মহাজনদের অত্যাচার

জমিদার- পত্তনীদারদের উৎপীড়নে কৃষকদের জীবন যখন দুর্বিসহ হয়ে পড়তো, বাধ্য হয়ে তাদেরকে তখন হিন্দু মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হতো। উপরন্ত তাদের গরু/ মহিষ মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে হতো। অভাবের ধরুন মহাজনের কাছে অগ্রিম কোন শস্য গ্রহণ করতে হলে তার দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হতো। আবার উৎপন্ন ফসল যেহেতু মহাজনের বাড়ীতেই তুলতে হতো, এখানেও তাদেরকে প্রতারিত করা হতো। মোটকথা হতভাগ্য কৃষকদের জীবন নিয়ে এসব জমিদার মহাজনরা ছিনিমিনি খেলে আনন্দ উপভোগ করতো।

কৃষকদের এহেন দুঃখ- দুর্শশার কোন প্রতিকারের উপায়ও ছিল না। কারণ তা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। উপরন্ত জমিদার ও তাদের দালালগণ উৎকোচ ও নানাবিধ দুর্নীতির মাধ্যমে মামলার খরচ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিত। পরিণাম ফল এই হতো যে, জমিদার মহাজন তাদেরকে ভিটেমাটি ও জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করে পথের ভিখারীতে পরিণত করতো। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস: আব্বাস আলী খান, পৃ. - ১০৪)

নীলকরদের অত্যাচার

বৃটিশ সৃষ্ট নব্য জমিদারদের শোষন এবং নিত্য নৈমিত্তিক, নিপীড়নের সাথে যুক্ত হল আর এক যন্ত্রণা নীলকরদের অত্যাচার। যেন গোদের উপর বিষফোড়া। এদিকে সিরাজের পতনের পর কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে বৃটিশ বণিকেরা নীলের জন্য বাংলাকে উপযুক্ত স্থান বলে মনে করল। শুরু হল ব্যাপক নীলচাষ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমুহে প্রতিষ্ঠিত হল নীলকুঠি। রাজ্য হারিয়ে, জমিদারী হারিয়ে, চাকুরিচ্যুত হয়ে মুসলমানরা যখন দু'মুঠো অন্নের জন্য পুরোপুরি কৃষিনির্ভর হয়ে উঠল, সে সময় বৃটিশ বণিকরা নব্য জমিদারদের পাশাপাশি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ডেরা বাঁধল। জমিদারদের শোষণের সাথে সাথে শুরু হল জুলুম। বণিকরা কোম্পানীর বিজয়ের আধিপত্যকে পুঁজি করে গ্রামবাংলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরা নীলের এমন নিম্নমূল্য বেঁধে দিল যাতে চাষীদের উৎপাদন খরচও উঠতো না। এই নিষ্ঠুর নীলকর সাহেবরা কৃষকদের

নীল চাষে বাধ্য করত। তা না হলে বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দিত, দৈহিক অত্যাচার করত, এমনকি মহিলাদের অপরহণ করত। এছাড়াও জাল চুক্তিনামার বলে জমি-জিরাত ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতো। প্রশাসন এবং নব্য জমিদারদের সাথে ছিল এদের অন্তরের যোগ। এ কারণে পুলিশে খবর দিয়ে প্রতিকার তো হতোই না পরন্তু উল্টো ঝামেলায় পড়তে হতো। অনেক সময় জমিদাররা প্রজাকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে নীলকরদের হস্তান্তর করত। যে কারণে একজন ম্যাজিস্ট্রেট একজন খৃস্টান মিশনারীকে কথা প্রসঙ্গে বলেন- 'মানুষের রক্তে রঞ্জিত হওয়া ব্যতীত এক বাক্স নীলও ইংল্যান্ডে প্রেরিত হয় না।' (নীল কমিশন রিপোর্ট এবং ক্যালকাটা খৃস্টান অবজারভার, নভেম্বর ১৮৫৫ সাল)। ঐতিহাসিক হারান চন্দ্র চাকলাদার লিখেছেন, 'ইউরোপীয়রা এদেশে এসেছিল দাস মালিকের মনোবৃত্তি নিয়ে। নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের প্রচন্ড লোভের সংগে উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তি মিলিত হয়ে যত প্রকার উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল তার প্রত্যেকটিকেই নীলকর সাহেবরা এদেশে প্রয়োগ করেছিল।... (ফিফটি ইয়ার্স এগো, ডন ম্যাগাজিন, জুলাই, ১৯০৫)

লা'খেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

'লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে ১৮৪৭-৪৮ সাল পর্যন্ত সরকারের যাহা খরচ হয়, তাহা এই বার্ষিক আয়ের প্রায় চারগুণ ছিল। হান্টার লিখিয়াছেন যে, এই আয়ের অধিকাংশই মুসলমানদের লাখেরাজ সম্পত্তি হইতে হইত। লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির দরুন বাংলার মুসলমানদের যে কি ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া হান্টার বলিয়াছেন, শত শত পরিবার সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে এবং যে সকল মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিস্কর জমির আয়ের উপর চলিত সেগুলি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। সরকারের আঠার বৎসরব্যাপী স্বেচ্ছাচারিতামূলক কার্যকলাপের দরুন মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু এলিটদের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ১৮৩৭ সালে মুসলমানদের ক্ষতবিক্ষত করার জন্য এই বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করা হয়।

একটু গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে চক্রান্তটা সুস্পষ্টই হয়ে উঠে। ১৮১৬ খৃস্টাব্দে উচ্চ শিক্ষার জন্য কোলকাতায় প্রথম হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় থেকেই কোলকাতা এবং তার সন্নিহিত এলাকাসমূহে ব্যাপক ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ দেখা যায়। এর ফলে ১৫/২০ বছর সময়ের মধ্যে বিরাট সংখ্যক হিন্দু যুবক শিক্ষা সমাপন করে বেরিয়ে আসে। ওদিকে ইংরেজরা ভাষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের আগেই দেখা গেল ১৮৩৫ সালে ইংরেজদের সহযোগী শক্তি ঔপনিবেশিক দালাল কোলকাতার ধনাঢ্য বর্ণহিন্দুরা ৬,৯৪৭ জনের এক যুক্ত দরখাস্তে অফিস আদালতের ভাষা ইংরেজী চালু করার দাবী তোলে। ওদিকে ১৮৩২ সালে ক্যাপ্টেন টি বৃসকান সিলেক্ট কমিটির কাছে অত্যন্ত জোরের সংগে সুপারিশ করেছিলেন যে অফিসের ভাষার পরিবর্তনটা যেন মন্থর হয়। অন্যথায় বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু তার সুপারিশ অরণ্যে রোদনে পরিণত হল। ১৮৩৭ সালে অফিস আদালতে এবং ১৮৪৪ সালের ১৪ই অক্টোবর সরকারী নির্দেশ এই মর্মে জারী করা হল যে 'অতঃপর সরকারের সমস্ত দপ্তরে ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের চাকুরিতে নিয়োগ করতে হবে। (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী এম, আর আখতার মুকুল, পৃ-৭৩)

ফারসীর বদলে ইংরেজী চালু করার শক্ত পদক্ষেপ নেয়ার ফলে শিক্ষা বিভাগ এবং প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগ থেকে দলে দলে বাঙালী মুসলমানরা চাকুরীচ্যুত হয়ে বিতাড়িত হল।

'এ পরিবর্তন অপর সম্প্রদায়ের বাঙালী হিন্দুদের জন্য খুব সুখকর হয়ে উঠলো। কারণ তারা ইতিমধ্যেই ইংরেজী শিক্ষায় অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছিল। মুসলমানদের জন্য এ সময়ে ইংরেজী শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। সুতরাং হিন্দু কলেজের (পরবর্তীতে কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ) ছাত্ররা এই পরিবর্তনের পূর্ণ উপকার ভোগ করেছে। অপরপক্ষে মুসলিম আপার ক্লাস নতুন ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে সর্বস্তরের অফিস আদালত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। (ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান)

আমীর আলী আরো বলেন- "গত বিশ বৎসর যাবত মুসলমানগণ যোগ্যতা লইয়া চাকুরীতে ঢুকিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ভিণœ সম্প্রদায়ের লোকগণ প্রত্যেক সরকারী চাকুরীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখায় তাহাদের পক্ষে কোনো অফিসে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।" যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন মুসলমান চাকুরী পায়, তাহা হইলে ইহা রক্ষা করাও তাহার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠে।

উপরের আলোচনায় ব্রাহ্মণ্য চক্রের ধারাবাহিক ইতিহাসের খণ্ডিত চিত্র আমরা তুলে ধরলাম। কেননা বাংলাদেশোত্তর পরিবেশ পরিস্থিতিতে সমগ্র জাতি আবর্তিত হচ্ছে ইতিহাস বিকৃতির ঘূর্ণাবর্তের দুর্বিপাকে। এ বিশৃংখল অবস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে একাত্তরের ভয়াবহ পরিস্থিতি অনুধাবন সম্ভব নয়। এখনকার প্রজন্ম কিছুতেই বুঝতে সক্ষম হবে না 'সামনে মৃত্যু পেছনে ঝড়' এমন পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষিত সচেতন দেশপ্রেমিক তরুণরা কেন আলবদর গঠন করেছিল।

ইতোপূর্বে ব্রাহ্মণ্য চক্রের ইতিবৃত্ত যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে আলবদর গঠনের পটভূমি আলোচনার জন্য সেটুকু যথেষ্ঠ। ১৯৪৭ সালের এমন কি তার আগে থেকে সদ্য ভূমিষ্ট পাকিস্তানের কণ্ঠণালী চেপে নিঃশেষ করতে চেয়েছে ওরা উপমহাদেশের মুসলমানদের একমাত্র আশ্রয় পাকিস্তানকে জুনাগড়, মানভাদার, হায়দারাবাদ ও কাশ্মীরের মত গ্রাস করতে চেয়েছে। চেয়েছে সমগ্র পাকিস্তানকে অখণ্ড ভারতের অন্তর্ভূক্ত করতে।

ঐ একই লক্ষ্য সামনে রেখে কিভাবে তারা সুপরিকল্পিত উপায়ে পাকিস্তানকে ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে গেছে সেটাও আগের আলোচনায় তুলে ধরেছি। ৪৭ সালে ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা মুসলমান যাদের জন্ম পশ্চিম পাকিস্তানে নয় সেই সব উর্দুভাষী মুসলমানদেরকে কি নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল সেই ইতিহাস এখন আর আলোচিত হয় না। আমরা দেখেছি মুসলমানদের আশ্রয় এ ভূখণ্ডে উর্দুভাষী মুসলমানদের হিন্দুস্থানী প্ররোচনায় নির্মমভাবে হত্যা করতে। তাও একটা দুটা নয়, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে নয়, সমন্বিত পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে ৬০

হাজার বনি আদমকে। এই নির্মমতা প্রত্যক্ষ করে বিবেকবান মুসলমানরা অনুধাবন করতে সক্ষম হল যে পঞ্চম বাহিনীর অপশক্তিরা স্বাধীনতার নামে এমন এক অজানা লক্ষ্যের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলছে যেখানে মুসলমানদের ধ্বংস অনিবার্য্য, এই অনিবার্য্য ধ্বংস থেকে ৭ কোটি মানুষকে সুরক্ষার দায়ীত্বানুভূতিতে আলবদর সংগঠিত করেছিল। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষকে পিড়নের জন্য নয়। পঞ্চম বাহিনী ব্রাহ্মণ্য চক্রের সাথে হয়তো বা কোথাও সংঘাত হয়েছে হয়তো বা কোথাও মরতে মারতে হয়েছে, উপমহাদেশের মুসলমানদের একমাত্র আশ্রয় পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্য, সাতচল্লিশে অনুষ্ঠিত গণভোটের রায়কে আম্লান রাখার জন্য। ইতিহাসের কোন বিচারে সেটা অন্যায়?

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ সম্মেলনে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে পূর্ব পশ্চিম দুই অঞ্চলে দুটো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ১৯৪৬ সালে গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের দাবী স্বীকৃত হয়। এই বছরেই দিল্লীতে মুসলিম গণপ্রতিনিধি ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সমন্বিত সম্মেলনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উত্থাপিত এক পাকিস্তান প্রস্তাব দিল্লীতে গ্রহণ করা হয়। গণভোটের মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং গণ প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বীকৃত অখণ্ড পাকিস্তান যেটার স্বপক্ষে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ও শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। যে সংহতির পক্ষে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ওয়াদা করেছে, যে সংহতির জন্য মুজিব স্বাধীনতা সংগ্রামকে এড়িয়ে যাওয়ার ঝুকি নিয়ে ছিলেন সেটাকে সমুন্নত রাখার জন্য যদি কেউ সংগ্রাম করে থাকেন তার অপরাধটা কোথায়? যেখানে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে ছিলেন এবং নিজেরাই সময়মত স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। হিন্দু নেতৃবৃন্দের কুট কৌশল এবং তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্বন্ধে যাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল তারা কি করে উটকো ষড়যন্ত্রের পক্ষপুটে আশ্রয় নেয়ার কথা ভাবতে পারে। স্বাধীনতার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের কোন পরিষ্কার বক্তব্য ছিল না। এ প্রসঙ্গে আবুল বাশারের একটি উদ্ধৃতি দেয়া যায়- তিনি বলেন '৭১ সালে যখন আমরা জনগণকে প্রস্তুতির কথা বলি তখন ২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের পক্ষ

থেকে পাকিস্তান দিবস পালন করা হয় এবং আমাদেরকে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত করে।'

মেজর জলিল স্পষ্টতঃ বলেছেন 'আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দেশকে স্বাধীন করার কোন চিন্তাভাবনাই করেননি। শেষ পর্যন্ত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চিন্তা ভাবনা করেছিলেন।' আওয়ামী লীগের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অস্পষ্টতা এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যেও যখন লড়াই শুরু হয়ে গেল, সেই লড়াইয়ে সমগ্র জাতির সমর্থন থাকতেই হবে এমনটি যেমন হয় না তেমন কেউ সমর্থন ও সহযোগিতা না করলে তাকে দেশের শত্রু অথবা দেশপ্রেমিক নয় এমনটিও বলা যায় না।

'আর জাতীয় ও সর্বদলীয় সরকার করিতে হইলে যারা স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন তাদেরও নিতে হইবে। স্বাধীনতার লাভের আগে পর্যন্ত স্বাধীনতার বিরোধিতা দেশদ্রোহিতা নয় রাজনৈতিক মত বিভিন্ন তা মাত্র। ভারত স্বাধীন হইবার আগে পর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও পার্টি স্বাধীনতার বিরোধিতা ও ইংরেজ সরকারের সমর্থন করিয়াছিলেন। ভারত স্বাধীন ও পাকিস্তান হাসিল হইবার পর ঐ কারণে কেউ দণ্ডিত হয় নাই। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগের দিন পর্যন্ত বাংলার স্বাধীনতা ও পাকিস্তানের অখণ্ডতা ছিল রাজনৈতিক মত পার্থক্যের প্রশ্ন। এখন সেটা হইয়াছে আনুগত্যের প্রশ্ন। মত বিভিন্নতা দণ্ডনীয় নয় আনুগত্যের অভাবই দণ্ডনীয়। (বেশী দামে কেনা কমদানে বেচা, পৃ. ২২-২৩)

২৫ বছর ধরে গড়ে ওঠা বিশ্বাসের ভিত কোন আকস্মিক ঝড়ো হাওয়া কি উপড়ে ফেলতে পারে? পারে না। (আর পারে না বলেই তৎকালীন আওয়ামী লীগের বিবেকবান এমপি ও বুদ্ধিজীবী আব্দুল মোহাইমেন লিখেছেন- 'এছাড়া ইয়াহিয়াখানের সঙ্গে বেশ কয়েক মাস ধরে যদি আলাপ আলোচনা চলতো এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে যদি পাক সরকারের অযৌক্তিক আচরণ ও আওয়ামী লীগের যৌক্তিক দাবীর পার্থক্য জনসাধারণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট স্পষ্ট হওয়ার মত যথেষ্ঠ সময় পাওয়া যেত তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের মনোভাবেরও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হওয়ার সুযোগ ঘটতো। এই রূপ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের বিরোধী দলের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দও

হয়তো স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে একাত্ম হয়ে যেত। কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে যাওয়ায় অনেকে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নাই। (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, পৃ. ৩)

আওয়ামী বিরোধী নেতৃবৃন্দ অথবা সচেতন দেশপ্রেমিক তরুণরা কখনই একাত্ম হতে পারতো না। পঞ্চম বাহিনী যারা জেনে বুঝে জাতিকে সর্বনাশের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে তাদের সাথে দেশপ্রেমিক জনগণ একাত্ম হয় কি করে? যাদের চেতনা নেই যারা তন্দ্রাচ্ছন্ন অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের ভাবনা যাদের উদ্বিগ্ন করে না তারাই উন্মাদনার তোড়ে হালকা হাওয়ায় ভেসে চলে কেবল মাত্র তারাই আওয়ামী বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। এদেশ এ জাতির পূর্বাপর ইতিহাস যাদের জানা আওয়ামী লীগ কোন গন্তব্যে জাতিকে টেনে নিয়ে চলেছে সেটা তাদের অজানা নয়। তারা যে আশঙ্কা করেছিল সেসব আশঙ্কা প্রমাণিত হয়েছে বললে ভুল হবে, প্রতিটি আশঙ্কা কুরে কুরে নিঃশেষ করেছে সমগ্র জাতিকে।

১৬ ব্লাক ডিসেম্বর ঢাকা পতনের পর ভারতীয় বেনিয়া চক্র মিত্রবাহিনী দেশী বিদেশী লুটেরা এককভাবে অথবা সংঘবদ্ধভাবে শুরু করেছিল লুণ্ঠন, সে লুণ্ঠন ছিল ভয়াবহ। সিরাজের পতনের পর লর্ড ক্লাইভের সৈন্যরা উমিচাঁদ জগতশেঠের সামনে বাংলার সম্পদ যেমন করে লুণ্ঠন করেছিল সেই ষ্টাইলে আবার লুণ্ঠন হল বাংলার সম্পদ। মিত্র বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানী বাহিনীর পরিত্যাক্ত অস্ত্রসস্ত্র গোলা বারুদ যুদ্ধ সরঞ্জাম এমনকি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে মেশিন পত্র ও মালামাল পাচার হয়ে গেলে পঞ্চম বাহিনীর সহযোগী এদেশের সম্ভাবনাময় তরুণদের লেলিয়ে দেয়া হল আলবদর রাজাকার দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ নিধনে।

মেজর জলিল লিখেছেন- দেশপ্রেমিক মুক্তি যোদ্ধারা ১৬ ডিসেম্বরের পরে ভারতীয় সেনাবাহনীকে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ ও মালামাল লুট করতে দেখেছে, সে লুণ্ঠন ছিল পরিকল্পিত লুণ্ঠন, সৈন্যদের উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ নয়। সে লুণ্ঠণের চেহারা ছিল বিভৎস বেপরোয়া, সেলুণ্ঠন ছিল সচেতন প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিক তৎপরতা।'

'১৯৭২ সালে ২৭ মার্চ দিল্লীকে খুশী করার জন্য শেখ মুজিব ভারতের সাথে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেন। ওপেন বর্ডার ট্রেড আরম্ভ হল. . . বাধা বিপত্তির ফলে পূর্বে যে প্রকার মাল সীমান্ত অতিক্রম করত তার দশ বিশগুণ মাল ভারতে পাচার হয়ে গেল। (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগঃ এম এ মোহাইমেন)

এ চুক্তি যে বিপুল আয়তনের চোরা চালান বিপুল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ দিয়াছে তার কবল হইতে বাংলাদেশ আজো মুক্ত হতে পারে নাই। (আমার দেখার রাজনীতির ৫০ বছর: আবুল মনসুর আহমদ)

বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া সম্পদের বিনিময়ে এদেশ পেল জাল নোট, পাচার হয়ে আসা জাল নোটে সয়লাব হয়ে গেল দেশ। অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিন স্বীকার করলেন মুদ্রা পাচারের ফলে জাতীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে।

আখতারুল আলম লিখেছেন- 'টাকা বদলের নামে বাংলার অর্থনীতি ফোকলা করে দেয়া হয়েছে। বর্ডার বাণিজ্যের নামে বাংলাদেশকে পরিণত করা হয়েছিল ভারতের পঁচা মালামালের বাজারে ও পাটের রাজা বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল পাটহীন। পক্ষান্তরে পাটহীন আগড়তলায় স্থাপিত হয়েছিল গোটা পাঁচেক পাটকল। কোলকাতার পাটকলগুলি কয়েক শিপ্ট চালিয়েও কুলাতে পারছিল না।

দৈনিক ইত্তেফাকে (১৫ মে, ৭৩) লেখা হলো- 'গত কয়েক বছরে ৪ হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যের জাহাজ চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। অক্ষুণœ ৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার হইয়া গিয়াছে চট্টগ্রামগামী ত্রাণ সামগ্রীর জাহাজ অদৃশ্য ইংগিতে কোলকাতা বন্দরে ভিড়তো এবং সেখানেই মালখালাস হত। পানির দামে বিক্রয় লব্ধ অর্থ জমা হত নেতাদের একাউন্টে।

ওয়াশিংটন পোষ্ট লিখেছে, স্বাধীন হবার ফলে শুধু গুরুত্বপূর্ণ আভ্যান্তরীণ বাজারই হারায়নি রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনায় উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা এবং প্রধান প্রধান আমদানী পণ্যের আভ্যান্তরীণ উৎস হাত ছাড়া হয়েছে। পাট

শিল্পকে ধ্বংস করা হল। ৭১টি পাটের গুদামে আগুন জ্বালান হল। মাত্র কয়েক বছরে ৫০ লাখ বেল পাট ভারতে পাচার হয়ে গেল। শিল্প সমূহকে রাষ্ট্রায়ত্ব করে শত শত কোটি টাকা লোকসান গুণতে হল।

৮০ শতাংশ চায়ের বাগান বন্ধ হয়ে গেল। ক্ষমতাসীনদের অর্থ লিপ্সার যোগান দিতে লক্ষ লক্ষ কারিগর বেকার হয়ে পড়ল, চার লাখ হস্ত চালিত তাঁতের মধ্যে কোন মতে টিকে রইল দেড় লাখ, ৭ হাজার বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের মধ্যে বন্ধ হল ৩ হাজার। বাজার দখল করল ভারতীয় কাপড়। বাংলাদেশের সম্পদ লোপাট এবং শিল্প সেক্টরকে পঙ্গু করেই অশুভ চক্রান্তের শেষ হল না, মুমূর্ষু অর্থনীতির যতটুকু স্পন্দন ছিল সেটুকু নিঃশেষ করে ২৪ বছর ব্যাপী পাকিস্তান ধ্বংসের ভারতীয় সাধনা ও সাহায্য সহযোগিতার দায় পরিশোধ করে চলল আওয়ামী লীগ।

যাদের শেখ মুজিব সম্মোহিত করতে পারেনি সেই সব দেশপ্রেমিক ১৬ ডিসেম্বরের পর হারিয়ে গেল দৃশ্য পটের বাইরে। সম্মোহিত তরুণদের যারা সচেতন হয়ে উঠলো তাঁদের হত্যা করা হল অথবা পঙ্গু করে দেয়া হল। এদের আর্তনাদ ও জনগণের বিলাপ যেন কখনো ঝড় না তুলতে পারে- এজন্য সংবাদপত্র সবগুলো বন্ধ করে দেয়া হল। মুজিবের স্তূতির জন্য বাচিয়ে রাখা হল মাত্র ৪টি সংবাদ পত্র।

আওয়ামী লীগের মেজর রফিকুল ইসলাম লিখলেন স্বাধীনতার পর এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চলল বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করার। উৎপাদন কমে গেল বেড়ে গেল, শ্রমিক অসন্তোষ। মূলক কার্যকলাপ বেড়ে গেল। বেড়ে গেল গুপ্ত হত্যা। শিল্প কারখানা ধংস হল। কোন অদৃশ্য অশুভ শক্তি যেন বাংলার মানুষকে নিয়ে রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠল। ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হল অনেকে। সেই সব সৌখিন দেশপ্রেমিক সবাই মিলে ছারখার করেছিল বাংলার মানুষের স্বপ্ন সাধ। চোরাকারবারের লাইন ওরা আগেই ঠিক করে রেখেছিল, পুরো দেশ ছেয়ে গেল অবৈধ ব্যবসায়। প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হল জাদরেল সরকারী কর্মচারী ব্যবসায়ী আর কিছু রাজনৈতিক কর্মী। শক্তিশালী মহলের সমর্থন না পেলে এই বিরাট আকারের অবৈধ ব্যবসা সম্ভব হতো

না। তাহলে এ কথা কি বলা যায় না যে, কোন প্রভাবশালী মহলের প্রচেষ্টায় ধ্বংস হয়েছে এদেশের অর্থনীতি।

আওয়ামী লীগ এদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে সমৃদ্ধ এদেশটিকে তলাবিহিন ঝুড়িতে পরিণত করেছিল। শুধু তাই নয় মাত্র তিন বছরের মধ্যে একটা দুর্ভিক্ষ উপহার দিয়েছিল। সিরাজের পতনের পর শোষণ লুণ্ঠণের পরিণতি দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হতে ১৩ বছর লেগেছিল। কিন্তু হিন্দুস্তানী লুণ্ঠন এবং পঞ্চমবাহিনী আওয়ামী লীগের শোষণ এদেশে ৩ বছরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছে। আরো ভয়াবহ চিত্র দেখতে পেত এদেশের মানুষ যদি না আগস্ট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মুজিবের পতন হত।

মুজিবের পতনের মধ্য দিয়ে নদীর পানি উজানে বইলেও জাতীয় চেতনার উত্থান হয়নি, পুরানো পাকে আবর্তিত হচ্ছে দেশ। এখানে পঞ্চমবাহিনী এখনো সক্রিয়- এখনো একাত্তরের স্রোত ধাক্কা দিচ্ছে নৌকাডুবির সম্ভাবনা না থাকলেও পালে হাওয়া লাগতে দিচ্ছে না চেতনার স্থবিরতা। নবম সেক্টরের অধিনায়ক মেজর জলিল তার দেশ লোপাট হতে দেখেছেন মিত্রবাহিনী অর্থাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে। প্রতিবাদ করেছিলেন- নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কারাগারে। কারাপ্রকোষ্টে তার নব চেতনার উন্মেষ হয়েছিল, সেই চেতনা তাকে তাঁড়িয়ে নিয়ে ছিল আওয়ামী বিরোধী অবস্থানে। সেখান থেকে তিনি যুদ্ধ করে গেছেন পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে। তিনি নেই, কিন্তু তার জিজ্ঞাসা বিমূর্ত হয়ে রয়েছে। কোটি কণ্ঠে যেদিন এ জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হবে সেদিন চিহ্নিত হবে এদেশের প্রকৃত পঞ্চমবাহিনী। পাল্টে যাবে ইতিহাস- হাওয়া লাগবে দেশের পালে। মেজর জলিলের জিজ্ঞাসা- "স্বাধীনতার ১৭ বছর পরেও আমার মত একজন সাধারণ লড়াকু মুক্তিযোদ্ধার মনে এ প্রশ্নগুলো নিভৃতে উঁকি-ঝুঁকি মারে এ কারণেই যে, ২৫ মার্চ সেই ভয়াল রাতের হিংস্র ছোবলের সাথে সাথেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী এবং পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবর্গ কি করে পাকিস্তানের শত্র" হিসাবে পরিচিত ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটে যেতে পারল? তাহলে কি স্বাধীনতা বিরোধী বলে পরিচিত ইসলামপন্থী দলগুলোর শঙ্কা এবং অনুমান সত্য ছিল? তাদের শঙ্কা এবং

অনুমান যদি সত্যই হয়ে থাকে তাহলে দেশেপ্রেমিক কারা? আমরা মুক্তিযোদ্ধারা না রাজাকার আলবদর হিসেবে পরিচিত তারা? এ প্রশ্নের মীমাংসা আমার হাতে নয়, সত্যের উৎঘাটনই কেবল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ধারণ করবে। (মেজর (অবঃ) এম এ জলিল: অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃ. ৭-৮)

কেড়ে নেয়া হল মুসলমানদের মুখের ভাষা

পাঁচ সাতশ' বছর ধরে একটানা মুসলিম শাসনামলে আরবী ফারসী সমন্বয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে মিশ্র প্রক্রিয়ায় সহজভাবে ভাব প্রকাশের জন্য একটা ভাষার উদ্ভব হয়েছিল সেটাকে বলা হত চলতি ভাষা অনেকে বলত মুসলমানী ভাষা।

এই ভাষার পরিচয় যে যেভাবেই উপস্থাপন করুক না কেন, এটা ছিল হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এদেশের প্রতিটি মানুষের মুখের ভাষা। এ সত্বেও হিন্দু পণ্ডিতরা এই ভাষাকে অবজ্ঞা অবহেলার চোখে দেখত। এর কারণ সম্ভবত এ ভাষাতে ছিল আরবী ফারসী উর্দু শব্দসমূহের সহজ মিশ্রণ। এছাড়াও ছিল এর মধ্যে মুসলিম সংস্কৃতির স্বাচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার। হিন্দু মানসিকতার কাছে এটা ছিল দুর্বিসহ।

ওদিকে খৃস্টান মিশনারীদের লক্ষ্য যেহেতু হিন্দু জনগোষ্ঠী- তারা হিন্দুদের উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাদের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। খৃস্টান মিশনারী ও হিন্দু পণ্ডিতরা বাংলা ভাষাকে আরবী-ফার্সীর ছোঁয়াচ্ থেকে রক্ষা করে হিন্দু গ্রহণযোগ্য করা এবং মুসলমানদের বাংলা বা মাতৃভাষার ধ্বংসযজ্ঞ সম্পাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (Halhed) ১৭৭৮ সালে A Grammar of the Bengali Literature নামে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এবং শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে। এইটিই ছিল প্রথম- যাতে প্রথম বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। এরপর শুরু হয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ামে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। তখন থেকে সংস্কৃত স্টাইলের বাংলা ভাষায় মুসলমান বিবর্জিত বিষয়বস্তু নিয়ে পুস্তক প্রকাশ শুরু হয়।

আব্দুল মওদূদ বলেন- "এই মিশ্রনীতির বাংলাভাষায় সাহিত্য গড়ে উঠার মুখেই বণিকের তুলাদণ্ড হলো রাজদণ্ডে রূপান্তরিত এবং বণিকের তল্পীবাহক মিশনারীরাও দিলেন সাহিত্যের ভাষায় মোড় পরিবর্তন করে।. . . পাশ্চাত্যের শিক্ষার প্রবর্তকরা বাংলা ভাষার কাঠামোকেও নতুন ছাঁচে তৈরী করে দিলেন- বাবু সম্প্রদায়ের জন্যে। তার দরুন বাবু কালচারের আবাহন হলো যে ভাষায় তা কেবল সংস্কৃতঘেঁষা নয়, একেবারে সংস্কৃতসম। (আব্দুল মওদূদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃ. ৩৮৫)

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে দেওয়া হল

বিহারে ৪ কোটি মানুষের জন্য এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। একজন প্রাচ্য বিশারদ বলেন, ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ৩০ বছর পূর্বে বাংলায় ৮০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ফারুক মাহমুদ লিখেছেন, তৎকালীন বাংলায় ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এ সত্বেও মাত্র কয়েক যুগের ব্যবধানে শিক্ষার উজ্জল দিগন্ত থেকে ছিটকে হারিয়ে গেল অন্ধকারের অতল গহবরে। কিন্তু কিভাবে এমনটি হল।

মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অর্থনৈতিক উৎস ছিল লাখেরাজ সম্পত্তি। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ অর্থ সংকটে অচল হয়ে পড়েছিল। বৃটিশ হিন্দু যৌথভাবে এমন নীতি অবলম্বন করেছিল যেন মুসলমানরা তাদের বিধ্বস্ত বর্তমানকে সালাম দিতে ব্যস্ত থাকে।

এম. এ রহিমের ভাষায়- 'হিন্দু জমিদারগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ববাংলায় কোন কোন জমিদার তাঁহাদের জমিদারীতে স্কুল স্থাপন না করিয়া পশ্চিম বাংলার হিন্দু এলাকায় স্কুল স্থাপন করেন। ঠাকুর পরিবার এবং আরও অনেক হিন্দু জমিদারের পূর্ববাংলায় জমিদারী ছিল। তাঁহারা কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলায় বাস করিতেন এবং সেখানকার লোকের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন। তাহারা পূর্ববাংলায় নিজেদের জমিদারীর প্রজাদের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করেন নাই। কোন কোন জমিদার প্রজাদের

শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁহারা মনে করিতেন যে, প্রজাগণ শিক্ষিত হইলে জমিদারীতে তাঁহাদের কর্তৃত্ব দুর্বল হইয়া পড়িবে। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, এম. এ রহিম, পৃ. ১১২)

এ প্রসঙ্গে ইসি বেইলী বলেন- 'শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ ছিল, এটা প্রবর্তন করার সময় তাদের সংস্কার সম্বন্ধে কোনরূপ বিবেচনা করা হয়নি এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য করা হয়নি। এই জন্য শিক্ষাপদ্ধতি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতিকূল হয়ে পড়ে।"

বৃটিশ ও বর্ণ হিন্দুদের উদ্যোগে ধ্বংস হল বাংলার শিল্প

বাংলার এই বিপুল ঐশ্বর্যের প্রতি বৃটিশ বেনিয়াদের ছিল অপরিসীম লোভ। এই সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল তাদের দীর্ঘ কালের প্রয়াস। সুদীর্ঘকাল ধরে সুপরিকল্পিতভাবে তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা কাজ করে গেছে। প্রথমত তারা এদেশের ধনিক বণিক বিশেষ করে হিন্দু বণিকদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করে। বাংলার রাজদরবারে এসব বণিকদের প্রভাব থাকার কারণে তাদের মাধ্যমে বৃটিশরা সব ধরণের বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে নেয়।

দ্বিতীয়ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত বিদেশী বণিকদের বাংলাদেশের বাজার থেকে বিতাড়িত করে। কখনো শক্তি প্রয়োগ করে, কখনো হিন্দু বেনিয়া রাজা মহারাজাদের মাধ্যমে রাজদরবারে প্রভাব বিস্তার করে সরকারী নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে অন্যান্য বিদেশী বাণিকদের বৃটিশরা বাংলা ছাড়া করে। মসলিন সূতী কাপড়, রেশম ও রেশমজাত বস্ত্র, চিনি, চাউল, আফিম সল্টপিটার ইত্যাদি রপ্তানীর ক্ষেত্রে মনোপলি প্রতিষ্ঠা করে, সিরাজের পতনের পর বলতে গেলে সব কিছুর উপর বৃটিশদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

উইলিয়াম বোল্ট নামে একজন ইংরেজ বাংলার তাঁতীদের উপর কোম্পানীর নিপীড়নের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন- 'ইংরেজ এবং তাদের অনুগত হিন্দু বেনিয়া এবং গুমস্তাগণ নিজেদের মর্জি মাফিক কাপড়ের দর বেঁধে দিয়ে সেই

নির্দিষ্ট দরে কাপড় সরবরাহে বাধ্য করত। নীলকরদের মত তারা বাধ্য করত তাঁতীদের স্বার্থবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করতে। কোম্পানীর বেঁধে দেয়া বাজার দর থেকে শতকরা ১৫ থেকে ৪০ ভাগ কম হত। তাদের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বস্ত্র সরবরাহ করতে না পারলে তাঁতীদের বেত্রাঘাত করা হত।' পরবর্তীতে কোম্পানী বাংলার বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করার জন্য বাংলার উৎপাদিত বস্ত্র ইংল্যান্ডে না এনে কাঁচামাল হিসাবে রেশম এবং কার্পাস আমদানী করত। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে বাংলার তাঁত শিল্প ধ্বংসের ক্ষেত্রে আর একমাত্রা যোগ হয়। স্থানীয় উৎপাদিত যন্ত্রের উপর কোম্পানী শুল্ক নির্ধারণ করার ফলে ইংল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় এদেশের তাঁতীরা কুলিয়ে উঠতে পারে না। এভাবে দেশের তাঁতশিল্প পর্যায়ক্রমে মার খেতে খেতে তার অস্তিত্ব হারাতে থাকে। বৃটিশের নীতি ছিল এদেশের তাঁতী সম্প্রদায়কে নির্মূল করা।' (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : আব্দুল মওদুদ)

এদেশের ভাগ্যাহত তাঁতীদের দুঃখ দূর্দশা সম্পর্কে পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু বলেন- 'এসব তাঁতীদের পুরানো পেশা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নতুন কোন পেশার দ্বারও উন্মুক্ত ছিল না। উন্মুক্ত ছিল শুধু মৃত্যুর দ্বার। মৃত্যুবরণ করলো লক্ষ লক্ষ। লর্ড বেন্টিং ১৮৩৪ সালের রিপোর্টে বলেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশার তুলনা নেই বাণিজ্যের ইতিহাসে। ভারতের পথঘাট পূর্ণ হয়েছে তাঁতীদের অস্থিতে'। (Pandit Nehru Discovery of India, P-352)

বঙ্গ ভঙ্গ ও মুসলমানদের নব চেতনার উন্মেষ

১৯০৩ সালে বড় লাট লর্ড কার্জন ঢাকায় সফরে এলে নওয়াব সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার সমস্যাগুলো তুলে ধরে এতদাঞ্চলের দারিদ্র পীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য গ্রহণযোগ্য কিছু একটা করার আবেদন জানান। ওদিকে আসামের উৎপাদিত চা ও অন্যান্য পণ্য বিদেশে রপ্তানীর ব্যাপারে পরিবহন ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে কোলকাতার বদলে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের চিন্তা করে বৃটিশরা। এই সাথে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণেও ভাবনা চলতে থাকে। বৃটিশদের বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং নবাবের আবেদন যুক্ত হয়ে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলা বিভাজনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পলাশী

উত্তর ভাগ্যবান জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জ্বলে উঠল। কোলকাতা কেন্দ্রীক বুদ্ধিজীবী ব্যবসায়ীদের তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও ১৯০৫ সালে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হল। বঙ্গভঙ্গ বর্ণ হিন্দুদের জন্য মোটেও সুখদায়ক হয়নি। বঙ্গভঙ্গের উপর আঘাত হানার জন্য শ্রেণী স্বার্থে তৎপর হয়ে উঠল তারা। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত ৩০০০ প্রকাশ্য জনসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হল এবং প্রতিটি জনসভায় ৫০০ থেকে ৫০, ০০০ শ্রোতা উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে।

দলিত নেতা ডক্টর আম্বেদকর লিখেছেন- বাঙালী হিন্দুরা সমগ্র বাংলা উড়িষ্যা আসাম এমনকি ইউপিকেও তাদের কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। এসব অঞ্চলের সিভিল সার্ভিসের পদসমূহে তারাই অধিষ্ঠিত ছিল। বাংলা বিভাগের অর্থ ছিল তাদের বিরাট কর্মক্ষেত্রের ক্ষতি হওয়া। বাঙালী মুসলমানরা যেন পূর্ব বাংলায় তাদের স্থান দখল করতে না পারে সেটাই ছিল হিন্দুদের কাম্য। বিশেষত এসব কারণেই তারা বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতা করেছিল।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব রচিত হয়। বর্ণবাদী হিন্দু জমিদার ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবীদের প্ররোচনায় সামগ্রিকভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠী হিংস্র হয়ে উঠে। সমগ্র উপমহাদেশেব্যাপী মুসলিম বিদ্বেষ এবং বৈরিতার ঝড় বয়ে যায়। মুসলমানদের উপরে হিন্দুরা হিংস্র এবং খড়গহস্ত হয়ে উঠে। ঐতিহাসিক এম. এ. রহিম এনসি ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- 'বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষ দেখা দেয়। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের এইরূপ বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয় যে তাহাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন থেকে ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। পরে ক্রমশ সীমিত হয়ে আসে। লর্ড মার্লো লর্ড মিন্টো ও বৃটিশ সরকারের বড় কর্তারা মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বঙ্গ বিভাগ ব্যবস্থা একটা Settled fact কখনও এর পবির্তন হবে না। ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার সম্পূর্ণ গোপনে এমনকি বৃটিশ পার্লামেন্টকে না জানিয়ে সম্রাটের অনুশাসন হিসাবে Settled fact কে unsettled করে দিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উল্লসিত হয়ে উঠলেন, মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রচণ্ড আঘাতে মুহ্যমান হলেন।

ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃটিশরা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের আহত আত্মায় কিছুটা সান্ত্বনার প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা করে। কোলকাতায় বর্ণ হিন্দুরা সেটাকেও সহ্য করতে পারলো না। সুরেন্দনাথ বন্দোপাধ্যায় একদল হিন্দু প্রতিনিধি সহকারে ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

আর এক অশনি সংকেত

১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু জনগোষ্ঠী শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগামী হওয়ার কারণে এর সার্বিক নেতৃত্বে তারাই সমাসীন হন। একারণে এটা হিন্দু জনগণের একক সংগঠন হিসাবে কেউ মনে করলে ভুল হবে না। ভারতবাসীর একক সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েসন গঠনের উদ্যোগকে স্যার সৈয়দ আহমদ সমর্থন দেননি। কিন্তু কংগ্রেস আত্মপ্রকাশ করার পর হিন্দু ও উর্দুর বিরোধ সৃষ্টি হলে ১৮৮৯ সালে সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং ইউনাইটেড ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েসন গঠন করেন। এরপর থেকে স্থানীয়ভাবে সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। এদিকে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র ভারত জুড়ে হিন্দু জনগোষ্ঠীর তুলকালাম কাণ্ড এবং মুসলিম বিদ্বেষের ঝড় বয়ে যায়। এর ফলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সর্ব ভারতীয় মুসলিম সংগঠনের ব্যাপারে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কংগ্রেস ৬টি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৩৯ সালের ১৫ই নভেম্বর/ ২২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় ক্ষমতাসীন ছিলো।

ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যে হিংস্রতা, বর্বরতা ও আদিম আক্রোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ছিল সেটাই মুসলমানদেরকে তাদের অনিবার্য পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল। কংগ্রেসী শাসনের অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে এমন এক উদ্যাম প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল যে তারা ভারত ভেঙে পাকিস্তান অর্জন না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়নি।

এ দু'বছর কাল স্থায়ী কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা ত্রিশটি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জন্ম দেয়। ফয়েজাবাদের টান্ডা নামক ছোট শহরে ৭০ জন মুসলমান পুলিশের গুলীতে নিহত হয়। ২শ' জন মুসলমানকে শিকল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হয়। এমনকি মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের দড়ি দিয়ে বাধা হয়। মধ্য প্রদেশের চাঁদপুরে চারশো মুসলমানকে দড়ি দিয়ে পা বেঁধে টেনে হেঁচড়ে আদালতে হাজির করান হয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ ১৫০ জন নরনারী ও শিশুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। দু'জন মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং ২৪ জনকে দেয়া হয় দ্বীপান্তর।

এ সময় শেরে বাংলা ফললুল হক তার বিবৃতিতে বলেন- 'কংগ্রেসী নীতির দরুন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে অদলীয় সরকারসমূহ কর্তৃক আরোপিত বিধি নিষেধের বেড়া মারমুখো হিন্দুরা ভেঙ্গে ফেলেছে। মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর তারা নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। এই ইচ্ছা কি?. . . গোমাতাকে সম্মান দেখাতে হবে। মুসলমানদের গরুর গোস্ত খেতে দেয়া হবে না। মুসলমানদের ধর্মকে অবমাননা করতে হবে। কেননা এটা হিন্দুদের দেশ, সে কারণে আযান বারণ করা, নামাজের সময় মসজিদের সম্মুখে হৈহুল্লোড় করা ও বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ হচ্ছে। সুতরাং মর্মান্তিক ঘটনার পর মর্মান্তিক ঘটনা যদি ঘটে এবং দুধের নহরের পরিবর্তে রক্তের স্রোত যদি বয়ে যায় তাহলে বিস্ময়ের কি আছে?

ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক আয়ান ষ্টিফেন লেখেন: যুক্ত প্রদেশ ও অন্যান্য স্থানের প্রাদেশিক মন্ত্রীরা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার বিষয়টা নিজেদের দৈনন্দিন কাজের অঙ্গীভূত করে নেন। এতে অহিন্দুদের মধ্যে বিরূপতা দেখা দেয়। মুসলমানদের ওপর সব রকম চাপ ও হয়রানী শোনা যেতে লাগল। স্কুলের ছাত্রদের হিন্দু পদ্ধতিতে জোড়হাতে মিঃ গান্ধীর প্রতিকৃতি পূঁজা করার ব্যবস্থা চালু করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তিকর উপন্যাসের বন্দে মাতরম সঙ্গীত ছাত্রদের গাইতে বলা হয়। গরুর গোস্ত খাওয়া বন্ধ করার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চলে। উর্দুভাষা ও বর্ণমালা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। বড় বড় চাকুরিতে

হিন্দুদের নিয়োগ করা হতে লাগল। দাঙ্গার সময় প্রশাসন হিন্দুদের পক্ষাবলম্বন করে।

কুপল্যান্ড লিখেছেন: কংগ্রেস পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক নীতি উপেক্ষা করে নিজেদেরকে পুরোপুরি ও চিরস্থায়ীভাবে জাতীয় সরকার হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে। দুটো ছোটখাট ঘটনা থেকে এর প্রমাণ মেলে। প্রথমত ক্ষমতা লাভের সংগে সংগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিচালিত সংস্থাসমূহের ভবনের ওপর নিজেদের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ানো এটা সংখ্যালঘুদের ওপর ছিল একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। দ্বিতীয়ঃ আইন পরিষদের উদ্বোধনীতে বন্দেমাতরম সংগীত গাওয়া হয়। এটাও সংখ্যালঘুদের ওপর ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। আর এটা ছিল অধিকতর আক্রমণাত্মক। কারণ বন্দে মাতরম সংগীতের কোন কোন ছত্রে ইসলামকে ক্ষুন্ন করে হিন্দুধর্মকে উচ্চাসন দিয়েছে। ফলে মুসলিম সদস্যরা ওয়াক আউট করেন।

এল এফ রাশ ব্রুক উইলিয়াম লিখলেন: কংগ্রেস শাসন থেকে সংখ্যালঘুরা এই সত্যই উপলব্ধি করতে পারলো যে প্রশাসনিক এমনকি শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ তাদের রক্ষা করতে পারবে না। কেননা বিষয়টা শাসকগোষ্ঠীর মানসিকতার সাথে জড়িত। আর শাসক দল অপরাপর দলগুলিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে পরাজিত বলে মনে করে। তাছাড়া সমঝোতা বলে কোন শব্দ কংগ্রেসের ইতিহাস আছে বলে মনে হয় না। কংগ্রেস কেবল নিজেদের প্রগতি প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের সোলএজেন্ট বলে মনে করে।

জিন্নাহ বললেন, সামান্য ক্ষমতা হাতে পাওয়া মাত্রই শুরুতেই ক্ষমতাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এটাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে যে, 'হিন্দুস্থান হচ্ছে হিন্দুদের জন্য।'

ফ্রাঙ্ক মরিয়মের মতে নির্বাচনের পর যদি কংগ্রেস মুসলিম লীগের সাথে সতর্কভাবে ব্যবহার করত তাহলে হয়তো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতো না।

আজন্ম লালিত বৈরিতা ও মুসলিম বিদ্বেষ পোষণ করা সত্বেও মুসলমানরা উপমহাদেশের স্বাধীনতার সৌজন্যে মৈত্রির দুটো হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু

সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতৃত্ব মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কেবল নিক্ষেপ করে ঘৃণা ঘৃণা এবং ঘৃণা। স্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তাহীন মুসলমানরা তাদের নিশ্চিত বিপর্যয় থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য নিজস্ব পথ এবং পদ্ধতির তালাশ করে। দূরদর্শী বিচক্ষণ কায়দে আযম হিন্দু মুসলিম ঐক্যের স্বপক্ষে সংগ্রাম করে ব্যর্থ হন। হিন্দু ষড়যন্ত্রের গভীরতা আঁচ করে ফিরে আসেন তার আপন বলয়ে। উপমহাদেশের ১০ কোটি মুসলমানের চূড়ান্ত পরিণতির কথা ভেবে তিনি শিউরে উঠেন। অবশেষে তার অনুভূতির গভীর থেকে উৎসারিত চেতনার নির্যাস দিয়ে দ্বিজাতি তত্ব পেশ করেন। জাতি যেন এর প্রতীক্ষায় ছিল এতদিন। তার এ তত্বের বাস্তবতা ঝড় তোলে টেকনাফ থেকে খাইবার পর্যন্ত। এখানে ভাষা উপক্ষিত হয়। আঞ্চলিকতা উপেক্ষিত হয়। উপমহাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমান একই চেতনার প্লাবনে ভেসে যায়।

নেহেরু যখন কোলকাতায় ঘোষণা করলেন, আজকের ভারতে শক্তি রয়েছে দুইটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অন্যটি কংগ্রেস। জিন্নাহ বললেন, না দুটো নয় আর এক তৃতীয় শক্তি রয়েছে। সেটা হল ভারতের ১০ কোটি মুসলমানের প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ।

১৯৪০ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী হিন্দু ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বললেন: সেটা যদি আপনারা আজও বুঝে না থাকেন তাহলে আমি বলি আপনারা কখনও বুঝবেন না।. . . গ্রেট বৃটেন ভারত শাসন করতে চায়। মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস ভারত ও মুসলমানদের শাসন করতে চান। আমরা বলি বৃটিশ অথবা মিঃ গান্ধীকে মুসলমানদের ওপর শাসন করতে দেব না।

৬ই মার্চ বললেন. . . 'যদি বৃটিশ সরকার মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী কোন প্রকার সমঝোতা কংগ্রেসের সংগে করে আমরা তা টিকতে দেব না।

পাকিস্তান প্রস্তাব ও মুসমানদের নবযাত্রা

হিন্দুদের বৈরিতা ও সংঘাতপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মুসলমানদের চেতনায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ঐক্যবদ্ধ চেতনাই ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তান প্রস্তাব হিসাবে প্রকাশ পায়। লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম

সম্মেলনে শেরে বাংলা ফজলুল হক এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়: ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সীমানা সুসামঞ্জস্য করে এ সকল অঞ্চল এমনভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে যাতে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল অঞ্চলসমূহকে যেন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় এবং এই রাষ্ট্র গঠনকারী অংশসমূহ স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

কংগ্রেসের দাবী ছিল প্রথমত কংগ্রেসই ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয়ত স্বাধীন ভারত হবে অখণ্ড। কংগ্রেসের এই দাবীকে মুসলিম লীগ চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইল মুসলমান ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ। ডিপি যেমন লিখেছেন- ‘মুসলিম লীগ ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছিল যে, পাকিস্তানের প্রশ্নে এবং মুসলিম লীগই যে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান এই দাবীতে তারা নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছেন, জিন্নাহ ও লীগের অন্য মুখপাত্রগণ ঘোষণা করেন যে, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলা ও আসাম প্রদেশগুলির সমন্বয়ে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান নামক একটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে ৩০টি মুসলিম আসনের ৩০টিতে বিজয়ী হয় মুসলিম লীগ। ১৯৪৬ সালের ফেব্র“য়ারীতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের ৪৯৫টি আসনের মধ্যে ৪৩৪টি আসনে জয়লাভ করে মুসলিম লীগ। ওয়াল ব্যাঙ্ক লিখেছেন- ‘জিন্নাহর প্রতিষ্ঠান যে ভারতের জনগণের মুখপাত্র এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ রইল না।’

১৯৪৬ সালে ৯ই এপ্রিল ৪৭০ জন মুসলমান পরিষদ সদস্যবর্গের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব গ্রহীত হয়। এই প্রস্তাবের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ বলা হয় ঃ ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের বাংলা ও আসাম এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান অঞ্চলসমূহ যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগুলোর সমন্বয়ে

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র করা হোক, এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্র“তি অবিলম্বে দেয়া হোক। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল দলীয় সম্মেলনে, যেখানে বলা হয়েছিল, উপমহাদেশে এক বা একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের কথা। কিন্তু দিল্লীতে গৃহীত এক পাকিস্তানের প্রস্তাব অধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। কেননা একদিকে দিল্লী সম্মেলন দলীয় সম্মেলন অন্যদিকে একে বলা চলে মুসলমানদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মেলন। এ সম্মেলনে এক পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাংলা খণ্ডিত হল বর্ণ হিন্দু ষড়যন্ত্রে

কায়দে আযমের অক্লান্ত পরিশ্রম, তার সদিচ্ছা, ক্ষুরধার যুক্তির প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী ভারত বিভক্তির প্রশ্নটি যখন চূড়ান্ত হল। তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অখণ্ড বাংলার স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠলেন। শরত বসু তার সমর্থনে এগিয়ে এলেন। মুসলিম ভারতে অবিসংবাদিত নেতা কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আপত্তি না জানিয়ে স্বাগত জানালেন। কিন্তু বর্ণ হিন্দুরা বাংলা বিভাজনের জন্য তৎপর হয়ে উঠল। হিন্দু মহাসভার নেতা ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ২৩ ফেব্র“য়ারী এক বিবৃতিতে বললেন- ‘মুসলমানদের জন্য যদি ভারত বিভক্ত হয় তাহলে হিন্দুদের জন্য বাংলা বিভক্ত হতেই হবে। ৫ই এপ্রিল তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা সমম্মেলনে স্বতন্ত্র হিন্দু বাংলা কংগ্রেসের ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় দলভুক্ত নেতা ও কর্মীরা বাংলা বিভাগের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠে। প্রবল ইঙ্গহিন্দু বিরোধিতার মুখে বাংলার অখণ্ডতা রক্ষার শেষ প্রয়াস হিসাবে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্যদের বৈঠক আহ্বান করা হয়।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন বিধানসভার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বড়লাটের পার্সোনাল রিপোর্ট নং ১০ (২৮শে জুন) মোতাবেক এই সভায় ১২৬নং সদস্য এইমর্মে এক প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দেন যে, বাংলা অখণ্ড থাকবে। প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট পড়ে ৯০টি। একই দিন বঙ্গীয় বিধান সভার মুসলমান ও হিন্দু সদস্যরা পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। হিন্দুদের বৈঠকে ৫৮ জন সদস্য বঙ্গ ভঙ্গ এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহের ভারতের

সাথে যোগদেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুসলিম সদস্যরা পুনর্বার অখণ্ড বাংলার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। তবে ১০৫ জন সদস্য এইমর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, যদি বাংলাকে হিন্দুদের অনমনীয় ভূমিকার জন্য ভাগ করতেই হয় তাহলে পূর্ববঙ্গ আসামের সিলেটসহ পাকিস্তানে যোগদান করবে। (খণ্ডিত বাংলাদেশ, দৈনিক ইনকিলাব ১ জানুয়ারী, ১৯৯১)

কিন্তু শেষ অবধি অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন হিন্দু ষড়যন্ত্রের কারণে অর্জিত হলনা। এমনকি আসামও যুক্ত হল না পূর্ববাংলার সাথে।

জিন্নাহর দাবী ছিল অবিভক্ত বাংলা ও আসাম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে। এ দাবী যখন অগ্রাহ্য হল তখন কোলকাতাসহ পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং একটি করিডোর চেয়েছিলেন। যাতে করে পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগ রক্ষা করা যায়। এটাও অগ্রাহ্য হল তিনি চাইলেন পূর্ববঙ্গের সাথে কোলকাতা। জিন্নাহর ভাষায় কোলকাতা বিহিন পূর্ববঙ্গ নিয়ে কি করব?' সর্বশেষে তিনি কোলকাতায় গণভোট দাবী করলেন যদিও কোলকাতার মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মুসলমান ছিল। কিন্তু তার ভরসা ছিল তফসিলি সম্প্রদায় যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। গণভোট হলে তারা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেবে। তার এই প্রচেষ্টাকেও ইংরেজ ও হিন্দুচক্র বানচাল করে দেয়। অতঃপর দাবী করা হয় কোলকাতাকে ফ্রি সিটি হিসাবে বহাল রাখার। কিন্তু সেটাও অগ্রাহ্য হল। সোহরাওয়ার্দী অনুরোধ করলেন, কোলকাতাকে মুক্ত শহর হিসাবে থাকতে দেয়া হোক। যদি এটাও সম্ভব না হয় অন্তত ৬ মাসের জন্য কোলকাতাকে মুক্ত রাখা হোক। এ ব্যাপারে ভাইসরয় কংগ্রেসের মতামত জানতে চাইলে প্যাটেল বলেন, Not even for six hours. এখানে ভাইসরয় কোন ভূমিকা নেননি।

পাকিস্তান দাবীর প্রেক্ষিতে নেতৃবৃন্দ

স্বাধীন ভারতের স্থপতি ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু বলেনঃ পরিণাম যাই হোক কংগ্রেস কখনও পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করবে না। (ষ্টেটসম্যান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৪৭)

হিন্দু ভারতে আপোষহীণ নেতা স্বাধীন ভারতের ডিপুটি প্রধানমন্ত্রী সরদার প্যাটেল বলেনঃ পাকিস্তানের বিষয়ে কংগ্রেস কখনও আপোষ করতে পারে না। (প্রাগুক্ত)

অহিংসনীতির অবতার ভারতের জাতির পিতা করমচাঁদ গান্ধী বলেনঃ সারা ভারত যদি জ্বলতে থাকে তাহলেও আমরা পাকিস্তান দেব না, এমনকি মুসলমানরা যদি তলোয়ারের মুখে দাবী করে তাহলেও না। (প্রাগুক্তঃ ৩০ শে এপ্রিল ১৯৪৭)

সম্ভাবনাহীন ভুখণ্ড নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু

অখণ্ড ভারত কেন্দ্রিক চূড়ান্ত স্বাধীনতা দানের উদ্দেশ্য নিয়েই লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভাইসরয়ের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কায়দে আযমের অনমনীয় মনোভাব এবং আপোসহীন নেতৃত্বের বলিষ্ঠ যুক্তির কাছে পরাজিত হয়ে ষড়যন্ত্রকারী লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন হিন্দু নেতৃত্বের সহযোগিতায় এমন একটি 'কাটা- ছেঁড়া পোকায় খাওয়া পাকিস্তান' দিলেন যা নিজস্ব অর্থনৈতিক বৃত্ত রচনা করতে সক্ষম হবে না, যা দুনিয়ার বুকে স্বনির্ভর হয়ে কোন দিনও দাঁড়াতে পারবে না। অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী মাউন্ট ব্যাটেনের ধারণায়- 'ভবিষ্যতের পাকিস্তান প্রকৃতিগতভাবেই হবে ক্ষণস্থায়ী। নিজের অন্তর্নিহিত গলদের দরুন, তাকে ধ্বংস হবার সুযোগ দিতে হবে। পরিণতিতে যাতে মুসলমানরা অখণ্ড ভারতের পথে ফিরে আসে।"

ভাইসরয় আরো বলেন- 'পূর্ব বাংলার সাথে সিলেট থাকলেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সেটা টেকসই হবে না। এবং ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে বাধ্য হবে। (Freedom at Midninght, P-114)

হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা

প্যাটেল মনে করেছিলেন, পাকিস্তান গ্রহণ দ্বারা মুসলিম লীগকে তিক্ত শিক্ষা দেয়া হবে। অল্পদিনের মধ্যে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলিকে অকথ্য অসুবিধা ও দুর্ভোগে পড়তে হবে।

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আচার্য ক্রিপালিনী বলেনঃ খণ্ডিত মাতৃভূমিকে একত্রীকরণের জন্য আমাদের সব রকম শক্তি ও সামর্থকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

পণ্ডিত নেহেরু বললেনঃ ভারতের হৃদয় ভাঙ্গলেও এর একত্রীকরণ সম্ভাবনা ধ্বংস হয়নি।

সরদার প্যাটেল বললেনঃ ভারত বিভাগের যদিও সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও এটা অবাস্তব পরিকল্পনা. . . ভারত একক এবং অখণ্ড একটি দেশ। কেউ সাগরকে অথবা প্রবহমান জলরাশিকে স্বতন্ত্র করে রাখতে পারে না।

গান্ধীর ধারণায় বিভক্ত ভারত পুনরায় অখণ্ড ভারতে পরিণত হবে। তার ধারণায় মুসলিম লীগই ভারতের সাথে পাকিস্তানের সংযুক্ত হওয়ার কথা বলবে। তারা নেহেরুকে ডাকবে এবং নেহেরু তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

কেথ কেলার্ডের মন্তব্য

কেথ কেলার্ড বলেন- 'ভারতীয়দের অনেকে মনে করেন পাকিস্তানের সৃষ্টিটাই হল এক বেদনাদায়ক ভ্রান্তি। এই ভুলের সংশোধন হওয়া দরকার। অন্তত পূর্ব

পাকিস্তানের ভারতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটা তারা চিন্তা করে থাকেন।

. . . পাকিস্তানীদের জীবনকে দুঃসহ করে তোলার জন্য ভারত সবরকম উদ্যোগ নিয়েছিল।

বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

পূর্ববঙ্গ পেয়েছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ৫৪, ৫০১ বর্গমাইল এলাকা। আর এজনসংখ্যা প্রায় ৮০ শতাংশই ছিলেন আধা- সর্বহারা বা সর্বহারা। এখানকার অধিকাংশ জমিদার ধনীক বণিক মহাজন প্রায় সবই ছিলেন হিন্দু। বাংলা বিভক্তির পর তারা পুঁজি ও অর্থসহ ভারতে চলে যায়। এ প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে জ্ঞান চক্রবর্তী তাঁর "ঢাকা জেলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অতীত যুগ" বইয়ের ১৩১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রকে হিন্দু জনসাধারণ

প্রথম হইতেই আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। ফলে দেশ বিভাগের পরেই হিন্দুরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ শুরু করে। হিন্দু সরকারী কর্মচারীরা প্রায় সকলেই অপশনের ব্যবস্থা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া যায়।"

ঐ পর্যায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে মূলতঃ তেমন কোন মূলধন ছিল না। এমনকি এ অঞ্চলের একমাত্র অর্থকরী ফসল পাট ব্যবসাটিও হিন্দু মাড়ওয়ারীদের হাতেই ছিল। তারা আবার মুনাফার টাকাটা ভারতেই বিনিয়োগ বা স্থানান্তরিত করতেন।

পূর্ববঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা। তাই কয়েক হাজার সম্পদশালী হিন্দু পরিবার পূর্ববঙ্গ থেকে চলে যাওয়ার ফলে শুধু যে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল তাই নয়, এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

সে বিপর্যস্ত অর্থনীতির পাশাপাশি ভারত থেকে আসতে থাকল লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব বাস্তুত্যাগী মানুষের ঢল, যার সংখ্যা সরকারী হিসাবেই সাত লক্ষ বলা হল।

পূর্ববঙ্গের ভাগে চাষযোগ্য জমি পড়েছিল সর্বমোট দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ একরের মত, যার মধ্যে ঐ সময়কালে এক কোটি আশি লক্ষ একরের মত চাষ করা সম্ভব হত; আর এর মধ্যে আঠার লক্ষ একরের মত পাট চাষযোগ্য জমি ছিল। অর্থকরী ফসল বলতে ছিল একমাত্র পাট। কিন্তু বাঙ্গালার ৬৮, ২৫৮টি তাঁত সম্বলিত ১১৩টি পাটকলের মধ্যে একটি পাটকলও পূর্ববঙ্গের মাটিতে ছিল না। আর এখানে খাদ্যশস্য যা উৎপন্ন হত তা আবার এই প্রদেশের জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় ছিল কম; তাই ছিল খাদ্য ঘাটতি সমস্যা।

শিক্ষার দিক থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা পিছিয়ে ছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে। তাই চাকুরীর ক্ষেত্রেও এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ই অগ্রগামী ছিলেন; তাদের মধ্যকার সক্ষম অংশও তখন ভারতে চলে গেলেন। এ প্রসঙ্গে একটি মাত্র উল্লেখ থেকেই তখনকার পূর্ববঙ্গের বাকি অবস্থাটা বুঝতে পারা যাবে, তাহল

এই যে, সে সময় সুপেরিয়ার সিভিল সার্ভিসের মধ্যে মাত্র একজন তিনিও নবিনেট ও এখানকার মুসলমান কর্মচারী ছিলেন।

খনিজ সম্পদ বলতে পূর্ববঙ্গ কিছুই পায়নি। তবে এখানে মৎস্য সম্পদ ছিল। আর ছিল দুই লক্ষ হস্তচালিত তাঁত।

পূর্ববঙ্গের ভাগে বনসম্পদ পড়েছিল রাজস্ব আদায়ের অনুপাতে সমগ্র বাঙ্গালার বন সম্পদের ১৩ ভাগের ৪ ভাগ মাত্র।

পূর্ববঙ্গের স্থলপথ ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পাকা রাস্তা এখানে ছিল না। রেলপথ পাওয়া গিয়েছিল ১. ৬১৯ মাইল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই রেলপথগুলি খুব বেশী ব্যবহারের ফলে ইঞ্জিন ও গাড়ী যা পাওয়া গিয়েছিল তার অবস্থা প্রায় ভগ্নদশায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

শিল্প বলতে যা বুঝায় তা পূর্ববঙ্গের ভাগে যা পড়েছিল তা অতি নগণ্য এবং বৃটিশ ভারতের সমগ্র শিল্পের মধ্যে বাঙ্গালায় ছিল ৩৩ শতাংশ শিল্প। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ পেল ঐ ৩৩ শতাংশের মধ্যে যাত্র ২. ৭ শতাংশ আর বাকি ৩০. ০ শতাংশ শিল্পের অধিকারী হল ভারতভুক্ত পশ্চিবঙ্গ। তাছাড়া বৃটিশ ভারতের --- আদতে শিল্পের দিক থেকে পূর্ববঙ্গ পুরিপূর্ণভাবেই অবহেলিত ছিল। এমনকি বিখ্যাত রাজনীবিদ এ, কে, ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং খাজা নাজিমুউদ্দীনও এক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদানের অধিকারী হতে পারেননি।

সূচনা পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের অবকাঠামো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুপযোগী ছিল তা নয়, রাজধানীর উপযোগী একটি শহরও ছিল না। পূর্ব বাংলা ছিল অশিক্ষিত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী সমৃদ্ধ। প্রশাসনিক ও টেকনিকালী অদক্ষ মানুষে পূর্ণ ছিল পূর্ব বাংলা। এখানে তেমন কোন শিল্প গড়ে উঠেনি। একটিও পাটকল অথবা হাইড্রোলিক জুট প্রেসিং ছিল না। শুধু মাত্র ৫টি কটন মিল এবং ৪টি সুগার মিল ছিল। এসবের মালিক এবং পরিচালক সকলেই ছিল হিন্দু। (এস মুজিবুল্লাহ; নতুন সফর, এপ্রিল ১৯৯৬)। পূর্ব বাংলার আয়ের প্রধান উৎস ছিল কাঁচা পাট। যা দিয়ে ৯ কোটি টাকা বার্ষিক আয়

হতো। কিন্তু পাটের বাণিজ্য পুরোটাই ছিল হিন্দু মাড়োয়ারীদের হাতে। এরা তাদের লভ্যাংশ ভারতে পাচার করতো। এটা সত্য যে কোলকাতার পাটকলগুলো পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত পাটের প্রধান ক্রেতা ছিল এবং বিশ্ব বাজারে পাট রপ্তানী হতো কোলকাতা বন্দর দিয়ে। যে কারণে পাট থেকে বাংলার মূল আয়ের পূরোটাই নির্ভর করত দিল্লীর মেজাজ মর্জির উপর। স্বাধীনতা উত্তর প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্য প্রতিনিধিরা স্পষ্টতই জানিয়ে দেয়, আপনারা পাট নিয়ে কি করবেন? আমাদের কাছে পাট বিক্রি ছাড়া আপনাদের ভিন্ন কোন পথ নেই। এসব আপনারা পুড়িয়ে ফেলুন অথবা বঙ্গপোসাগরে নিক্ষেপ করুন।'

শুরুতেই এই প্রদেশে মাত্র ৫ কিলোমিটার শক্তি সম্পন্ন বেতার কেন্দ্র ছিল। একটি দৈনিক পত্রিকা ছিল না। কোন প্রকাশনা শিল্প, আধুনিক ছাপাখানা এমন কি ব্লক তৈরীর কোন ব্যবস্থাও ছিল না। পূর্ব বাংলায় তখন ১০, ৭০০ কিলোমিটার বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো। শহরের ৮০ শতাংশ সম্পত্তির মালিকানা ছিল হিন্দুদের এবং এখানকার ৮০ শতাংশ সম্পদের মালিকও ছিল হিন্দু।

শিক্ষার সম্পূর্ণটাই ছিল হিন্দুদের দখলে। প্রায় সবকটি হাই স্কুল এবং কলেজ হিন্দুদের অর্থানুকূল্যে এবং তাদের দ্বারাই পরিচালিত হত। উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য। ১৯৪৭ সাল অবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ছিল অত্যল্প এবং মুসলিম শিক্ষকের সংখ্যা ছিল অনুল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রাধান্য ১৯৫০ সাল অবধি একই রকম বিরাজ করছিল। এদের পরীক্ষা নেওয়া হতো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রদেশে প্রশাসনিক জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি ও স্থানীয় নেতৃত্ব ছিল না যাদের উপর নির্ভর করে উন্নয়ণ প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া যায়। এখানে ২০/ ২৫ জন ডিপূটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সাব ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পুলিশ অফিসার এবং কনষ্টেবলের সংখ্যা ছিল ন্যূনতম প্রয়োজনের এক পশ্চমাংশ। অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে যেমন রেলওয়ে জনশক্তিতে পূর্ব বাংলার মানুষ ছিল প্রায়

অনুপস্থিত। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে। মাত্র ২শ' জন শক্তি নিয়ে একটি সেনা বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তখন প্রশাসনিক সামরিক কোন ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলা স্বনির্ভর হওয়ার মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ দক্ষ জন শক্তি ছিল না।

পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ভারতীয় উদ্যোগ

সীমানা নির্ধারণে বঞ্চনা

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে এমনই প্রভাবিত করেছিল যে সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারই ঘোষিত নীতি থেকে সরে এসে সীমানার কৌশলগত অবস্থানসমূহ ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয় এবং তৎকালীন পরিস্থিতিকে এমনই ঘোলাটে করা হয় যে মুসলিম নেতৃত্ব মুখবুঝে সমস্ত বঞ্চনা মেনে নিতে বাধ্য হয়। সামরিক কৌশলগত অবস্থান বিবেচনা করে পাঞ্জাবের মুসলিম প্রধান এলাকা গুরুদাস পূর জেলা, অমৃতসর জেলার অঞ্জলা, হুমিয়ার পুর, দসুয়া, জলন্ধর, ফিরোজপুর, বিরা তহশিল ; দোহোর জেলার কাসুর অঞ্চলকেও হিন্দুস্থানের হাতে তুলে দেয়া হয়। এদিকে পূর্ব বাংলার সন্নিহিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলা, নদীয়া জেলার সদর মহকুমা যশোহর এবং চব্বিশ পরগনা জেলার মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ এবং করিমগঞ্জকে হিন্দুস্থানের মানচিত্রে সন্নিবেশিত করা হয়। এমনকি মালদহ মুর্শিদাবাদ পাকিস্তান হিসাবে ঘোষিত হওয়ার তিন দিন পর ভারতের সাথে যুক্ত করা হয়।

প্রাপ্য সামরিক সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত করা হল

ডিফেন্স কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন সামরিক সরঞ্জাম হস্তান্তর করার কথা থাকলেও পাকিস্তানকে দেয়া হয় মাত্র ২৩ হাজার টন। বাকী ১ লক্ষ ৪২ হাজার টন সামরিক সরঞ্জাম থেকে পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা হয়। ১৫০টি শেরম্যান ট্যাঙ্ক পাকিস্তানের প্রাপ্য বলে ঘোষিত হলেও একটি ট্যাঙ্ক ও পাকিস্তানকে হস্তান্তর করা হয়নি। এর পেছনে যে কারণটি ছিল তাহল

পাকিস্তানকে দুর্বল করে রাখা। উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে আগ্রাসন চালিয়ে বিভাজিত অঞ্চল সমূহকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত করা।

অর্থ নগদ ৫৫ কোটি টাকার বঞ্চনা

বৃটিশ ভারতের রাষ্ট্রীয় তহবিলের ১০০ কোটি টাকা পাকিস্তানের ন্যায্য প্রাপ্য মনে করা হলেও আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭৫ কোটি টাকা পাকিস্তানের প্রাপ্য বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু বাস্তবে মাত্র ২০ কোটি টাকা পাকিস্তানকে প্রদান করা হয়। বাকী টাকা আত্মসাৎ করে হিন্দুস্তান। ওদিকে নগদ অর্থের অভাবে পাকিস্তানের প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তান সরকারী কর্মচারীদের বেতন প্রদানে ব্যর্থ হয়। কায়দে আযমের আবেদন ক্রমে মুসলিম বিশ্ব ২৫ কোটি টাকা তাৎক্ষণিক ভাবে সাহায্য করলে পাকিস্তান ব্রাহ্মণ্য চক্র সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় সক্ষম হয়।

কিথ কিলার্ড লিখেছেন- 'নতুন ভারতকে হস্তান্তরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানকে প্রকৃত পক্ষে ভেঙে পড়তে হয়েছিল। ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী ছিল। পাকিস্তানকে নতুন রাজধানী নতুন সরকার গড়তে হয়েছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃংখলার মধ্যে পাকিস্তানকে এ কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছিল। নতুন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছিল। যাতায়াতের চিরাচরিত ব্যবস্থা সব ভেঙে পড়েছিল। জন সাধারণ অধিকাংশ ছিল অশিক্ষিত ও অদক্ষ।'

রিচার্ড সাইমন মেকিং অব পাকিস্তান গ্রন্থে লিখেছেন- 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গুরুতর রূপে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম পাঞ্জাবে আগত অধিকাংশ ছিল কৃষক. . . . জুতা প্রস্তুত কারক ও অন্যান্য কারিগর। কিন্তু হারিয়ে ছিল শত করা ৮০ ভাগ ব্যবসাদার, ৯০ শতাংশ ঝাড়–দার যারা স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্বভার বহন করত। পল্লী অঞ্চলের হিন্দু মহাজনরা ঋণ সরবরাহ করত তারা চলে যাওয়ায় কৃষি ঋণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। হিন্দু পায়কারী খরিদ্দাররা চলে যাওয়ায় বাজারে পণ্য বিক্রি অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শহরে হিন্দু একাউন্টেন্ট ও কর্মচারী চলে যাওয়ায় ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে পড়ে ছিল।'

দেশ বিভাগের আগে থেকে হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করতে শুরু করে। এখানে অধিকাংশ কৃষিজীবী হওয়ায় অনুসঙ্গীক সুযোগ সুবিধার অভাবে কৃষিক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। সর্বস্তরে অবস্থানকারী হিন্দু বণিকরা দেশান্তরিত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। হিন্দুদের দেশ ত্যাগের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অচল হয়ে পড়ে। পেশাজীবী হিন্দুরা দেশ ত্যাগের ফলে একেবারে অদক্ষ জন শক্তি নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়। দেশ পরিচালনার জন্য কেরানী থেকে কর্মকর্তা, পুলিশ সদস্য থেকে পুলিশ কর্মকর্তা, সেনা সদস্য থেকে সেনা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যকর্মী ও ডাক্তার সবই ছিল পাকিস্তানে অপ্রতুল। এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট হিন্দুরা হিন্দু নেতৃবৃন্দের পরিকল্পিত প্ররোচনায় দেশ ত্যাগ করে। এ প্রসঙ্গে কায়দে আযম বলেছেন- আমরা শাসনভার গ্রহণের পূর্বে অমুসলিমরা দেশ ত্যাগ করতে শুরু করে এবং পরবর্তী ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে পাকিস্তানকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

দিল্লীর আগ্রাসন পরিকল্পনা

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য ছিল বৃটিশরা ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময় কথা ছিল দেশীয় রাজ্যসমূহ স্বাধীন থাকতে পারবে অথবা পাকিস্তান ও ভারতের যে কোনটির সাথে যুক্ত হতে পারবে। দেশীয় রাজ্য সমূহের আয়তন ছিল ৭ লক্ষ ১২ হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৩০ লাখ। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এসবের অধিকাংশকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলে স্বাধীনতার কয়েক মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য জুনাগড়ে চড়াও হয়। ৪৭ এর ১৭ অক্টোবর টাইম ম্যাগাজিনে লেখা হয়। 'এক স্কোয়াড্রন বিমানের ছত্র ছায়ায় হালকা ট্যাঙ্ক সজ্জিত ৩৪ হাজার ভারতীয় সৈন্যের জুনাগড় অবরোধ।' ওদিকে ভারতীয় নৌবাহিনী জুনাগড়ের বন্দরসমূহে অবস্থান নেয় যেন করাচী থেকে পাকিস্তান জুনাগড়ে আসতে না পারে। শেষ অবধি নিরস্ত্র দেশীয় রাজ্যে ভারত তার দখল স্বত্ব কায়েম করে।

হায়দারাবাদ দখল

ভারত বিভাগের আগে থেকেই ভারতের ব্রাহ্মণ্য নেতৃবৃন্দের হায়দারাবাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ছিল। হায়দারাবাদ পাকিস্তানের সন্নিহিত অঞ্চল নয় বিধায় হায়দারাবাদের নিজাম স্বাধীন ভাবে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু দিল্লী সেটা হতে দেয়নি। হায়দারাবাদ ভারতের সন্নিহিত এলাকা হওয়ার কারণে নিজাম ভারতের সাথে স্থিতাবস্থা চুক্তি করে। স্থিতাবস্থা চুক্তি অগ্রাহ্য করে ভারত খাদ্য দ্রব্য লবন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী হায়দারাবাদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে হায়দারাবাদ কে সঙ্কটের সম্মুখীন করে। অবশেষে জিন্নাহ যেদিন ইনতিকাল করেন, যেদিন পাকিস্তান শোকে মুহমান সেদিন ভারত সেনা অভিযান চালিয়ে হায়দারাবাদ দখল করে।

কাশ্মীর দখল

১৯৪৭ সালের আগস্টে দেশ বিভাগের পটভূমিতে কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর নেমে আসে সীমাহীন যুলুম। এশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ফিলিপ প্রাইস এমপি লিখেছেন- ১৯৪৭ সালের প্রথমাংশে যখন বৃটিশরা দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন থেকে হিন্দু মহাসভার উগ্রবাদী হিন্দু ও যুদ্ধাংদেহী শিখরা কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ শুরু হয়। সে সময় এরা মুসলিম জনমত বিরোধী শক্ত অবস্থান নেয়। এদের জুলুম পীড়ন ও বলাৎকারের ফলে কাশ্মীরে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

৪৭ সালের আগস্ট মাসে মহারাজা হরিসিং এবং সেখানকার শিখ জনগোষ্ঠীর অধৈর্য্য ও অসহিষ্ণুতার উলঙ্গ প্রকাশ ঘটে। কাশ্মীরী হিন্দু নেতা প্রেমনাথ বাজাজ তার গ্রন্থে লিখেছেন- সেই পুঞ্চ ও মিরপুরে মহারাজার সেনাবাহিনী অগ্নিসংযোগ হত্যা, রক্তপাত ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে। কাশ্মীর সরকার চেয়েছিল কাশ্মীরকে মুসলিম শূন্য করতে। টাইমস (১০ অক্টোবর ১৯৪৭) লিখেছে, কাশ্মীরের ডোগরা বাহিনী ২ লক্ষ ৩৭ হাজার মুসলমানকে পরিকল্পিতভাবে উচ্ছেদ করে। এই উচ্ছেদ অভিযান চলতে থাকে যতক্ষণ না উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে আগত উপজাতীয় যোদ্ধারা

প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এই প্রতিরোধ কাশ্মীরীদের নব প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে। ডোগরা সরকার ভয়াবহ প্রতিরোধ মুকাবিলার শক্তি হারিয়ে ফেলে। অবশেষে ৪৭ এর ২৭ অক্টোবর হিন্দুস্থান আগ্রাসন চালিয়ে কাশ্মীরকে আজ অবধি পদানত করে রাখতে সক্ষম হলেও প্রতিরোধের মাত্রা মোটেও কমেনি। গণ যুদ্ধ আজো অব্যাহত।

ভাগ আন্দোলনের অন্তরালে

সময়ের প্রেক্ষিতে বর্ণবাদী হিন্দু নেতৃত্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একটি অংশ হিসাবে মেনে নেয় এই আশায় যে পূর্ববাংলাকে এক সময় গ্রাস করা সম্ভব হবে। অথবা পূর্বপাকিস্তানীরা নিজস্ব যন্ত্রনায় ভারতের সাথে স্বেচ্ছায় একীভূত হতে চাইবে। এ কারণে তারা পূর্বপাকিস্তানীদের জন্য যন্ত্রনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে থাকে প্রথম থেকেই। পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই কতিপয় বুদ্ধিজীবীকে কিনে ফেলে ওরা। দীর্ঘদিনের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতা দিয়ে লাঙ্গলের পেছন থেকে আসা হালে গজিয়ে ওঠা বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করে অতি সহজে।

পূর্ব বাংলায় আগ্রাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত নিয়োগ দেয়া হয় একজন বাঙালী বর্ণবাদী এন মল্লিককে। তিনি প্রধান মন্ত্রী মতিলাল নেহেরুর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেন। (দি সানডে কোলকাতা ১৮-২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) তদুপরি বিশেষ পরিকল্পনা

বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৯ সালে কোলকাতার সন্নিকটে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞজনদের একটি সেল সংগঠিত করা হয় ত্রিগুণা সেনের নেতৃত্বে। একই অবস্থান থেকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সম্প্রীতি সমিতি গঠন করা হয় অজিত রায়ের নেতৃত্বে এবং তাদের পত্রিকা এপার বাংলা ওপার বাংলা প্রকাশ করা হয়। একাত্তরের পরে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং এপার বাংলা ওপার বাংলা কো এডিটর ১৯৭১।

এর পরে লিখেছেন- 'অজিত রায় এক সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নির্দেশনায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জাপান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার

দেশসমূহে কাজ করেছেন, পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মকভাবে অত্মনিয়োগ করেন। বাংলাদেশে তার রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার নীরব ও সক্রিয় ভূমিকা অনেকেরই অজানা। (কিপি ভট্টাচার্য, ১৯৭৩)

পৃথিবীর মানচিত্রে পাকিস্তান দৃশ্যমান হওয়ার আগেই অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাবিষ্ট বর্ণ হিন্দুরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সম্ভাব্য টার্গেট সামনে রেখে পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় তরুণকে হরেক রকম আশা ও আশ্বাস দিয়ে অখণ্ড ভারতের স্বপক্ষে প্রভাবিত করে।

১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুই সপ্তাহ আগে কতিপয় তরুণ গণ আজাদী লীগ গঠন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন কামরুদ্দিন আহমদ মোহম্মদ, তোহা, ওলী আহাদ এবং তাজুদ্দিন আহমদ। এরা পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন একাত্তর পর্যন্ত। এখন প্রশ্ন এসে যায় সুদীর্ঘ ১৯০ বছর পরাধীনতার পর স্বাধীনতার উত্তরণের ক্রান্তিকালে কোন্ অশুভ শক্তির ইশারায় পূর্ব পাকিস্তানের মাটিকে উত্তপ্ত করার লক্ষ্যে তারা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য সক্রিয় হল। দলের মেনিফ্যাষ্টোতে বলা হয়েছে। পাকিস্তানের বাঙালীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই তাদের লক্ষ্য- এদের কি বলা যাবে, হয় তারা নির্বোধ অথবা কোন অপশক্তির দালাল এরা। নির্বোধ বলা হচ্ছে এই কারণে যে, সদ্য মুক্ত দেশ পাকিস্তানের প্রশাসন চালানোর মত লোকবল অর্থবল কিছুই ছিল না, মুসলিম বিশ্বের সহানুভূতিশীলদের অর্থ সাহায্যে সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতে হত, এমতাবস্থায় তাদের আবার অর্থনৈতিক মাথা ব্যথা শুরু হল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই। কি বিচিত্র! অশুভ শক্তির দালাল বলা হল এই কারণে যারা পাকিস্তানকে সহ্য করতে পারেনি, যারা পাকিস্তান ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে এই উদ্দেশ্যে যে পূর্ব পাকিস্তান যেন নিজস্ব যন্ত্রনায় ভারতের সাথে একীভূত হতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যদি কেউ সক্রিয় হয় তাকে দালাল ও পঞ্চম বাহিনী ছাড়া কি বলা যাবে! এদের পরবর্তী কর্মকাণ্ড এটাই প্রমাণ করেছে এই অপশক্তির ক্রীড়নকরা পাকিস্তানের বয়স যখন ২ সপ্তাহ

তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার প্রভাষক আজাদী লীগের অন্যতম সদস্য আবুল কাশেম তমুদ্দুন মজলিস গঠন করেন। যদিও এর উদ্দেশ্য লক্ষ্য ছিল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই সাথে এদের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবী আদায় করা। শামসুল আলম, একে এম আহসান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম তমুদ্দুন মজলিসকে দিক নির্দেশনা দেয়। কিন্তু এরা মজলিসের কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী কামরুদ্দিন এবং কমিউনিষ্ট তোহা মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন। আবুল কাশেম মজলিস প্রতিষ্ঠার ১৫ দিনের মধ্যে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করে। একটি হিন্দু প্রেস পুস্তকটি ছাপিয়ে দেয়। একজন হিন্দু ম্যাজেসিয়ান পিসি সরকার তহবিল সংগ্রহ করে দেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ ডক্টর এনামূল হক সহ অন্যান্য প্রায় সব বুদ্ধিজীবী দূরদর্শী ভাবনা পরিত্যাগ করে হালকা হাওয়ায় ভাসতে থাকেন। আসলে উপমহাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং বর্ণবাদী হিন্দুদের গভীর চক্রান্ত আঁচ করার মেধা সম্ভবত এদের কারো ছিল না। বাংলা ভাষার পক্ষে সংসদে সোচ্চার কণ্ঠ শোনা যায় ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের। মুসলিম সাংসদরা ছিলেন নির্বাক দর্শক। তারা স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে অনাহুত সমস্যার উটকো যন্ত্রনায় বিব্রত বোধ করছিলেন। হিন্দু সাংসদরা যা করছিলেন সেটা ছিল দ্বিজাতী তত্বকে অকার্যকর করা এবং বর্ণ হিন্দুদের অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রথম সোপান হিসাবে ব্যবহার করতে। কোন এক বর্ণবাদী বাঙালী বুদ্ধিজীবী কথা প্রসঙ্গে এক মাস পর মুখ্য মন্ত্রী নুরুল আমিন প্রাদেশিক পরিষদে কমিউনিস্ট এবং ভারতীয় এজেন্টেদের রাজনীতির ছদ্মাবরণে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তুলে তৎকালীন পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ দেন।

তিনি বলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে বিপুল পরিমাণ ধ্বংসাত্মক প্রচার পত্র উদ্ধার করা হয়। নারায়ণগঞ্জের মিছিলে জয়হিন্দ এবং যুক্ত বাংলা চাই শ্লোগান দেয়া হয়। নব গঠিত আওয়ামী লীগের নেতা এবং এম এল এ এবং জনৈক মারোয়ারীর সাথে সম্পৃক্ত পাট ব্যবসায়ী ওসমান আলীর বাসগৃহ থেকে ধ্বংসাত্মক লিফলেট উদ্ধার করা হয় এবং একই অবস্থান থেকে ভারতীয় হিন্দু

যুবকদের গ্রেফতার করা হয়। একই ধরনের গ্রেফতার হয় চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং আরো কিছু স্থানে। (দি আল হেলাল- ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ৪৪৯-৫০)। ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ যারা বিক্ষোভে অংশ নিত তারা প্রতিদিন বুলেটিন প্রকাশ করত। বুলেটিনের হেড লাইন ছিল এ ধরনের যেমন- পূর্ব বঙ্গে রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ, পূর্ব বঙ্গ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের ব্যাপক অগ্রগতি ইত্যাদি। (এম, এ মোহাইমেন, ১৯৮৬ : ২১)।

কোলকাতার কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র নিয়মিত এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতো এবং তাদের এক সম্পাদকীয়তে জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কমিউনিষ্টদের দিক নির্দেশনার দাবী করা হয়। (স্বাধীনতা, কলিকাতা, ১০ এবং ১১ মার্চ ১৯৫২) তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্র দৈনিকটি একথা স্বীকার করে যে রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধানী এবং পাকিস্তান বিরোধী চক্র ভাষা আন্দোলনকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। (ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২)। সমকালীন চীফ সেক্রেটারী প্রায় দু'দশক পর স্বীকার করেন যে গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, বেশ কিছু ভারতীয় অনুপ্রবেশ করেছে এবং কমিউনিষ্টরা অত্যন্ত তৎপর। (এ এন্ড এ দীল ২০০০; ১৮৩) অর্থপূর্ণ কারণে ২১ ফেব্র"য়ারী গুলিবর্ষণকারী পুলিশ অফিসারদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে সহায়তা করার পরিবর্তে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনকারীদের অধিকাংশ এলিস কমিশন থেকে দূরে অবস্থান করে। জাষ্টিস এলিস বলেন, আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ সকলে সহযোগিতা করলে তদন্ত যথাযথ হতে পারত। (এ ওহাব, বি ওমর ১৯৮৫ : ১৬৬-৭০) জাতীয় প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক অবশেষে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তথ্য প্রকাশ করেছেন।

১৯৬৮-৬৯ সালে উন্নয়ন ঋণ বরাদ্দ হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১.০৬০ মিলিয়ন টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৭৮০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালের উন্নয়ন ঋণ বরাদ্দ হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১২৯০ মিলিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৯১০ মিলিয়ন। একই রকম দেখা যায় এক্সপোর্ট ক্রেডিটের ক্ষেত্রে ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৯-৭০ অর্থ বছর অবধি পূর্ব পাকিস্তান

গ্রহণ করে ২১০ মিলিয়ন ডলার পশ্চিম পাকিস্তান গ্রহণ করে ১৯২ মিলিয়ন ডলার (এল এফ রাসব্রুক ইউলিয়ম, ১৯৭৩: ১৫২, ৫৩)

অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আমদানী ক্ষেত্রে সাবসিডি দেয়া হত। যেমন পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সিমেন্ট আমদানীর ক্ষেত্রে সাবসিডি দেয়া হতো। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানীর ক্ষেত্রে সাবসিডি দেয়া হতো না। আন্তজার্তিক বাজার থেকে অধিক দামে পূর্ব পাকিস্তানের পণ্য বিক্রি করার সুযোগ দেয়া হত। যেমন পূর্ব পাকিস্তানের চা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ৭ গুণ বেশী দামে পশ্চিম পাকিস্তানে বিক্রি হত। (অমৃতবাজার পত্রিকা, কোলকাতা ২৪ মে, ১৯৭৪)

একাত্তরের যুদ্ধকালে ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান আর পি কাপুরের বক্তব্যে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি লিখেছেন- বাংলাদেশের ঘটমান পরিস্থিতির যৌক্তিক ব্যাখ্যা হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণের ধুয়া তোলা হয় সেটা সবৈব অন্যায় এবং পরিস্থিতির অতি সহজ এবং লঘু ব্যাখ্যা।' (আর পি কাপুরঃ ১৯৭১)

পূর্ব পাকিস্তান দখলের উদ্যোগ

আমরা আগেই বলেছি কিভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৃটিশদের সাথে যোগ সাজসে পাকিস্তানকে প্রাপ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে, কিভাবে পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ ব্যাহত করেছে। দরিদ্র, পশ্চাৎপদ, সমস্যায় জর্জরিত পূর্ব পাকিস্তানকে হাটি হাটি পা পা করে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে যখন মুসলিম লীগ বিব্রত। সে সময় রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করার জন্য বিপর্যস্ত জনগণের কানে কানে বিষ ঢালতে শুরু করে কমিউনিষ্ট জাতীয়তাবাদী এবং হিন্দু চক্রের কর্মকাণ্ড। এটা স্বীকার করতে হবে যে মুসলিম লীগের মধ্যে গণমুখী নেতৃত্বের সংকট ছিল। এ সত্বেও এটা ঠিক যে মুসলিম লীগ আন্তরিকতার সাথে সংকটের মোকাবিলা করেছে সেটা জাতীয়তাবাদী কমিউনিষ্ট অথবা কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দের পক্ষে সম্ভব ছিল না এমন কি

অন্য কারো পক্ষেও সম্ভব ছিল না। ২ শত বছর ধরে শোষিত বঞ্চিত জনগণের সার্বিক সমস্যা সমাধান করা একে বারেই সমম্ভব ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন থেকে পঞ্চম বাহিনী চক্র মুসলিম লীগকে গণ বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। পশ্চিম বঙ্গের মূখ্য মন্ত্রীর দর্শন ছিল পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে হলে মুসলিম লীগকে ধ্বংস করতে হবে। শ্যামাপ্রসাদের এই দর্শন ক্রিয়াশীল করে তোলা হয় পাকিস্তানে।

পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড সাজ্জাদ জহির সদ্য ভূমিষ্ট রাষ্ট্র পাকিস্তানে সামরিক কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করে মেজর জেনারেল আকবরের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করেন। তৎকালীন পরিস্থিতির উপর অধ্যাপক নরম্যান ব্রাউন লিখেছেন- 'হিন্দুস্থানের সক্রিয় সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিন্দু মহাসভা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এবং কাউন্সিল ফর দি প্রটেকসন অব দি মাইনরটিজ দাবী করে যে, পূর্বপাকিস্তানের ওপর সার্বিক আক্রমন চালিয়ে অথবা তীব্র অর্থনৈতিক চাপ অব্যাহত রেখে পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।'

এ উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানে পরিকল্পিত ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করা হয় পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টির জন্য। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানকে অস্থির করে তোলার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টিকে কাজে লাগানো হয় গণ অভ্যুত্থানের জন্য। কমিউনিষ্টরা পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম অধিবাসীদের আস্থা অর্জন করতে না পারায় তারা অমুসলিম নমশুদ্র, সাওতাল ও হাজংদের এলাকাকে বেছে নেয়। উদ্দেশ্য, অস্থিরতা সৃষ্টি করা। তারা জানতো এ অভ্যুত্থান কার্যকারী হবেনা, তা সত্বেও মনিসিং, সুব্রত, ইলামিত্ররা এসব করেছিল এ কারণে যে এর প্রতিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অমুসলিম অধিবাসীর ওপর পুলিশী নির্যাতন নেমে আসবে এবং তারা ভারতে পলায়ন করবে। ভারত সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর ভারতের চড়াও হবার সুযোগ পাবে। হিন্দুস্তান যে কোন মূল্যে চাচ্ছিল যুদ্ধের আবহ সৃষ্টি করতে। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত লন্ডন এ্যানুয়াল রেজিস্ট্রারে বলা হয়, '১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর পশ্চিম বাংলায় দাঙ্গার সূচনা হয়। সেটার সাম্প্রদায়িক চরিত্র ছিল না,

কোলকাতার বুদ্ধিজীবিরা এর ওপর সাম্প্রদায়িকতার রঙ ছড়িয়ে পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ঘোষণা দেন, পাকিস্তানকে পুনরায় অখণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তার এ বক্তব্যের প্রতি সব হিন্দু সংগঠন সমর্থন জ্ঞাপন করে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এ ঘোষণার প্রতি সমর্থন দেন। টাইমস এর (২৪ মার্চ, ১৯৫৯) এক রিপোর্টে বলা হয়- 'কোলকাতার একটি জনপ্রিয় দৈনিকে যুদ্ধের পক্ষে প্রচার অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং পূর্ব বাংলা আক্রমনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আজাদ সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে। ডেইলী টেলিগ্রাফের রিপোর্ট বলা হয়- ১৯৫০ সালের মার্চে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপক সৈন্য মোতায়েন করা হয়। হায়দরাবাদের সামরিক গভর্নর হিসাবে নিয়োজিত মেজর জেনারেল জে এম চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ব্যাপক ও বিস্তৃত যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরী করেন। দিল্লীর নির্দেশে তিনি দিনাজপুর, রাজশাহী ও যশোর সীমান্ত পরিদর্শন করে সম্ভাব্য হিন্দুস্থানী আক্রমনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের দুর্বল ও নাজুক অবস্থানগুলো চিহ্নিত করেন।' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জেএন চৌধুরী পাবনা জেলার চাটমোহর থানার হরিপুর গ্রামের অধিবাসী। পূর্ব পাকিস্তানের মাটি আবহাওয়ার সাথে তার নিবিড় সম্পর্কের কারণে যুদ্ধ পরিকল্পনা করার জন্য দিল্লী তাকে দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। ভারত ১৯৫০ সালে একাত্তরের বিজয় সূচিত করতে চেয়েছিল। আন্তর্জাতিক চাপ এবং পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের ঐক্য বিবেচনায় এনে সমরাভিযান স্থগিত করে। এরপর দীর্ঘ ২১ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টের জন্য মনোযোগী হয়। বাঙালী জাতীয়তাবাদকে বেগবান করে পূর্ব বাংলার জনগণকে আত্মঘাতী করে তোলার জন্য পঞ্চম বাহিনী পূর্বপাকিস্তানকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে পদচারণা শুরু করে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নিত্য নব নব কৌশল অবলম্বন করে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের নাটক মঞ্চস্থ করে সফলভাবে ভারতের ব্রাহ্মণ্য চক্র।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার অগ্রগতি

১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গে (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশ পাটকলও ছিল না অথচ ১৯৭০ সালের মধ্যে ২৪, ৩৩৪টি লুম সম্বলিত ৬৮টি পাটকল স্থাপিত হল; ১৯৪৭ সালে যেখানে ২৬০০ লুম ও ১, ১২, ০০০ স্পিন্ডল সম্বলিত মাত্র ৭টি কাপড়ের কল ছিল সেখানে ১৯৭০ সালের মধ্যে তা ৭, ০০০ লুম ও ৭, ৫০, ০০০ স্পিন্ডল সম্বলিত ৪৪টি কাপড়ের কলে উন্নীত হয়; চিনিকল ছিল ৫টি, তা ১৯৭০ সালের মধ্যে ১৫টিতে উন্নীত হল; ম্যাচ ফ্যাক্টরীর উৎপাদন ক্ষমতা যেখানে সমগ্র পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে ছিল ৮০ লক্ষ্য গ্র"স বাক্স, শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানেই ১৯৭০ সালে উৎপাদন হল ১১৩ লক্ষ গ্র"স বাক্স; রেলওয়ে ওয়ার্কসপ (উন্নত মানের) তৈরি হল দুইটি, খুলনায় তৈরী হল শিপইয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জে ডক ইয়ার্ড নির্মিত হল; স্টিল মিল হল একটি, গালফ্রা হাবিব নামে জুট মিল স্পেয়ারস তৈরির কারখানা হল, অ্যরডন্যানস ফ্যাক্টরী হল, রসায়ন শিল্প হল; দুইটি কাগজ কল, একটি নিউজপ্রিন্ট মিল ও একটি হার্ডবোর্ড মিল হল; বৃহৎ মুদ্রণ শিল্প স্থাপিত হল; সার কারখানা হল; গাড়ী সংযোজন কারখানা হল, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী হল, ইলেট্রিকাল ইকুইপমেন্ট তৈরির কারখানা হল; বাই-সাইকেল সংযোজন তৈরি কারখানা হল; তৈল শোধনাগার হল; যেখানে কোন সিগারেট ফ্যাক্সরী ছিল না সেখানে সিগারেট ফ্যাক্টরীর উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালে এক হাজার সাত শত কোটি সিগারেট-এ উন্নীত হল; ১৯৬৯-৭০ সালে কস্টিক সোডা উৎপাদন হল ৩, ৩৫০ টন, সালফিউরিক এসিড উৎপাদন হল ৬, ৪৫০ টন, ক্লোরিন উৎপাদন হল ২, ৯০০ টন, বাস, ট্রাক, কার ও জীপ এসেম্লিং হল ৪৫৫টি, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার উৎপাদন হল ৯৬, ০০০ টন; চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের মাধ্যমে ১৯৬৭-৬৮ সালে রপ্তানী হয়েছিল ১৪ লক্ষ টনের উপর এবং আমদানী হয়েছিল ৪২ লক্ষ টনের উপর মালামাল; ১৯৪৭ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ৭, ২৮৬ কিলোওয়াট, তা ১৯৭০ সালের মধ্যে ৫, ৪৮, ০০০ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্বলিত উৎপাদন কেন্দ্রে উন্নীত হল; ১৯৪৭ সালে সমগ্র পাকিস্তানে কার, জীপ, ট্যাক্সী, বাস, ট্রাক, ব্যাবিট্যাক্সী, মোটর সাইকেল প্রভৃতি রাস্তায় চালিত যানের সংখ্যা ছিল ২৫,

৪৩৫ তা ১৯৭০ সালের মধ্যে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ৭০, ০৮৬টিতে উন্নতি হয়েছিল; ১৯৪৭ সালে সমগ্র পাকিস্তানে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার, তা ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে দাঁড়িয়েছিল ৪৫, ৬৫৭টিতে; নতুন রেলপথ নির্মিত হল ১৫৭ মাইল; ১৯৫২ সালে যেখানে উন্নতমানের পাকা রাস্তা ছিল ৫৯৪ মাইল ও নিম্নমানের পাকা রাস্তা ছিল ১, ০৩-২৮ মাইল, সেখানে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে তা উচ্চমান সম্পন্ন পাকা রাস্তা হল ৪, ৪৮১ মাইল আর নিম্নমানের পাকা রাস্তা হল ১৮৭৪ মাইল। ১৯৬৬-৭০ সালে কৃষিতে রাসায়নিক স্যার ব্যবহার হল ২, ৭৭, ০০০ টন; পাওয়ার পাম্প ও নলকূপের সাহায্যে পানি সেচের ব্যবহার হল ঐ বছর ৮ লক্ষ একরেরও বেশী জমিতে।

বিদ্যুৎ, রাস্তা, যোগাযোগ, পরিবহণ, সেচ, বন্দর প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি প্রায় ১৫০টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। তাছাড়া রেল, নৌ ও সড়ক পরিবহন শিল্পের উন্নতি নিশ্চয়ই সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় শোষণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৬৯-৭০ সালে শুধুমাত্র রেলওয়েতে চালান দেওয়া মালের ওজন ছিল ৪৮ লক্ষ টন।

এর পাশাপাশি ১৯৪৭ সালে মাত্র ৭. ৭০০ একরের চা বাগান শিল্প উন্নীত হয়ে ১৯৬৯ সালের মধ্যে এক লক্ষ একরে দাঁড়িয়েছিল; জুট প্রেসও প্রায় ৭০টিতে উন্নীত হয়েছিল। এ ছাড়া গড়ে উঠেছিল মাঝারি ও ছোট আকারের অনেক রিরোলিং মিল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও প্যাকেজিং শিল্প, সংবাদপত্র শিল্প, ঔধষ প্রস্তুত শিল্প, চামড়া শিল্প, পাদুকা উৎপাদন কারখানা, কাঁচের দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্প, লৌহ কারখানা, ঢালাই কারখানা, এলুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী, মেরামত কারখানা ও ডকইয়ার্ড, ইট তৈরি শিল্প, ফার্নিচার তৈরি শিল্প, স-মিল, আটা-চাল-তৈল-ডাল ভাঙ্গান কল, ময়দা শিল্প, লবণ তৈরি কারখানা, বিস্কুট ও বেকারী শিল্প, প্লাষ্টিক ও রাবার শিল্প, টায়ার উৎপাদন শিল্প, হোসিয়ারী শিল্প, ইলেট্রিক তার, বাল্ব, পাখা ইত্যাদি তৈরি শিল্প; মৎস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আলু হিমায়িতকরণ শিল্প, প্রসাধনী সামগ্রী প্রস্তুত শিল্প, ব্যাটারি উৎপাদন শিল্প, সাবান কারখানা, পিচবোর্ড ও কাগজের দ্রব্য প্রস্তুত কারখানা, বিভিন্ন ধরনের সংযোজন ও

মেরামত কারখানা, পোশাক তৈরি শিল্প প্রভৃতি কয়েক হাজার শিল্প যার মধ্যে ১৯৭০ সালে সরকারীভাবে রেজিষ্ট্রিকৃত ছিল সাড়ে তিন হাজরের উপর, আর চীফ ইনসপেক্টর অব ফ্যাক্টরীজ এন্ড ইষ্টাবলিশমেন্টস-এর ১৯৬৯ সালের রেকর্ড অনুযায়ী ছিল ৫, ৫৪১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০ সালে চলচ্চিত্র গৃহের সংখ্যা ছিল ১৬৬টি।

আরও ছিল অগণিত হস্তচালিত তাঁত (সরকারীভাবে স্বীকৃত হ্যান্ডলুম ফ্যাক্টরী ছিল প্রায় সাড়ে সাত শত) শিল্প ও বিভিন্ন কুটির শিল্প, অলংকার প্রস্তুত শিল্প, বিড়ি তৈরি কারখানা, নির্মাণ শিল্প, টেইলারিং সপ, বই বাঁধাই কারখানা ইত্যাদি। যাতে নিযুক্ত ছিল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। এর পাশাপাশি ছিল হাজার হাজার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও দোকান। ছিল ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যবসা, ক্লিয়ারিং-ফরোয়ার্র্ডিং ব্যবসা, ক্যারিং ব্যবসা, কনসাল্টিং ফার্ম, ব্যাংক ও বীমা শিল্প ইত্যাদি। ১৯৯৬-৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আমদানী ও রপ্তানী সময়ে এক টন পাটের গড় রপ্তানী মূল্য ছিল ১, ৫৫৫৩. ০০ টাকা ও এক টন কাঁচা পাটের গড় রপ্তানী মূল্য ছিল ১, ২২৩. ০০ টাকা এবং এক পাউন্ড চা-র গড় রপ্তানী মূল্য ছিল এক টাকা পঞ্চাশ পয়সার মত। প্রশ্ন হচ্ছে, পুঁজিবাদের বিকাশ ছাড়া এসব হল কী করে? আর এর থেকে কি পূর্ববতী সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি?

রাশ ব্রুক উইলিয়াম ১৯৭১ সালে লিখেছেন- 'আমার পর্যবেক্ষণ আমাকে এই উপসংহার টানতে বাধ্য করেছে যে মাত্র শতাব্দীর চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ বছরের মধ্যে পাকিস্তান যেভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে অগ্রগতির নতুন দিগন্ত রচনা করেছে অতীতের লম্বা ইতিহাসের কোন পর্যায়েই এমন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। সফল স্থাপনা কাপতাইবাধ, চট্টগ্রামকে প্রধান সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে প্রতিষ্ঠা, চন্দঘোনা পেপার মিল, ফেন্থুগঞ্জ সার কারখানা যা পাকিস্তানের যে কোন স্থানে নির্মিত হতে পারত। কিন্তু সেটা ছিলো কেন্দ্রের উদ্যোগ। কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রাইভেট সেক্টরেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।'

হিন্দু সাংসদদের বিরোধিতা সত্বেও মুসলিম রায়তদের মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা হয়। স্থবির সেক্টরে প্রাণ চাঞ্চল্যের সূচনা করা হয়েছিল এমন ভাবে যে

দুর্ভিক্ষ কোন দুর্ভিক্ষই তার কালো হাত বাড়াতে পারেনি। ষাটের দশকে পূর্ব বাংলা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়।

১৯৪৭ সাল নাগাদ যেখানে পূর্ব বাংলায় মাত্র একটি বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল অর্ধডজন ডিগ্রি কলেজ ছিল সেখানে পাকিস্তান যুক্ত করেছ ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় (তিনটি সাধারণ, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং একটি কৃষি)।

এছাড়া এখানে ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ৮টি পলিটেকনিক এবং ৫টি মেডিক্যাল কলেজ এবং অসংখ্য মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বিজ্ঞান কলা ও বাণিজ্য অধ্যয়নের জন্য ২শতের ও অধিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

শিক্ষিত হিন্দুরা দেশ ত্যাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। পাকিস্তান আমলে শিক্ষিতের হার দাঁড়ায় ১৯ শতাংশ অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার ছিল ১৮ শতাংশ।

১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, যারা লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এমন বাংলাভাষী ৪০ জনকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন শাখায় নিয়োগ দেয়া হয় সরকারী নির্দেশে। ১৯৪৯/৫০ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মেধা ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয় ২০ শতাংশ বাকী ৮০ শতাংশ পদ পূর্বও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হয়। (R symond, the British and their Suceessors 44-90) অথচ পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় পরিচিত মুখ এর বিরোধিতা করে। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে সিএসপিদের ৩ বছর সময় অতিক্রান্ত হলে তাদের নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্তন করানো শুরু হয়। ১৯৫৫ সালের প্রাথমিক পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানী সিএসপির অনুপাত ৩৫ শতাংশে পৌছে। ১৯৭১ সাল নাগাদ এদের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৪৭ সালে এখানে কয়েকজন কমিশন অফিসার ৫০/৬০ জন জুনিয়ার কমিশন এবং ২০০ জন জোয়ান ছিল। ১৯৭১ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ হাজারে।

বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য অনাকাঙ্খিত হলেও এটা অস্বাভাবিক ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তান বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন হয় পলাশীর শত বছর পরে। যে কারণে বাংলার মানুষ যেভাবে বৃটিশ এবং তাদের সহযোগী বর্ণ হিন্দুদের ধারাবাহিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সামগ্রিক ভাবে তেমন শোষণ বঞ্চনার সম্মুখীন হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলার মত কোন হিন্দু জমিদারদের নিষ্পেষণ এবং মহাজনদের দৌরাত্ব ছিল না। অথবা বাংলার মত আধুনিক শিক্ষা ও কর্মের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল না। তদুপরি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বের কারণে সেখানে কখনো প্রশাসনিক ঔদাসীন্যও পরিলক্ষিত হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের এলাকা সমূহে কৃষি ব্যাপক সেচ সুবিধা পেয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধা থেকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল লাভবান হয়েছে। মোটের উপর দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের প্রয়োজনীয় উপাদান সেখানে মওজুদ ছিল। (জিপি ভট্টাচার্য, ১৯৭৩ : ১১৯-২০)

১৯৪৮ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তান সফর কালে জিন্নাহ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য অনাকাঙ্খিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি সহযোগিতা প্রদান এবং ধৈর্য ধারণের আহবান জানিয়ে যতদ্রুত সম্ভব পূর্ব ও পশ্চিমের বৈষম্য দূরীকরণের আশ্বাস দেন। কায়দে আযমের এই আশ্বাস সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্ববহ হয়ে উঠে। ১৯৫৬ এবং ৬২ সালে উভয় সংবিধানে রাষ্ট্রের উভয় অংশের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের এবং জাতীয় পরিষদে এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আইয়ুব খান ১৯৪৮ সালে জানুয়ারীতে যখন পূর্ব পাকিস্তানে জিওসির দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন, তখন এখানে সেনাবাহিনীর মাত্র ৫টি কোম্পানী সহকারে দুটো ব্যাটেলিয়ান ছিল। জেনারেল আইয়ুব তার আত্মজীবনী 'ফ্রেন্ডস নট 'মাষ্টার' গ্রন্থে লিখেছেন- 'সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে কোন টেবিল চেয়ার বা ষ্টেশনারী ছিল না, বলতে গেলে আমাদের কিছু ছিল না। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের

একটি মানচিত্র পর্যন্ত ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে জিন্নাহ সেনাবাহিনীতে অধিক সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানের জোয়ানদের নিয়োগ দেয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং একজন পূর্ব পাকিস্তানী মেজর আব্দুল গণিকে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করার দায়িত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীতে ডকিং সুবিধা সহ একটি নেভাল বেজ চট্টগ্রামে স্থাপন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তরুণদের রিক্রুটের জন্য একটি ডিপো, অনেক রিক্রুটিং সেন্টার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনা করা হয়। অন্য আর একজন পূর্ব বাংলার কর্ণেল আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীকে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণদের যুগোপযোগী দক্ষ হিসাবে ভবিষ্যত নেতৃত্বের জন্য গড়ে তোলার ব্যাপারে ক্যাডেট কলেজ স্থাপনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। ৬৯ থেকে ৭১ সালের মধ্যে ৪টি রেজিমেন্ট গড়ে তোলা হয় শুধু মাত্র পূর্ব পাকিস্তানীদের নিয়ে। এর উপরে পাঞ্জাব, বেলুচ এবং ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্ট গড়ে তোলার সময় ২৫ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানীদেরও রিক্রুট করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানীদের এত দ্রুত নিয়োগ দেয়া হচ্ছিল যে ঢাকার ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার সেনাবাহীর মান হ্রাস হওয়ার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

পাকিস্তান রেলওয়ে বোর্ড এবং পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা। প্রাদেশিক সরকারকে সংশিল্ট বিভাগ উন্নয়নের পরিকল্পনা নেয়া এবং এসব বাস্তবায়নের অধিকার দেয়া হয়। ৭০ শতাংশ বিক্রয় কর সহ কেন্দ্রীয় সরকারের ৫৪ শতাংশ ট্যাক্স রেভিনিউ এবং অন্যান্য ট্যাক্স এবং ডিউটির সম্পূর্ণটাই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়। (এই জাহির, ১৯৯৪: ৯২-৯৩)

১৯৬৬-৬৭ সালে বরাদ্দ করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৯৫.৪০ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৩৬.৩৩ কোটি টাকা। আইয়ুব শাসনামলে কেন্দ্রীয় বাজেটের অধিক পরিমাণ বরাদ্দ করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। কেন্দ্র কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক উৎস বর্ধিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম শুরু করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে শুরু হয় এক বছর পর। এই কর্মসূচীর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য ৫২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা

হয়। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় ২৫০০ কোটি টাকা। শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ট্যাক্স হলিডে ব্যবস্থা চালু করা হয়। পূর্বপাকিস্তানের শিল্পপতিরা এটা ভোগ করে ৪-৬ বছর। অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পোদ্যোক্তারা ট্যাক্স হলিডে ভোগ করার সুযোগ পায় ২-৪ বছর। আশা করা হয়েছিল এ অবস্থা চলতে থাকলে ১৯৮৫ সালের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সব ধরনের বৈষম্য দূর করা সম্ভব হতো। (জিপি ভটাচার্য ১৯৭৩: ১৫২-৫৩)

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পতনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ক্ষমতাসীন হয়েই তার রাজনৈতিক প্রয়োজনে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার সংক্রান্ত কিছু অঙ্গীকার করেছিলেন। যেমন তিনি বলেছিলেন- 'পরিকল্পিত উন্নতিকে সামাজিক ইনসাফের দাবি থেকে পৃথক করা যায় না। যে বিরাট ব্যবধান সমাজের নানা অংশকে পৃথক করে রেখেছে তাকে সংকুচিত করতে হবে এবং যে ভারসাম্যহীনতা সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষের পথ দেখায় তা দূরীভূত করতে হবে।'

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণে তৎপর ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি আমেরিকার কাছে বর্ধিত সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সাড়া পেলেন না। এ সত্ত্বেও তিনি আওয়ামী পঞ্চমবাহিনীর বিরোধিতার মুখেও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অক্ষুন্ন রাখার জন্য। এ পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নির্দেশ ছিল, প্রথমত সামাজিক সুবিচারের প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ, দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা।

ইয়াহিয়ার নির্দেশে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল প্রণীত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় ৩ হাজার ৯শত ৪০ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় ৩ হাজার ৫শত ৬০ কোটি টাকা। এতেও মন্ত্রী পরিষদের বাঙলা ভাষী সদস্যরা সন্তুষ্ট হয়নি। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিকল্পনা কমিশনের উদ্দেশ্যে বলেন- মন্ত্রী পরিষদের আমার বাঙালী সহকর্মীরা আমার কাছে উল্লেখ করেছেন যে ১৯৭০-

৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক বরাদ্দ আঞ্চলিক বৈষম্য কমাবে না। তা যদি হয় তা হলে আমি এর পক্ষ নিতে পারি না। প্রেসিডেন্টের এমন প্রতি ক্রিয়ার ফলে পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করে যে, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৭৫০-১০০০ কোটি টাকার সম্পদ পূর্ব-পাকিস্তানে স্থানান্তর করা হবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৩৭ শতাংশ বরাদ্দকে চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫২ শতাংশের উন্নীত করা হয়। এছাড়াও বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য অতিরিক্ত ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ ব্যাপারে আরো অতিরিক্ত বরাদ্দের কথা ব্যক্ত করেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া সত্বেও তারা যথেষ্ট সংখ্যক প্রকল্প তৈরী করতে ব্যর্থ হয়। তখন ইয়াহিয়ার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের অতীত বৈষম্য দূরীকরণের সদিচ্ছা যেমন প্রবল ছিল অনুরূপ এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। এই ভ্রাতৃত্ববোধ সহমর্মিতা ভালবাসার অনুভব বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও কেন হিন্দুস্থানী প্ররোচনায় মুজিব সৃষ্ট আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের আগুনে জ্বলতে হয়েছে পাকিস্তানকে এটাই ইতিহাসে বিস্ময়।

ইয়াহিয়ার এল এফ এর ৫ দফা মেনে নিয়েই শেখ মুজিব নির্বাচন করেছিলেন। মুজিব জানতেন ইয়াহিয়ার ৫ দফার সাথে মুজিবের ৬ দফার বিরোধ রয়েছে। এ সত্ত্বেও তিনি নির্বাচন করেছেন এবং নির্বাচনী ওয়াদায় পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার অঙ্গীকার করেছেন। '১৯৬৯ সাল হতে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া মুজিবের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক পর্যন্ত আলাপ আলোচনার ভিত্তি ছিল মুজিবের ৬ দফা পরিবর্তনের অঙ্গীকার। ইয়াহিয়া মুজিব আলোচনার টেপ রেকর্ড ও ছিল।'

এটা সত্যি যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে ছিল। স্বাধীনতার পক্ষে তারা ভোট দেয়নি। 'এটা সুস্পষ্ট করে বলতে হয়, গ্রামাঞ্চলের মুসলিম জনতা যারা মুজিবকে ভোট দিয়েছিল তারা বুঝতে পারিনি যে, যদি ৬ দফার পরিবর্তন না করা হয় তার অর্থ হবে পাকিস্তানের পরিসমাপ্তি। মোটের ওপর এশীয় একটি দেশের অশিক্ষিত ভোটারদের কাছ থেকে এটা কদাচিত আশা

করা যায় যে, তারা সর্বাধিক স্বায়ত্বশাসন ও বিচ্ছিন্নতার গোপন পরিকল্পতার মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হচ্ছে। অধিকন্তু ১৯৭০ সালে তার নির্বাচনী বক্তৃতাসমূহ বিশ্লেষণে যা প্রতীয়মান হয়, মুজিব কখনও বাঙালী মুসলমানদের বলেননি যে তার লক্ষ ছিল পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টি করা।

৬ দফার অর্থ স্বায়ত্বশাসন হিসাবে জনগণের কাছে উপস্থাপন করলেও সচেতনরা ঠিকই জানতেন এটা বিচ্ছিন্ন হওয়ার মূলমন্ত্র। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও এটা ভাল করে বুঝতেন। মুজিবের নির্বাচনী অঙ্গীকারে ৬ দফা থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কেন মুজিবকে ৬ দফা নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিলেন। কারণ মুজিব ৬ দফা কাটছাট করার অঙ্গীকার করেছিলেন ইয়াহিয়ার কাছে। প্রেসিডেন্ট মুজিবের ওয়াদার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিত ছিলেন। এর ফলে মুজিবের নির্বিরোধ প্রচারনার মধ্য দিয়ে ৬ দফা ক্রমশ শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পায়।

১৯৭০ সালের আগস্ট নাগাদ সরকার মুজিবের আসল মতলব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য খবর পান। জেনারেল আকবরের সামরিক রিপোর্টসমূহ বেসামরিক গোয়েন্দা সার্ভিস পূর্ব-পাকিস্তানে যার আঞ্চলিক প্রধান ছিলেন এক জন বাঙালী তিনি ইয়াহিয়াকে যথেস্ট ইংগিত দেন যে, মুজিবের কৌশল মনে হচ্ছে বাঙালীদের একচ্ছত্র নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচনকে ব্যবহার করা এরপর তিনি দাঁত খিঁচবেন। সত্যি সত্যি মুজিব দাঁত খিঁচাতে শুরু করেন নির্বাচনের পর থেকে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মুজিব ভুট্টোকে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। বাড়াবাড়ির কারণে ইয়াহিয়ার শাসনামলে যারা বন্দী হয়েছিল তাদের মুক্তি দিলেন শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে শেখ মুজিব সীমা অতিক্রম করতে শুরু করলেন। গণপ্রতিনিধিদের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চাপ বৃদ্ধি করলেন শেখ মুজিব।

শুধুমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরই নয় এল এফ ওয়ার্ক অর্ডার শর্ত অনুযায়ী ৩ মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নও জড়িত ছিল। এই জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে গণপ্রতিনিধিদের মধ্যে একটা সমঝোতার এবং

জাতীয় প্রশ্নে পারস্পরিক বোঝাপড়ার। সমঝোতার সকল পথ এড়িয়ে মুজিব অসহিষ্ণুতা, হিংসা-বিদ্বেষ, আবেগ আর উন্মাদনা ছড়িয়ে রাজনৈতিক পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছিলেন।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে রাজধানী ইসলামাবাদ সফরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিফল হন। জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে সমঝোতার জন্য অবশেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ঢাকায় আসতে হয়েছিল। তিনি ১২ জানুয়ারী ঢাকায় এলেন। মুজিবের সাথে ইয়াহিয়ার ৩ ঘন্টা স্থায়ী বৈঠক হল। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন ইয়াহিয়া। ইয়াহিয়া আশা করেছিলেন পূর্বের অঙ্গীকার মত মুজিব সাড়া দিবেন, তিনি তার আগের প্রতিশ্রুতি মত ইয়াহিয়াকে আওয়ামী লীগের তৈরি খসড়া শাসনতন্ত্র দেখাবেন এবং অঙ্গীকার মত ৬ দফার কিঞ্চিত পরিবর্তন করে অখণ্ড পাকিস্তানের উপযোগী সবার গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। কিন্তু আলাপ আলোচনার সময় শেখ মুজিব এ সবের ধারে কাছে এলেন না। খসড়া শাসনতন্ত্র দেখাতে অস্বীকার করলেন। ইয়াহিয়াকে শেখ মুজিব ঠারে ঠাউরে জানিয়ে দিলেন এসব ইয়াহিয়ার কাজ নয়, সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতা হিসাবে শাসনতন্ত্র বিষয়ে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব তার। ইয়াহিয়ার দায়িত্ব হচ্ছে অবিলম্বে সংসদ ডাকা। মুজিব হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বললেন, সংসদ ডাকতে ব্যর্থ হলে ভয়াবহ পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠবে। পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার স্বার্থে ইয়াহিয়া পাকিস্তানে সেনাপ্রধান এবং প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবের ধৃষ্টতা ও অসৌজন্যমূলক আচরণকে হাসিমুখে হজম করলেন। মুজিবের কপটতা, মুনাফেকী এবং অঙ্গীকার পূরণের প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরও ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগের প্রাককালে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সম্মুখে মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধান মন্ত্রী বলে অভিহিত করলেন।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী প্রতিনিধিত্বশীল দুই দলের দুই নেতার সমঝোতার কথা তখনও ভাবছিলেন জনগণ। এই দুই নেতার সমঝোতার উপরই নির্ভর করছিল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া। যদিও

প্রতিদিন খবর বের হত মুজিবের বাসভবনে আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মুজিব ভুট্টোর দা-কুমড়ো সম্পর্কের কথা যে যাই বলুক, দুই নেতার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল খুব নিবিড়। তিনদিন ধরে তাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এর ফল শুভ হয়নি। শেষ অবধি মুজিব ভুট্টোকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ৬ দফার পরিকল্পনা থেকে এক ইঞ্চিও সরে দাঁড়াবেন না। ভুট্টোরও জবাব ছিল অনুরূপ। ভুট্টো বললেন যে, তিনি এবং তার দল ৬ দফায় পরিকল্পনার গোপন অভিসন্ধি বিচ্ছিন্নতার পরিকল্পনার সম্মত হতে পারেন না। তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের পত্রপত্রিকা ভুট্টোর বক্তব্য থেকে ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির গন্ধ আবিষ্কার করলো। কিন্তু ৬ দফার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের দিকে কারো চোখ পড়ল না।

ওদিকে মুজিবের আপোসহীনতা ও অনমনীয়তার কারণে জেনারেলরা ভুট্টোর কাছাকাছি এসে পড়ায় ভুট্টো শক্তিশালী হয়ে উঠে। জাতীয় পরিষদের বৈঠকের তারিখ ঘোষণার পর ভুট্টোর প্রতিক্রিয়াই ছিল তার নতুন শক্তির বহিঃপ্রকাশ। ভুট্টো হুঙ্কার দিয়ে বললেন- 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুজিব ও তার মধ্যে শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে বোঝা পড়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বৈঠক বসতে দেয়া হবে না। সর্বাধিক স্বায়ত্বশাসন দেয়ার জন্য জেনারেলরা প্রস্তুত ছিলেন।

তৎকালীন সামরিক সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট জনাব জি ডব্লিউ চৌধুরী সমকালীন বাস্তবতা সম্পর্কে বলেছেন- 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে সেনা অফিসারবৃন্দ, সিনিয়র কর্মকর্তারা বড় রকমের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসারবৃন্দ এবং দূরদর্শী জেনারেলদের কাছে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ কোন অস্পষ্ট ও অবাস্তব ধারণা ছিল না। বরং তাদের কাছে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের বহু দেশপ্রেমিক জনগণের ন্যায় এর আদর্শ ও পতাকা যে কোন মূল্যে রক্ষা করা ছিল খুবই প্রিয়। তারা ঐ সব মূল্যবোধ ও আদর্শ রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।'

এ সত্ত্বেও একাত্তরের ভয়ঙ্কর বিপর্যয় থেকে শেষ রক্ষা হল না। এর জন্য দায়ী কে? সব দায়-দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে শেখ মুজিবের উপর দেবত্ব আরোপ করে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক দায় মুক্ত হওয়ার জন্য

যারা আজ অবধি চেষ্টা করে চলেছি ইতিহাস কি তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবে!

ভারতের লাল সংকেত

আগড়তলা ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় শেখ মুজিব এই ষড়যন্ত্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ছিল কমান্ডো কায়দায় অতর্কিত আক্রমন চালিয়ে সামরিক ইউনিটসমূহের অস্ত্রাগার দখল করে অস্ত্রসমূহ নিষ্ক্রিয় অথবা ধ্বংস করে দেয়া। এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালের ১২ জুলাই ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিনিধিদের সাথে হিন্দুস্থানী প্রতিনিধিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একই বছরের ডিসেম্বরে ষড়ন্ত্রকারীদের কয়েকজন গ্রেফতার হয়। এদের একজনের দেয়া তথ্যে জানা যায় যে, হিন্দুস্তান বিপ্লবীদের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্র“তি দিয়েছে। এছাড়াও চূড়ান্ত মুহূর্তে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যোগাযোগের আকাশ ও সমুদ্র পথ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতিও ছিল এতে।

পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্র নাটকের শেষ দৃশ্যে দিল্লী মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। বরং তার দেয়া প্রতিশ্র“তি পূর্ণাঙ্গ ভাবে রক্ষা করে ১৯৭১ সালের ফেব্র“য়ারী মাসে একটি ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমান হাইজ্যাক নাটকের অবতারণা করে। দিল্লীর নির্দেশমত ভারতীয় চর কর্তৃক এই বিমানটি হ্যাইজ্যাক করে লাহোরে অবতরণ করান হয়। হাইজ্যাককারীরা তাদের দাবির ব্যাপারে আলাপ আলোচনার সময় সুযোগ না দিয়ে বিমানটিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। পাকিস্তান বিমানের ক্রু এবং যাত্রীদের ভারত প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে দেয়। এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, হিন্দুস্তানের উপর দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিমান চলাচল বন্ধ করার একটা ছুঁতো দাঁড় করানোর লক্ষ্যে হিন্দুস্তানী এজেন্টরা এর ঘটনার অবতারণা করছিল। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট কালে এই ঘটনার মাধ্যমে হিন্দুস্তান পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এই সবুজ সংকেত দিয়েছিল যে ভারত তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

ছিনতাই নাটক সংঘটিত হওয়ার পরপরই মুজিব বিবৃতি দেন- ‘এটা ক্ষমতা হস্তান্তর স্থগিত করার জন্য পাকিস্তান সরকারের এক ষড়যন্ত্র।’ এতে পরোক্ষভাবে মুজিব ভারতীয় পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেন। ওদিকে আর এক নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ভারতীয় অনুচর এবং সাজানো ছিনতাইকারীদের জাতীয় বীর হিসেবে অভিহিত করে। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায়, দেশপ্রেম এবং জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই প্রান্তের দুই নেতা মুজিব ও ভুট্টো হয় দেউলিয়া, নয়তো চক্রান্তকারী ভারতের দোসর।

দিল্লী ভারতের উপর দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ করে ক্ষান্ত হলো না, পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্যের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু সৈন্যকে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি আনা হল। জেট জঙ্গী বিমান ও পরিবহন বিমান সীমান্তের কাছাকাছি বিমান বন্দরে জড়ো করা হল। পশ্চিম বাংলার ৫ ডিভিশন সৈন্য সমাবেশ করা হল। এর আগে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েনকৃত বি এস এফ এর কয়েকটি ব্যাটেলিয়ানের সাথে আরো কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান যুক্ত করা হল। এই ভাবে প্রায় ২৫টি ব্যাটেলিয়ান পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত ঘিরে অবস্থান নিল। এই সব ব্যাটেলিয়ান যাতে অতি সহজে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকতে পারে এ কারণে বি এস এফ এর চিহ্ন মুছে ফেলা হল। জীপ ও অন্যান্য যানবাহনের রঙ বদলে দেয়া হল। দিল্লী থেকে বিমান যোগে বি এস এফ সৈন্য আনা হল। সব বি এস এফ কোর্স বাতিল করা হল। পুলিশ বিভাগের সব ছুটি বাতিল করা হল।

হিন্দুস্তানী এলাকার উপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ করার সাথে সাথে সমুদ্রপথেও বাধার সৃষ্টি করল দিল্লী। এপ্রিলে (৭১) হিন্দুস্থানী নৌঘাঁটি দোয়ারকার ৭০ মাইল পশ্চিমে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি জাহাজ ওসান এন্ডুরেন্স নামে একটি বাণিজ্যিক জাহাজকে বিব্রত করে। জাহাজটি হাজীদের বহন করছিল। হিন্দুস্তানের দক্ষিণ সীমান্তে অনুশীলনের নামে উপকূল থেকে ১২৩ মাইল দূর পর্যন্ত ক্ষেপনাস্ত্র ছুড়তে থাকে। এইভাবে তারা পাকিস্তানী বেসামরিক বিমানকে আরো দক্ষিণে যেতে বাধ্য করে।

এই সংকেত মুজিবকে অত্যন্ত দুঃসাহসি করে তুলে। সে সময় গার্ডিয়ান পত্রিকা (২৪ ফেব্র"য়ারী, ১৯৭১) মুজিবের দুঃসাহসের কারণ এইভাবে প্রকাশ করে- 'তিনি (মুজিব) বলেছেন, জনসাধারণ আমাকে ভালবাসে সুতরাং আমাকে স্পর্শ করবে না। তিনি এ কথা বলেছেন, কারণ তিনি জানেন যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সৈন্য সংখ্যা এত কম যে তারা বড় রকমের কিছু করার সাহস পাবে না। আর যেহেতু হিন্দুস্তানের উপর দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ, কাজেই সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোও অসম্ভব।'

ভুট্টোর হুমকির প্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল সদস্য আসন্ন সংসদ অধিবেসনে যোগদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। এতে ভুট্টোর অবস্থান আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেল। ইয়াহিয়ার প্রত্যাশা পূরণের পথ খোলা রইল না। এর ফলে ৩ মার্চ ৭১ এর সংসদ অধিবেসন স্থগিত রাখা ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। ইয়াহিয়া জানতেন যে, এতে পূর্ব পাকিস্তান অগ্নি গর্ভ হয়ে উঠবে। এ কারণে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্যের খসড়া তৈরী করলেন। কিন্তু কোন অদৃশ্য ইংগিতে সেটা প্রকাশিত হলো না। ১ মার্চ বেলা ৩টায় ৩ মার্চের আসন্ন অধিবেসন স্থগিত ঘোষনা করা হল। এর প্রতিক্রিয়া হল ভয়ঙ্কর। এক ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা শহর অগ্নি গর্ভ হয়ে উঠল। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠল সমগ্র শহর। 'লাঠিসোটা নিয়ে মিছিল ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে লাগল। একে মুজিব বললেন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। কিন্তু এ আন্দোলনের প্রকৃতি অহিংস, ছিল না। উগ্র আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কখনই অহিংস হয় না। এসবে থাকে প্রতিহিংসা প্রতিশোধ স্পৃহা এবং জাতিগত বিদ্বেষ যেদিন থেকে শুরু হয়েছিল অবাঙালীদের দোকানপাট লুট। এদের উপর চলছিল বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এবং পরিকল্পিত হামলা। শহরে সেনাবাহিনী নামান হল। কোন কোন স্থানে লুটেরাদের উদ্দেশ্যে গুলি চালান হল। এর ফলে আন্দোলনের তীব্রতা বেড়ে চলল।

মার্চের ৩ তারিখে যে আন্দোলন শুরু হল সেটা আর স্তিমিত হল না। আকাশ বানী, বিবিসি এবং স্থানীয় পত্র পত্রিকা প্রতিদিন নিত্য নতুন পদ্ধতিতে ইন্ধন জোগাতে লাগল। বলতে গেলে মার্চের ৩ তারিখ থেকে পূর্ব পাকিস্তান অচল

হয়ে পড়ল। সেনাবাহিনী ছাড়া এখানকার পুরো প্রশাসন অচল হয়ে পড়ল। রেডি ও টিভি মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হতে শুরু করল। শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান শাসনের ব্যাপারে একটির পর একটি নির্দেশ জারি করতে থাকলেন। এই নির্দেশের নাম অনুযায়ী সরকারী আধাসরকারী অফিস বন্ধ ঘোষণা করা হল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে টেলিফোন ট্যালেক্স ও বেতার যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হল পাকিস্তানী পতাকা নয়, ঘরে ঘরে উড্ডীন হল বাংলাদেশী পাতাকা।

এই অচলাবস্থা নিরসনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৫ মার্চ ঢাকায় এলেন। প্রেসিডেন্টের এ আগমনকে মনে করা হল পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার শেষ প্রয়াস হিসাবে সেই দিনই মুজিব উস্কানীমূলক বিবৃতি দিয়ে ইয়াহিয়ার ধৈর্য্যরে পরীক্ষা নিলেন। বিবৃতিতে বলা হল 'জনগণের বীরোচিত সংগ্রাম এগিয়ে চলছে... বাংলাদেশের জনগণ, বেসামরিক সরকারী কর্মচারী, অফিস ও কারখানা কর্মচারী, কৃষক ও ছাত্রসমাজ এটা নিশ্চিতভাবেই প্রদর্শন করেছে যে তারা আত্মসমর্পনের চেয়ে বরং মৃত্যুকে বরণ করবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার উৎসাহ উদ্দীপনা নির্বাপিত করা যাবে না। সুতরাং সংগ্রাম নতুন উদ্দীপনাসহকারে চলবে। যতক্ষণ না আমাদের মুক্তির লক্ষ্য আদায় হয়।'

একাত্তরের এই মহা নায়কই ছিলেন ভারতীয় অর্থানুকূল্যে সংগঠিত উগ্রবাদী জঙ্গী ভারতপন্থী তরুণদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের বাবুচক্র এই তরুণদেরকে ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা উজ্জীবিত করে এসেছে। এইসব উন্মাতাল সঙ্গীদের দ্বারা দিল্লী পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করার দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা নিজস্ব ছক ধরে এগিয়ে নিয়ে চলছিল। ইয়াহিয়ার সাথে মুজিবের ছিল দিল্লী প্রযোজিত নাটকের শেষ দৃশ্য। মঞ্চে বৈঠক চললেও নেপথ্যে ছিল ভিন্ন চিত্র। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ এন্ড এ্যানালাই সিস উইং ('র') বিশেষ পরামর্শ অনুযায়ী প্রস্তুতি চলছিল। তাদের পরামর্শে মুজিব অবসর প্রাপ্ত কর্নেল ওসমানীকে বিপ্লবী শক্তিসমূহের কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব দেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংঘটনের জন্য আরো কিছু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবসর প্রাপ্ত সেনা অফিসার ওসমানীর সংগে যোগ দেন। বাংলাদেশের তিন

সপ্তাহের স্বাধীনতা আন্দোলন কেন্দ্রীয় সরকারকে চ্যালেঞ্জ করতে মুজিবের জন্য এক অভূত পূর্ব সুযোগ করে দেয়। রেডিও টিভি সংবাদ মাধ্যমের ওপর মুজিবের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে জনগণকে বিপথে চালিত করা তার জন্য সহজ হয়। ওদিকে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর বাঙলাভাষী জোয়ান অফিসার এবং আনসার মুজাহিদ সেই সাথে পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ ফোর্স কেন্দ্রীয় সরকার নয় মুজিবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে ছিল বদ্ধপরিকর।

অন্যদিকে মুজিব ইয়াহিয়ার আলোচনা এবং চলতি ঘটনা প্রবাহের প্রতি নজর রাখছিলেন পাকিস্তানী জেনারেলরা। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জেনারেলরা সবাই তখন ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। তারা আন্তরিকতার সাথে কামনা করছিলেন একটি রাজনৈতিক সমাধান। একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান। কিন্তু মুজিব বিচ্ছিন্নতার চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে সরে না দাঁড়ালে সমঝোতার শুভ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে সে ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন জেনারেলরা। দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে মুজিবের একথা ভাল করেই জানার কথা যে, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রশ্নে সামরিক প্রশাসন এক বিন্দুও ছাড় দিবে না। তদুপরি এর পেছনে পাকিস্তানের বৈরী শক্তি দিল্লীর যখন ইন্ধন রয়েছে, সে অবস্থায় পাকিস্তানের জেনারেলরা চোখ বন্ধ করে নিষ্ক্রিয় অবস্থানে থেকে পাকিস্তানের ভাঙন প্রত্যক্ষ করবেন না বরং সর্বশক্তি নিয়োগ করে অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য যুদ্ধ করবেন। এরপরও মুজিবের দোদুল্যমান অবস্থা পরিস্থিতিকে সংঘাতের মুখে নিয়ে চলছিল।

দুটো শক্তির ঐশ্বর্যে লালিত হয়ে শেখ মুজিব হতাশ হয়ে পড়েন তখন, যখন তিনি জানতে পারেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পেছনে নেই। মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে সমঝোতার দিকে অগ্রসর হয়েও পিছিয়ে আসেন তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ভারত এবং তার আন্দোলনের শক্তি আপোষহীন তরুণদের চাপের মুখে। তার সীমাহীন গর্জনের আড়ালে তাকে ঘিরে ধরে এক অসীম অসহায়ত্ব। ইয়াহিয়া খানের সংগে এক বৈঠকে তিনি বলেই ফেলেছিলেন- 'আমি যদি আপনার কথামত কাজ করি তাহলে ছাত্র নেতারা আমাকে গুলি করবে। আর যদি আমি

ছাত্র নেতাদের কথামত চলি তাহলে আপনি আমাকে গুলি করবেন। বলুন তো আমি কি করি।' শেখ মুজিব তার নেতৃত্বের অসহায় ও করুণ অবস্থাই ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। (অরক্ষিত স্বাধীনাতই পরাধীনতা, মেজর (অব) এমন এ জলিলঃ পৃ- ১২)

১৬ মার্চ থেকে ইয়াহিয়ার সাথে শেখ মুজিব এবং দায়িত্বশীল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রায় প্রতিদিন আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। ২০ মার্চ ইয়াহিয়া মুজিব আলোচনা চলে ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট। বৈঠক শেষে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের শেখ মুজিব বলেন- 'আলোচনার অগ্রগতি হয়েছে। আলোচনা রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের দিকে এগিয়ে চলছে।'

কিন্তু ২১ শে মার্চ ইয়াহিয়ার সাথে মুজিব ও তাজুদ্দিন এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। মুজিবের উপস্থিতিতে তাজুদ্দিন ইয়াহিয়াকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আওয়ামী লীগ কোন ধরনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার ব্যাপারে সম্মত হতে পারে না। আওয়ামী লীগ চায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। এতে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। ইয়াহিয়াও তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, দেশ ভাঙার কোন হুমকিই চ্যালেঞ্জবিহীন থাকবে না।

বাংলাদেশের আন্দোলন আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকে। অখণ্ড পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার আয়োজন উদ্যোগকে যারা ভন্ডুল করেছিল তারাই চেয়েছিল খণ্ডিত বাংলা পূর্ব পাকিস্তান যে কোন মূল্যে হজম করতে। এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে ভারত অত্যন্ত কৌশলে কাজ করছে। সৃষ্টি করছে পঞ্চম বাহিনী। ভারত ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আগ্রাসন চালানোর উদ্যোগ নিয়েও পিছিয়ে আসে, কারণ সে সময় পাকিস্তানকে ভাঙবার উপযোগী পরিস্থিতি ছিল না। পরিপক্ক করে তোলার জন্য যথেষ্ট কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে ভারতকে। দীর্ঘ সময় ধরে পঞ্চম বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে, বামপন্থী সাংবাধিকদের দিয়ে জনমত সৃষ্টি করা হয়েছে, পাকিস্তানকে ভাঙবার কথা উহ্য রেখে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন দাবীর আড়ালে প্রস্তুতি নিয়েছে স্বাধীনতার। তা না হলে সর্বাধিক স্বায়ত্বশাসন দেখার

জন্য যখন প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেলরা প্রস্তুত, যখন অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার সব ব্যবস্থা পাকা পোক্ত, এমনকি বৈষম্য জনিত অতীতের ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের আয়োজন যখন চূড়ান্ত এবং ইয়াহিয়ার অঙ্গীকার মত জনসংখ্যানুযায়ী প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের ফলে সমগ্র পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতা যখন বাঙলাভাষীরা তখন মুজিব বেকে বসলেন কেন?

সীমাহীন জনপ্রিয়তা নিয়ে কোন দেশপ্রেমিক নেতা কোন ধরনের হটকারী সিদ্ধান্ত জাতির কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। কিন্তু আমাদের ইতিহাসে রয়েছে। ইয়াহিয়া নয় শেখ মুজিবই একাত্তরের উত্তাল মার্চে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার প্রয়াস ভণ্ডুল হওয়ার জন্য দায়ী। সেটা তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা না গেলেও পরবর্তী তথ্য উপাত্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে মুজিবের কোন রকম আগ্রহ অথবা আকুতি ছিল না। বাংলাদেশের সত্যিকার স্বাধীনতা নয়, মূল উদ্দেশ্য পাকিস্তানকে ভেঙে টুকরো করে আগ্রাসী দানবের মুখের গ্রাসে পরিণত করা। মুজিব শুধুমাত্র সময় ক্ষেপন করেছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং দেশপ্রেমিক দল, নেতা ও কর্মীদের বিপাকে ফেলার জন্য সমঝোতার নাটমঞ্চে চাতুরীপূর্ণ অভিনয় করেছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তার সহকর্মী আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্য থেকে। আব্দুর রাজ্জাক স্বাধীনতার ১৫ বছর পর দেয়া একটি সাক্ষাৎকার (সাপ্তাহিক মেঘনা, ১৯৮৭) বলেন... 'এর পর শুরু হল ডায়ালগ। ডায়ালগে বঙ্গবন্ধু আপোসের সিদ্ধান্ত নিলেন। ইয়াহিয়া এমন একটি অফার দেন, যা একটি কনফেডারেশনের মধ্যে এসে গেল। অফারটা ছিল বঙ্গবন্ধু প্রাইম মিনিস্টার, জুলফিকার আলী ভুট্টো ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এবং ফরেন মিনিস্টারের চার্জ পাবেন। এ ছাড়াও বঙ্গবন্ধু যে ৬ দফা দিয়েছিলেন তার মধ্যে একমাত্র ডাবল কারেন্সী বাদ দিয়ে বাকি আর পাঁচটা দাবিও ইয়াহিয়া খান মেনে নিলেন।... ২৩ মার্চ এ প্রস্তাবকে চূড়ান্ত রূপ দেবার কথা।... তবুও সেদিন বললাম, বঙ্গবন্ধু আর যাই হোক ভুট্টোর সাথে সরকার গঠন করা যাবে না। এই যেই বলেছি, অমনি তিনি ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠলেন। বললেন চুপ কর। আমার চেয়ে বেশী বোঝ? ভুট্টোর সাথে সরকার গঠন করব কিনা সেটা আমাকে ভাবতে দাও।... পরে বললেন, আমি

ওদের সাথে খেলতে চাই। আমাকে খেলতে দাও। তোমরা একদিনেই সব খেতে চাও।... কিছুক্ষণ পর বঙ্গবন্ধু আমাকে উপরে যেতে বললেন। কাছে গিয়ে বসলে বললেন আমি যা বলব পৃথিবীর কারো কাছে বলবেনা, নট ইভেন টু ইউর কমরেডস।' আমি ঘাড় নাড়লাম। তারপর বললেন, তোরা ঠিক বলেছিস। কাল সারারাত ধরে আমি চিন্তা করলাম, নো রিক্স নো গেইন। তোরা পারবিনা প্রাথমিক অবস্থা চালাতে। খবরদার তোরা কাউকে বলবিনা, ইয়াহিয়া খানকে কি বলব ঠিক করে ফেলেছি। আমি বললাম, প্রাথমিকভাবে আমরা চালাতে পারব। তারপর যদি আপনি ভারতের সাহায্য করার ব্যবস্থা করে যেতে পারেন আরো ভাল হয়।... বঙ্গবন্ধু নিচে নেমে নজরুল ইসলাম সাহেবকে ডাকলেন। তাজুদ্দিন মুশতাক সাহেবকেও। তারপর তাদের লাইব্রেরী রুমে নিয়ে গেলেন। ওরা মুখ অন্ধকার করে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমি বের হলাম গাড়ীতে। তারপর তাকে প্রেসিডেন্ট হাউসে পৌঁছে দিলাম। আমি চলে এলাম। ২৩ তারিখে আমি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গেলাম। সেখানে আগের দিনে দেয়া কথা বঙ্গবন্ধু প্রত্যাহার করলেন। বললেন, পূর্ব পাকিস্তান এ্যাসেম্বলীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর কর।"

বলতে গেলে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সাথে আওয়ামী লীগের যাবতীয় সংলাপের অবসান হয়। চতুর্থ সপ্তাহের শুরুতে দীর্ঘ সংলাপের উপসংহার রচিত হচ্ছিল নেপথ্যে। যেমন প্রস্তুতি চলছিল ক্যান্টনমেন্টে অনুরূপ চলছিল আওয়ামী শিবিরে। সার্বিক ভাবে জাতি ছিল সম্মোহিত। আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা ও কমীরা ছিল নীরব। তারা এক অনিবার্য্য ধ্বংস প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

২৩ মার্চ আওয়ামী লীগ চূড়ান্ত বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিল। রেডিও, টিভি এবং অন্যান্য প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারিত হল বিদ্রোহের জয়োল্লাস। ধানমন্ডিতে কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে সসস্ত্র মার্চ পাস্ট করিয়ে ইয়াহিয়াকে আওয়ামী লীগ যুদ্ধের ঘোষণা জানিয়ে দিল। উচ্ছৃংখল জনতার বর্বর হামলা শুরু হল অবাঙালী জনবসতির ওপর। এমনকি বিচ্ছিন্ন হামলার শিকার হল সেনাবাহিনী সদস্যরা। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সেনাবাহিনী ক্যান্টমেন্ট চত্বরে বন্দী হয়ে পড়ল।

এমনকি তাদের খাদ্য পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হল। স্বাভাবিকভাবে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। শেখ মুজিবই পারতেন এ বিপর্যয় এড়িয়ে অখণ্ড পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সর্বোচ্চ স্বায়ত্বশাসনের দাবী আক্ষরিক ভাবে আদায় করতে। কিন্তু পাকিস্তানকে ভেঙে টুকরো করা যার চূড়ান্ত লক্ষ তিনি সেটা করবেন কেন? লন্ডনে বসবাসরত কিশোর গঞ্জের সন্তান আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী নিরোদ সি চৌধুরী ভারতের হিন্দুস্তান ষ্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় (১০ মে, ১৯৭১) ঠিকই লিখেছেন-

'. . . আমি আবারও বলতে চাই যে এই বিপর্যয় অবশ্যই এড়ান যেত। আমি কোলকাতা থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান তার দাবীর কিছু ছাড় দিলেও পাকিস্তান সরকার কঠোর ভাবে বদলা নিতেই কেবল তারা একটা অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছিল মাত্র। আর এটাই হচ্ছে প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর নিজের অপরাধ বা ত্রুটি ঢাকা দেবার চিরাচরিত বাহানা। তাই যদি হবে তাহলে ইয়াহিয়া খান ১৫ তারিখে ঢাকা আসতে যাবেন কেন? সেই সময়কার অবস্থাতো এমনি দাঁড়িয়ে ছিল যে, একটা প্রদেশ কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে বলেই মনে হচ্ছিল। যুক্ত রাষ্ট্র গৃহযুদ্ধ শুরু হবার সময়ের যে অবস্থা সেটাও এতটা খরাপ ছিল না। মার্চ মাসের ছয় তারিখ থেকে শেখতো সরকারের বাঙ্গালী কর্মচারীদের সহযোগিতায় পূর্ব বাংলা সরকারের সমস্ত কর্তৃত্ব দখল করে নিয়ে ছিলেন- বাস্তবে বিচ্ছিন্নতাতো ঘটেই গিয়েছিল, তাই ৬ মার্চ এর পর যে কোন সময় তো কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক অভিযান চালাতে পারত অতি সহজে।

সুতরাং সামরিক অভিযান শুরু করতে শেখ আর ইয়াহিয়া খানের মধ্যেকার আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য বসে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার এই মন্তব্যের কি জবাব দেওয়া হবে আমার জানা আছে- বলা হবে যে, আওয়ামী লীগকে ভুল পথে চালিত করার জন্য ইয়াহিয়া খান সমঝোতা করার ভান করে চলেছিল। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের দেওয়া যে কোন একটি প্রস্তাব মেনে নিলেন না কেন?

১। শর্তসাপেক্ষে চার দফা মেনে নিয়ে সংসদে যাওয়া।

২। বিনা শর্তে সংসদে যাওয়া।

৩। কেন্দ্রে বেসামরিক শাসন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে সাময়িকভাবে সামরিক সরকারকে মেনে নেওয়া।

উপরের এই শর্তগুলো যে কোন একটা মেনে নিলে মুখোমুখি সংঘর্ষের পথে যে পরিণত হচ্ছে তার চেয়ে ফল খারাপ হত কি?

নিরোদ সি চৌধুরী আরো লেখেন- বাঙালী মুসলমানরা রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করতে গিয়ে হিন্দু চরিত্রের বৈশিষ্ট অর্জন করে বসেছে। কিন্তু বাঙালী হিন্দুর রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা না থাকায় বাঙালী মুসলিমরা কোথায় থামতে হবে তা জানতেন না। যদি প্রতিবাদের কথাই ধরা যায় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পূর্ব বঙ্গের মুসলিমদের পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তবু পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা তাদের নির্বাচিত দুদুটো সরকার কেন্দ্র কর্তৃক বাতিল হতে দেখেও চুপচাপ। তারা এর জন্য কোন বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। কিন্তু হালে গজিয়ে ওঠা মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতাই তাদের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তর তখনই করতে পারতেন যখন দেশের দুটো প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠী সামরিক জান্ডার হাত হতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কার্যকরী পদ্ধতিতে সম্মত হত। যদি তারা পাকিস্তান কে খণ্ড বিখণ্ড করতে সম্মত হত- যেমন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ করতে চেয়েছিল- তাহলেও সমঝোতা চুক্তির দরকার ছিল। কিন্তু সেই চুক্তির ধারে কাছেও এলো না মুজিব। জি ডব্লিউ চৌধুরী লিখেছেন, এডমিরাল আহসান এবং আমি দুজনেই মুজিবের কাছে এই অনুরোধ করেছিলাম যে বাঙালীদের নিজেদের বিষয়াদীর মালিক হওয়ার এবং প্রকৃত ক্ষমতা দখলের এটাই হচ্ছে শেষ সুযোগ। একবার আমি স্মরণ করিয়ে দিই যে, বৃটিশ ভারতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জাতীয় মুক্তির লক্ষে ইংরেজদের

বিরুদ্ধে লড়ছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সালে যখন তারা বুঝতে পারল যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ইংরেজ সরকার আন্তরিক, নেহেরু তখন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তোলেন- যা ভারতের জন্য সুফল বয়ে এনেছিল। আমি শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়া খান ও তার নীতিমালার ব্যাপারে একই মনোভাব গ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করি।

শেখ মুজিব সন্তুষ্ট হওয়ার ভাব প্রকাশ করলেন। তিনি ইয়াহিয়া খান ও আহসানকে বললেন যে, তার ৬ দফা কুরআন কিংবা বাইবেল নয় এবং পরিকল্পনাটি আলোচনা সাপেক্ষ। ১৯৬৯ সালে শরতের এক সকালে তার কক্ষে লক্ষ্যণীয়ভাবে টাঙান সোহরাওয়ার্দীর ছবির দিকে ইশারা করে আমাকে বলেন- 'এই মহান নেতার শিষ্য হয়ে কিভাবে আমি পাকিস্তান ধ্বংসের চিন্তা করি?' এটা ছিল তার চাতুরী। চূড়ান্ত মুহূর্তে তিনি পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্যই সমঝোতা প্রয়াসকে ভন্ডুল করেন।

জি ডব্লিউ চৌধুরী আরো লিখেছেন- 'ইয়াহিয়ার কাছে আমার তৈরী একটি শাসনতান্ত্রিক ফর্মূলা ছিল যাতে মুজিবের কর্মসূচীর সমস্ত দাবীরই স্বীকৃতি ছিল। মুজিব কর্তৃক আলাপ আলোচনা ও সংলাপের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়ার ফলে সব পরিকল্পনা সমস্ত শুভ চিন্তা- চেতনা সব আশা- আকাঙ্খা ভেসে গেল।'

পরিশিষ্ট- ২
জীবনে যা দেখলাম

অধ্যাপক গোলাম আযম

(৫ম খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা সংগৃহীত)

কে. এম. আমীনুল হকের ইরান সফর

কে. এম. আমীনুল হক কিশোর বয়সেই ইসলামী বিপ্লবের প্রেরণা নিয়ে সক্রিয় ছিলেন। ইরান বিপ্লব সফর হওয়ার সময় তিনি রাজবন্দি হিসেবে ঢাকায় কারারুদ্ধ থাকা অবস্থায়ই পরম অনুপ্রেরণা বোধ করেন। এক ইরানী ছাত্রনেতার দাওয়াতে ১৯৮২ সালের আগস্টে তিনি ইরান সফর করেন। তাঁর লেখা 'ইরান সফরের অভিজ্ঞতা' থেকে কতক উদ্ধৃতি পেশ করছিঃ

"আমেরিকা ও তার দোসররা দু'ভাবে তাদের স্বার্থে কাজ করতে শুরু করল। প্রথমত, পাশ্চাত্য প্রভাবিত ব্যক্তিত্বসমূহের ভাবমূর্তি বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো, যেন ক্ষমতার চাবিকাঠি তাদের অনুচরদের হাতে এসে পড়ে।

আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করা হলো একই উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী নেতৃবর্গ, যারা অনমনীয় ও আপসহীন, যাদের বিবেককে কেনা সম্ভব হবে না, তাদের জীবননাশের পরিকল্পনা নেওয়া হলো। বিপ্লবের মাত্র দু'মাসের মধ্যেই ইসলামী ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম চিফ অব স্টাফ জেনারেল কারানীকে খুনীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। ইসলামী চিন্তাবিদ আয়াতুল্লাহ মোতাহারীকে খুন করা হয়। শহীদ হলেন মোফাত্তেহ, কাজী তাবাতাই, ডক্টর বেহেশ্তী, রেজাই ও বাহোনার- এর মতো প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব। রাতের অন্ধকারে খুন হলো বহু বিপ্লবী রক্ষী, তেহরান পরিণত হলো সন্ত্রাসবাদের আখড়ায়।

বনী সদর ক্ষমতাসীন হয়ে আমেরিকার নীলনকশা মতো কাজ শুরু করল। সুপরিকল্পিতভাবে ইমামের ভাবমূতি নষ্ট করার উদ্যোগ নিল। বিপ্লবের ইসলামী

চরিত্র হনন করে এতে জাতীয়তাবাদী চরিত্র আরোপের চেষ্টা করা হলো। জনগণকে লক্ষ্যচ্যুত করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

সিআইএ'র সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চক্রান্ত উপলব্ধি করতে ইরানের বিপ্লবী জনতার বাকি রইল না। বিপ্লবী ছাত্ররা গোয়েন্দাবৃত্তির আড্ডাখানা তেহরানস্থ আমেরিকান দূতাবাস দখল করল। আমেরিকার জন্য ছিল এটা প্রচণ্ড আঘাত। যুগ যুগ ধরে গোয়েন্দা তৎপরতার দ্বারা বিস্তৃত প্রচারণা চালিয়ে আমেরিকা বিশ্ববাসীর সামনে আরব্য উপন্যাসের দানব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সেই ভাবমূর্তি ভেঙ্গে পড়ল। যেন হিন্দুশাস্ত্রের বিশ্বসংহারী কালী মূর্তির বিসর্জন হলো দূতাবাস দখলের মাধ্যমে। আমেরিকা ইরানের সম্পদ আটক করল। এতেও বরফ গলল না। জিম্মি উদ্ধার ও ইরানের কৌশলগত অবস্থানগুলোতে ধ্বংসাত্মক অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত ষড়যন্ত্র খোদার মেহেরবাণীতে তাবাসের মরু বালুকায় সমাধিস্থ হলো।

এরপর আমেরিকা মরিয়া হয়ে উঠল। ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার অবস্থান আর দৃশ্যের বাইরে রইল না। এদিকে উপযুপরি অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে এবং বনি সদরের কর্মকাণ্ড দিয়ে ধাপে ধাপে গোটা দেশকে অরাজকতার দিকে এবং অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল, অন্যদিকে ইরাককে দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হেনে ইরানকে শায়েস্তা করতে চাইল। ঘরে-বাইরে সবখানে সবদিক দিয়ে ইরানকে বিপর্যস্ত করে তুলল আমেরিকা।

আশির সেপ্টেম্বর ভয়ঙ্কর আক্রমণের মধ্যদিয়ে এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের সূচনা করল ইরাক। বোমা আর গোলার আঘাতে বড় বড় শহরগুলো বিধ্বস্ত হলো। কাসরে শিরিন, আবাদান, খুররম শহর, ইলম সামামচে, দেজফুল এবং নাফত শহরের ২০ লাখ মানুষ হলো বাস্তুহারা। বিরাট বিরাট দালান গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলো। বোমা ও গোলার আঘাতে ধ্বংসের অবশিষ্টটুকুও বুলডোজার দিয়ে ধূলিসাৎ করা হলো। চেঙ্গিশ আর হালাকুর প্রেতাত্মা যেন সাদ্দামের ওপর ভর করল। তাতারী আক্রমণের মুখে যেমন বাগদাদ জনমানবহীন বিধ্বস্ত নগরীতে পরিণত হয়, সীমান্তের সমৃদ্ধ

শহরগুলোতে ইরাক তেমনই নৃশংসতার স্বাক্ষর রাখল। এইসব ধ্বংসস্তূপ আমি ব্যাপকভাবে ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ করেছি।

ইরানের কারাগারগুলো এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিপথগামীদেরকে এখানে বিভিন্নভাবে পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনার অব্যাহত প্রয়াস আমরা কারাগারগুলোতে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। দেখেছি মুজাহেদীনে খালকের সদস্যদের ও তুদেহ পার্টির তরুণ কর্মীদের ওপর বলা প্রয়োগ করে নয় এবং সদাচারের মাধ্যমে এদের মন-মগজে ইসলামী চিন্তা-চেতনা প্রবিষ্ট করানো হচ্ছে। আবেগ আর প্ররোচনার পথ পরিহার করে ক্রমশ তারা ইসলামী জীবনবোধের দিকে ফিরে আসছে। বেশ কিছু কারাবাসীর সাথে আমাদের কথা হয়েছিল। তাদের সবার বক্তব্য ছিল প্রায় একই। তা হলো- 'আমরা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছি, পুরান মদের বোতল ভাঙতে আমাদের একটুও সংকোচ নেই। বিদেশী আর বিজাতীয় গোলামী আর নয়, বিভ্রান্তির দিন আমাদের শেষ হয়ে গেছে। ইমামের নির্দেশে আমরা জাতীয় স্বার্থে কাজ করে যাব।'

সবচেয়ে বড় কথা, কারাসীদের পরিবারবর্গের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও সামাজিক মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। অপরাধী পুত্র অথবা স্বামীর কারাদণ্ড হলে সরকারই সেই পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করে থাকে অথবা কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেয়। একটা অপরাধীকে শায়েস্তা করার জন্য আর পাঁচটা অপরাধীর জন্ম দিতে চায় না ইরান।

একাশির ২৮ জুন আমেরিকার চরেরা বোমা মেরে ড. বেহেশ্তীসহ ৭২ জন পার্লামেন্ট সদস্যকে একই দিন একই জায়গায় শহীদ করল। জুমআর নামাযের ইমাম আয়াতুল্লাহ মাদানী, আয়াতুল্লাহ যাদুকী, আয়াতুল্লাহ দস্তগীর, আয়াতুল্লাহ ইস্পাহানীসহ অগণিত দেশপ্রেমিক দ্বীনী আলেম ও গণনেতাকে হত্যা করা হলো। শহীদী রক্তে সঞ্জীবিত হয়ে গর্জে উঠল সমগ্র জাতি। আমেরিকার দালাল বনি সদরকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো। যুদ্ধের গতি পাল্টে গেল। প্রতিঘাতের সম্মুখীন হলো ইরাকের আগ্রাসী বাহিনী। ইসলামের সৈনিকরা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল ইরাকের মাটিতে। কুচক্রীরা তখন শান্তির সপক্ষে

যুদ্ধবিরতির জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার মাধ্যসমূহ, যারা এতদিন আগ্রাসনের সপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিল, তাদের কণ্ঠে শোনা গেল নতুন গান। আশির ১৩ জানুয়ারি দি টাইমসের সম্পাদকীয়তে লেখা হলো- Never invade a revolution তথা বিপ্লবকে আঘাত করো না। একই সম্পাদকীয়তে বলা হলো- Unexpected resistance offered by the Iranian in the face of Iraqi armoured advances. অর্থাৎ ইরাকী গোলন্দাজের আক্রমণের মুখে ইরানের প্রতিরোধ অপ্রত্যাশিত।

ইরানে আমরা সপ্তাহ দুয়েক অবস্থান করেছি। এ সময়গুলোতে মনে হয়েছে আমি আত্মীয়-পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেছি আমার আপন গৃহে। ইরানের মানুষগুলোকে মনে হয়েছে আমার আত্মার আত্মীয়। মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি ২ হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত এ দেশটিতে আমি একজন অতিথি। এখানে স্পন্দিত হতে দেখেছি আমার আত্মার প্রতিধ্বনি, দেখেছি আমার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নের বিমূর্ত প্রকাশ। কত সৌভাবান এ দেশের মানুষ। এদের জীবন, এদের মৃত্যু, এদের সংগ্রাম, এদের সাধনা এক মহান লক্ষ্যে আবর্তিত হচ্ছে। এখানে এই মাটিতে মরণেও সুখ, বেঁচে থাকার নিবিড় প্রশান্তি, সংগ্রামে অপূর্ব শিহরণ। আমার মনে হয়েছে, আমৃত্যু এখানে যদি থাকতে পারতাম! কিন্তু আজকেই ইরানে আমার অবস্থানের শেষ দিন। আগামীকাল ২২ আগস্ট (১৯৮২) স্বদেশের উদ্দেশ্যে বিমানে চাপতে হবে।

আবার ভালো করে দেখার ইচ্ছা জাগল। শেষ বারের মতো দেখার ইচ্ছা হলো এ দেশের স্বাধীন মানুষগুলোর দৃপ্ত পদচারণা। পথে নামলাম। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে হাঁটছি। শোহাদা স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছি। দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো ইমামের প্রতিচ্ছবি। কত বিচিত্র শৈল্পিক আগরে পুরিপূর্ণ হয়ে আছে দেয়ালগুলো। ইংরেজী-ফারসিতে লেখা অজস্র স্লোগান। 'আল্লাহু আকবার' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ছাড়াও অজস্র কুরআনের উদ্ধৃতি যেদিকে তাকাই সেদিকে চোখে পড়ে। ইংরেজিতে লেখা Neither East nor West, Islam is the best. এ শুধু দেয়ালের লিখন নয়। দুই পরাশক্তিকে ইরানীরা দুই কুনইয়ের গুঁতোয় দুই প্রান্তে সরিয়ে রেখেছে। ঐশী নির্দেশকেই তারা মনে করে তাদের একমাত্র

পথ। ইতিহাসের গতিধারায় মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক পথ পরিক্রম করে ইসলাম আজকের আজকের ইরানে যেন সেনথিসিসের অনিবার্য পরিণতি হয়ে এসেছে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে তো এটা এমনিতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদ থিসিস, সমাজতন্ত্র এন্টিথিসিস, ইসলাম সেনথিসিস। যে কোন বিচার-বিশ্লেষণে ইসলাম একটি তৃতীয় স্রোত, আল কুরআনের ভাষায় মধ্যপথ।

একটা দেয়ালের লিখন চোখে পড়ল। ইরানের বিপ্লবী জনতার এই লিখন সমাজতন্ত্রের আবেগে তাড়িত দুনিয়ার নিগৃহীত মানুষের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট। জুলুম-নিপীড়ন-শোষণ-বঞ্চনা অবসানে সমাজতন্ত্রের একচেটিয়া ইজারাদারির বিরুদ্ধে এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ বলতে হয়। দেয়ালে লেখা ছিল- Mr. Marks, Is religion opium of the society! Arise and see, the religion has created a revolution, not economic forces. অর্থাৎ মি. মার্কস, ধর্ম কি সত্যি আফিম! উঠো, উঠে দেখ, অর্থনৈতিক শক্তি নয়; ধর্মই সৃষ্টি করেছে একটি বিপ্লব। আমি পড়লাম। বারবার পড়লাম। মনে হলো আমার দেশের তরুণদের জন্য অনেক কিছু পেয়ে গেছি। এক নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। আগামীকাল ঢাকায় ফিরে যাব।"

পরিশিষ্ট- ৩

আমার দেশ, আমার স্বাধীনতা

অধ্যাপক আবু জাফরের লেখা থেকে-

দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ যখন শুরু হলো আমি কলকাতা চলে যাই। আমার সঙ্গে ছিলেন কুষ্টিয়া আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট কর্মী (স্বাধীনতা- উত্তরকালে নেতা) মরহুম জনাব আবুদল মজিদ এবং আমার একজন আত্মীয় জনাব আবুল কাশেম। শেষোক্ত ব্যক্তি খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি একজন প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা; রণাঙ্গণের অভিজ্ঞতা- সমৃদ্ধ তাঁর একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে; বইটির নাম 'বংশীতলার যুদ্ধ : আগে ও পরে'। আমরা তিনজনই প্রায় একই বয়সী তখন টগবগে যুবক। অন্য দু'জনের কথা বলাই বাহুল্য, আমার নিজের মধ্যেও, পর্যাপ্ত যুদ্ধভীতি সত্ত্বেও, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে শুধু বাংলাদেশ থেকে নয়, পৃথিবী থেকেই উৎখাত ও বিতাড়িত করবার এক অদম্য- উদগ্র কামনা তখন সর্বদা সক্রিয়। অন্য কোনো কথা মাথায়ই আসতো না; শুধু একটাই চিন্তা, একটাই স্বপ্ন, বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হবে, পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ কবে বুকভরা নিঃশ্বাস নিতে পারবে।

আমরা প্রথমে গেলাম কলকাতা বেতারে। দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেকদিন থেকে পত্র- যোগাযোগ ছিল। তিনি আমাদের তিনজনকেই প্রভূত সমাদর করলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে উপেন তরফাদারকে বলে আমাদের একটি সাক্ষাৎকার রেকর্ড করে নিলেন। সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী সপ্তাহে উপর্যুপরি দু'বার প্রচারিত হয়। বেতার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গেলাম কবি বুদ্ধদেব বসুর নাকতলার বাসাতে। তাঁকে পূর্বে দেখিনি, কিন্তু তাঁর সঙ্গেও যেহেতু ঘনিষ্ঠ পত্র- যোগাযোগ ছিল। অনেকটা চেনা মানুষের মতোই বুদ্ধদেবের 'কবিতা ভবনে' গিয়ে হাজির হলাম। কোনরূপ সংকোচ বা আড়ষ্টতা ছিল না। আর যেহেতু আমরা লড়াইরত বাংলাদেশের বাসিন্দা, ভেতরে ভেতরে আমাদের বরং একটু সপ্রতিভ অহংকারই ছিল।

বুদ্ধদেব এবং প্রতিবা বসু, দুজনের কাছে আমরা আশাতীতভাবে সমাদৃত ও আপ্যায়িত হলাম। প্রতিভা এবং বুদ্ধদেব উভয়েই তাঁদের শৈশব- কৈশোর ও যৌবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করেছেন ঢাকায়। অতএব ঢাকা ও বাংলাদেশের সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ও কৌতূহল খুব স্বাভাবিক কারণেই সীমাহীন। আর এ- রকম দু'জন উন্মুখ ও উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে আমার দু'জন সহযাত্রী অবিরলভাবে স্বাধীনতা- যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। কিন্তু হঠাৎই একটু ছন্দপতন ঘটলো। কথার ফাঁকে বুদ্ধদেব বললেন, 'কী- এমন হলো যে, তোমরা হঠাৎ পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাইছো! তোমাদের কত দিকে কত উন্নতি হচ্ছিলো, ভালোই তো ছিলে। আমরাও তো দিল্লীর অনেক অন্যায়- অবিচারের শিকার, তাই বলে কি আলাদ হয়ে যাবো? এখন হয়তো আর ফেরার পথ নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা সবাই ভুল করেছো। আমি তোমাদের লড়াইকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু সমর্থন করি না।' আমরা তিনজনেই হতবাক, মানুষটি বলে কী! কথা আর এগোলো না। আমরা খুবই মুনঃক্ষুন্ন হয়ে ফিরে এলাম আমাদের প্রিয় কবির 'কবিতা ভবন' থেকে। বেলাল ভাই অর্থাৎ ভারত বিচিত্রার প্রাক্তন সম্পাদক কবি বেলাল চৌধুরী এবং কবি আল মাহমুদ দু'জনেই বুদ্ধদেব ও বুদ্ধদেব- পরিবারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমার ধারণা, তাঁরা উভয়েই বুদ্ধদেব বসুর এই প্রতিক্রিয়ার কথা জানেন। আর জ্যোতির্ময় দত্ত (বুদ্ধদেব বসুর জামাতা ও বিশিষ্ট সাংবাদিক) তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'কলকাতা' পত্রিকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে যে একটি বাক্যও লেখেননি, একারণে সুনীল গঙ্গোপাথ্যায়, শঙ্খ ঘোষ ও অন্য অনেকের সঙ্গে কলকাতা' পত্রিকাতেই তাঁকে অনেক বিদগ্ধ- বাদানুবাদে লিপ্ত হতে হয়। বাংলাদেশের সেদিনের সেই জীবন- মরণ লড়াইয়ের প্রশ্নে জ্যোতির এই নিস্পৃহ- নিরাসক্তির কথাও বেলাল ভাই ও আল মাহমুদ নিশ্চয়ই বিস্মৃত হননি।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরের একটি ঘটনা। আমাকে ও আমার পূর্বোক্ত আত্মীয় আবুল কাসেমকে দেবদুলাল তাঁর বালিগঞ্জের বাসায় একদিন খুব আদর করে সকালের নাশতা খাওয়ালেন। আমরা পরিতৃপ্ত উদরে যখন চা খেতে শুরু করেছি, দেবদুলাল অনেকটা উষ্মার সঙ্গে বললেন, 'কিছুমনে করো

করো না, তোমরা আসলেই স্বাধীনতার যোগ্য নও।' আমরা দুজনেই স্তম্ভিত। স্বাধীনতা পেতে না-পেতেই এতোবড় অপবাদ! তিনি বললেন, 'দেখ, এতো বড় একটা যুদ্ধের তাণ্ডব বয়ে গেলো, এতো প্রাণহানি, এতো ক্ষয়ক্ষতি, ; তোমাদের এখন কতো কাজ, কতো দায়িত্ব। অথচ কয়েকদিন আগে তোমাদের কিছু নেতা এসেছিলো, কলকাতা থেকে নামকরা কিছু গায়ক ও নর্তকী ভাড়া করে দিতে হবে। তারা সপ্তাহব্যাপী বড় রকমের ফাংশন করবে ঢাকায়। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এইরকম অকথ্য অমার্জনীয় দায়িত্বহীনতা কল্পনাও করা যায় না। দুঃখ হয়, অনুতপ্ত হই, তোমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমারও কিছু অবদান ছিলো।

দেবদুলাল একজন সংবেদনশীল মানুষ। বুঝলাম, তিনি যথার্থই কষ্ট পেয়েছেন। তার কষ্ট, উষ্মা ও অভিমান কিছুটা স্তিমিত করবার জন্য বললাম, 'দাদা, রণাঙ্গণে যুদ্ধে যুদ্ধে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খেয়ে-না-খেয়ে দিন কেটেছে। বিজয়ীর বেশে ঘরে ফেরার পর একটু আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করলে দোষ কী?' কিন্তু এ-কথায় দেবদুলালের উত্তেজনা হ্রাস-না-পেয়ে আরো বেড়ে গেলো। তিনি সরোষে বললেন, 'দেখো আবু জাফর, যারা এসেছিলো তাদের অনেককে আমি জানি, তাদের যুদ্ধ ছিলো গড়ের মাঠে হাওয়া-সেবন আর কলকাতার হোটেলে হোটেলে আনন্দ-ফূর্তি করা। তারাই এখন তোমাদের দেশবিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ও নেতা। আশঙ্কা হয়, তোমাদের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।' সেই যুদ্ধ-শুরুর প্রাক্কালে 'কবিতা ভবনে' যেমন কষ্ট পেয়েছিলাম, সেদিন আবার একইরকম কষ্ট পেলাম দেবদুলালের কথায়। মনের কষ্ট মনে রেখে দেবদুলালের দোতলার ফ্ল্যাট থেকে আমরা নীরবে নিঃশব্দে পথে নেমে এলাম। কাছেই উডবার্ন স্ট্রীট, সেখানে শ্যামল মিত্র থাকেন। ইচ্ছে ছিলো, কথাও ছিলো তাঁর ওখানে যাওয়ার, কিন্তু প্রাগুক্ত কষাঘাতের পর সেই ইচ্ছে কোথায় যে হারিয়ে গেলো, শ্যামলের কাছে আর যাওয়া হলো না।

অনেকে নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারেন, অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর একটি লেখায় উল্লেখ করেছে যে, তীব্র আকর্ষণ ও অনুরাগ নিয়ে তিনি গিয়েছেন শেখয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। শেখ মুজিব এক সময় তাঁকে বললেন, 'দাদা, আপনারা

এখনো বসে আছেন কেন? দিল্লীর নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসুন।' বাঙ্গালী ভেবে আবেগে অকপটে কথাটা ভালোই বলেছিলেন শেখ মুজিব। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর বলেছেন অন্য কথা: তিনি তখন নীরবে নিঃশব্দে ভাবমগ্ন হয়ে ভাবছেন পাহাড়ঘেরা হিমাচল, কৃষ্ণা-কাবেরী কাঞ্চনজঙ্ঘা কন্যাকুমারিকা, ইলোরা অজন্তা বেনারস হরিদ্বার, সবকিছু নিয়ে বিশাল ভারতবর্ষের যে-পরাক্রান্ত বৈভব, যে বিশাল ভৌগোলিক ঐশ্বর্য ও বিস্তার, তাকে সেচ্ছায় বিদায় জানিয়ে জয়নগরের মোয়া, বর্ধমানের মিহিদানা, নবদ্বীপ আর গেরুয়া-মাটির বোলপুরের জন্য বিচ্ছিন্নতার কথা চিন্তা করাও কি সম্ভব না সংগত! অন্নদাবাবুর এই লেখাটি যেদিন পড়লাম, আমার মনে হলো, প্রবীণ ও বহু গুণান্বিত এই লেখেক-মানুষটির মধ্যে দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তার থাকলেও তিনি বাঙ্গালী নন, সর্বভারতীয় অখণ্ড-হিন্দুত্বের মধ্যেই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। অতএব তিনি দিল্লীর কাছে বশ্যতাকেই সর্বাংশে তিহকর ও উপাদেয় জ্ঞান করেন।

অপর একটি ঘটনা, ১৯৮৬ কি ১৯৮৭ সালে হবে। 'মেঘে ঢাকা তারা' ছায়াছাবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়খ্যাত অনিল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একবার দিল্লীতে আয়োজিত দুর্গোৎসবে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। দিল্লীর কালীবাড়িতে দ্বৈপ্রহরিক আহারের পর আমরা উভয়ে একসঙ্গে বেশকিছু সময় গল্পে গল্পে কাটিয়েছিলাম। মানুষটি খুব সরস ও সহৃদয় রাজ্জাক তাঁর অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয়; এবং রাজ্জাক-যে অভিনয় করে খুব ধনাঢ্য হয়েছেন, এতে অনিল তাঁর খুশির কথা জানালেন। আমার ভালো লাগলো। এক পর্যায়ে অনিল হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'এখন তো আর পাকিস্তান নেই; বাংলাদেশে আমাদের সিনেমা তোমরা যেতে দাও-না কেন? দেবদুলালের কথাগুলো মনে পড়লো। আমি অনিলকে বললাম, 'দেখুন, বাংলাদেশ সিনেমা দেখার জন্য স্বাধীন হয়নি, স্বাধীন হয়েছে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য।' অনিল একটু অপ্রস্তুত কণ্ঠে বললেন, "সংস্কৃতির মানোন্নয়ন এবং আদান-প্রদানও তো একটা বড় কাজ।' তখন যেহেতু আমি নিজে মুশরিকী-সংস্কৃতির মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত একজন তাওহীদ-বিচ্ছিন্ন 'হাফ হার্টেড' মুসলমান, আমি শুধু বললাম, 'আপনার এই কথাটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।' অথচ বলা উচিত ছিলো, এবং আজকে হলে অবশ্যই বলতাম, 'অনিল, আমাদের উভয়ের সংস্কৃতি ও

বিশ্বাস এবং জীবনদর্শন সম্পূর্ণরূপে বিপরীতমুখী। একদিকে তাওহীদ অন্যদিকে অংশীবাদ। এই দুই সংস্কৃতির মিলনে আপনাদের কী হয় না-হয় জানি না, কিন্তু আমাদের পঁচাশি শতাংশ তাওহিদী জনতার জন্য বড়ই বিপজ্জনক।'

যাই হোক, অনেকদিনের কথা, কিন্তু স্বাধীনতার কথা উঠলেই আবার কেন যেন ভুলে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে পড়ে যায়। কেন মনে পড়ে তাও ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু সেই ব্যাখ্যা অনেকের কাছে খুবই অপ্রীতিকর মনে হতে পারে, অতএব তা পরিহার করাই উত্তম। শুধু কয়েকটি অপরিহার্য প্রশ্ন সামনে রাখা জরুরী মনে করি। প্রশ্নগুলো এ-রকম: আমরা কি আমাদের বহুকষ্টে অর্জিত স্বাধীনতাকে যথেষ্ট অর্থবহ করে তুলতে সক্ষম হয়েছি? দেবদুলাল যা-বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে সেই দায়িত্ববোধ কি জাগ্রত হয়েছে? অথবা অনিলকে যা বলেছিলাম, 'সিনেমা দেখা নয়, দেশ স্বাধীন হয়েছে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য' সেই কথার কোনো বাস্তব প্রতিফলন কি প্রতিভাত হয়? কোনো প্রশ্নেরই কোনো গ্রহণযোগ্য সদুত্তর নেই। অনেক মূষিক নিশ্চয়ই ক্ষমতা ও অর্থবিত্তে এক-একটি বিশালাকায় ঐরাবতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু আপামর মানুষের জীবনে শুধু অন্ধকার, গাঢ় নিদ্র অন্ধকার। কিন্তু কেন এমন হলো, কেন এই সমূহ ব্যর্থতা, তারও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু সেই ব্যাখ্যাও প্রীতিকর নয়।

স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হতে চললো। সময়টা কম নয়, এর চেয়ে অনেক কম সময়ে অনেক দেশ আশাতীত উন্নতি লাভ করেছে। অথচ আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থান করছি। আর এ নিয়ে কারো মধ্যে কোনো উদ্বেগই নেই, বরং যা দৃশ্যমান বাস্তব তা খুবই হতাশ্যাব্যঞ্জক। সবাই নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, এই দীর্ঘ সময়ে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে যতো কথা হয়েছে, কাজের কাজ তার এক-সহস্রাংশও হয়েছে কিনা সন্দেহ। মিল-মহব্বতহীন কলহপ্রিয় পরিবারে যেমন সুখ-শান্তি ও উন্নতি ধরা দেয় না, আশাও করা যায় না; আমাদের দেশ ও জাতির ললাটেও এই একই দুর্ভাগ্যের লাঞ্ছনা। ঝগড়াই থামছে না, সুখ ও সচ্ছলতা আসবে কোথা থেকে? অথচ এই আত্মবিনাশী ঝগড়ার অবসান হওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় স্বাধীনতার অর্থ

ও অস্তিত্ব দুটোই ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে যেতে পারে। সাধারণ মানুষ যা-ই ভাবুক, অন্তত নেতা-নেত্রীর উচিত বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা; এবং এটাও অনুধাবন করা উচিত যে, মসনদ ও মসনদে উপবেশন-লিপ্সা যদি স্বাধীনতার গরিমা ও দেশপ্রেমকে পরাভূত করে, তাহলে দেশ ও জাতির জীবনে স্বাধীনতার মতো একটি মহার্ঘ বস্তু প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য। স্বাধীনতা আর স্বাধীনতা থাকে না, কিছু প্রেমহীন আদর্শহীন মানুষের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়।

বস্তুতই মনে রাখা আবশ্যক যে, স্বাধীনতা আল্লাহপাকের একটা অত্যন্ত বড় নেয়ামত। অথচ আল্লাহপাকের কথা ভুলে গিয়ে এই নেয়ামতকে আমরা কদর তো করছিই না, বরং পদে পদে শুধু অমর্যাদা করছি। এই রকমের না-শোকরি আল্লাহপাক বেশিদিন বরদাশত করেন না। আর এজন্যই অবস্থা আজ এমন কুৎসিত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, খুন রাহাজানি সন্ত্রাস অপহরণ চাঁদাবাজি ধর্ষণ অশ্লীলতা উৎকোচ কালোবাজারী, এসব নিয়ে বাঙলাদেশ এখন দুর্নীতির শীর্ষে অবস্থানকারী একটি জ্বলন্ত জাহান্নাম। আসলে এরকমই হয়। মানুষের মধ্যে থেকে, বিশেষ করে নেতা-নেত্রীদের মধ্যে থেকে আখিরাতের ভয়, দেশপ্রেম ও মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ বিলুপ্ত হয়ে যখন মসনদপ্রীতি ও ধনলিপ্সা একমাত্র মাকসুদ হয়ে দাঁড়ায়, তখন এই লোভী ও দায়িত্বহীন মানুষদের দ্বারা শাসিত-পরিচালিত দেশ ও সমাজ কখনো শান্তির জনপদ হতে পারে না। এরকম দেশে ও সমাজে আল্লাহ সার্বক্ষণিক ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার লেবাস পরিয়ে দেন।

প্রসঙ্গত একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ পেশ করতে চাই। কত দলের কত নেতা-নেত্রীর মধ্যে কত মতবৈষম্য ও অনৈক্য বিদ্যমান; অবস্থা এমন যে, একদল কিছু বলতে না-বলতেই, ভালো-মন্দ যা-ই হোক, অন্য দল তার প্রতিবাদ করবেই। এমনকি কেই যদি বলে, সবার জন্য জীবানুমুক্ত নির্মল জলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক, কোনো-না কোনোভাবে তারও প্রতিবাদ হবে। অথচ পার্লামেন্টে যখন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী-মিনিস্টারদের জন্য নানামুখী আর্থিক ও বৈষয়িক সুবিধা-প্রদানের বিল উত্তাপিত হয়, একটি ক্ষীণকণ্ঠের প্রতিবাদী

আওয়াজও কোথাও শোনা যায় না যে, দারিদ্র্যসীমার বহুনিম্নে অবস্থানকারী শতকরা ৬৫ ভাগ মানুষের এই হতদরিদ্র দেশে দেশসেবকদের জন্য এটা গ্রহণযোগ্য নয়, এটা মানবতার সমূহ অপমান। সত্যই কী রোমাঞ্চকর এই ঐক্যবোধ! মদের লাইসেন্স এবং হান্টার-ক্রাউন নিয়ে অনেক আলেম-উলামা প্রায় 'অনাথ শিশুদের' মতো পথে পথে যদিও প্রতিরোধের কথা বলেন, কিন্তু যথাস্থানে বিশেষ কোনোরূপ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় না। বেগম জিয়ার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এসব নিষিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আমাদের প্রীতিভাজন নেতা-নেত্রীদের মধ্যে এ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পেরেশানি লক্ষ করা যায় না। এটা একটা দুর্ভাগ্য। আর এতদসঙ্গে এটাও দুর্ভাগ্য যে, মদ্যপান ওহান্টার-ক্রাউনকে নিয়ে যারা সওদাগরি করতে চায়, তারা কেউ দরিদ্র নয়, তারা অভাবনীয় সম্মদের অধিকারী অথচ তারাই আরো এবং আরো অর্থের নেশায় দিগি¦দিক জ্ঞানশূন্য ও উন্মত্তপ্রায়। আর এই উন্মত্ততা এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে একটি সর্বগ্রাসী রূপ লাভ করছে। অথচ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন : যারা অর্থের দাসত্ব করে তারা অভিশপ্ত।

কেউ কেউ কষ্ট পাবেন, কেউ কেউ ক্রুদ্ধ ও হতে পারেন, কিন্তু না-বলে উপায় নেই, এই অভিশপ্ত ব্যক্তিরাই এখন আমাদের প্রিয় স্বদেশভূমির প্রকৃত চালক ও নিয়ন্ত্রক। অতএব আল্লাহ তাঁর সকল বরকতের দ্বার যদি এখানে রুদ্ধ করে দেন, সেটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সঙ্গে তামাশা করবার জন্য স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি; অথচ এই তামাশাই আজ দেশ ও সমাজের দৃশ্যমান সবাকচিত্র। আর এই দুঃখেই আমাদের এক বন্ধু কবি রফিক আজাদ প্রায় তিরিশ বছর আগে তাঁর একটি কবিতায় বলেছিলেন, 'ভাত-দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাবো'। বড় তীব্র, বড় মর্মন্তুদ এই অভিব্যক্তি! হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন, 'শাসকগোষ্ঠী যদি অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ন হয়, তখন সাধারণ মানুষ ও পাল্লা দিয়ে বিগড়ে যায়, তারাও চরিত্রহীনতার পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। আর সর্বাপেক্ষা অসভ্য নেতা সেই, যার ভ্রান্ত নীতির কারণে অনাচার বিস্তার লাভ করে। স্বাধীনতার যে-তেত্রিশ বছরের ইতিহাস, সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন, সেই

ইতিহাস, কিছু ব্যতিক্রম বাদে, আদৌ সুখকর নয়; প্রায় পুরোটাই অযোগ্য অসভ্য নেতৃত্বের ইতিহাস!

কোন সন্দেহ নেই, সকল নেতানেত্রীসহ আপামর জনগণ, আমরা সবাই আমাদের দেশকে ভালোবাসি, দেশের স্বাধীনতাকে ভালোবাসি। কিন্তু ভালোবাসাই সব নয়, ভালোবাসা যদি আত্মস্বার্থের পোষকতা ও বাণিজ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেটা পরিষ্কার মোনাফেকি বা স্বার্থতাড়িত কপটতা। আমাদের অন্তত এটুকু বোঝা উচিত, দেশের উন্নতি মানে কিছু হাইরাইজিং বিল্ডিং নয়, রিক্সা-চলাচল নিষিদ্ধ কিছু ভিআইপি গমনাগমনের সড়ক নয়, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক থেকে ধার করা অর্থ দিয়ে কিছু মানুষের ঘৃত-সেবনের ব্যবস্থা করা নয়, জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করে দেশে-বিদেশে নির্লজ্জ অট্টালিকা নির্মাণ নয়- এ-সবই এক একটা নির্মম তামাশা। আমাদের দেশপ্রেমকে যদি প্রকৃত অর্থবহ করে তুলতে হয়, তাহলে দেশ-বিদেশের কুলকার্ণি-ঋতুপর্ণাদের নিয়ে নৃত্যগীতের আসর সাজানো নয়, কতিপয় কুহকতাড়িত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীর মনরক্ষা করা নয়, আমাদের উচিত হবে দেশের পঁচাশি শতাংশ তাওহিদী মানুষের আকাক্সক্ষা ও হৃৎস্পন্দনকে অনুভব করা; অর্ধাহারে অনাহারে ক্ষুধিত জঠরে যারা দিবারাত্রি কাজ করে যায়, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়নো, তাদের বিপন্ন বিষন্ন জীবনমানের উন্নয়নকল্পে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি উদ্যোগ গ্রহণ করা। কিন্তু এসব কোনোকিছুই কি সম্ভব, যদি আমাদের মধ্যে আখেরাতের ভয় ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটানো না যায়! বাংলাদেশ নামক এই হাড্ডিসার কামধেনুটি আর পারচ্ছে না। দুধ নয়, দেশের দশ শতাংশ লোভী মানুষের নিষ্ঠুর দোহনে এই হতভাগা দুধেল গাভীর বাঁট থেকে এখন শুধু রক্তক্ষরিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে অন্যকিছু নয়, নির্দয় স্বাথান্ধ মানুষের অতিরিক্ত লোভ থেকে আমাদের এই বাংলাদেশরূপী অবলা কামধেনুটিকে বাঁচানো এবং তার এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করার নামই দেশপ্রেম। (অসহিষ্ণু মৌলবাদীর অপ্রিয়-কথা, পৃষ্ঠা, ১৪-২০)

পরিশিষ্ট- ৪

কিশোরগঞ্জ জেলা ইতিহাস প্রণয়ণ কমিটির দৃষ্টিতে আমি আলবদর বলছি

(সভাপতি মোঃ মাকসুদুল হক জেলা প্রশাসক (ডি, সি)

সম্পাদক মোঃ সাইদুর বিন্নগাও কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জের ইতিহাস নামক এই বইয়ের ৪৪০ পৃষ্ঠায় এইভাবে সমালোচনা করা হয়:

কিশোরগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধারা কেউ কোন বই লিখেননি যেখানে থাকতো যুদ্ধের বর্ণনা, ত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী, দেশপ্রেমের কথা, সর্বোপরি স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনার মরণপণ লড়াইয়ের কথা। কিন্তু রাজাকার- আলবদররা বসে নেই। এই পর্যায়ে দু'টি বইয়ের উদাহারণ দেয়া হলো। একটি রম্যরচনা, অন্যটি নিম্নরূপঃ (১) 'আমি আলবদর ছিলাম'- এই ভূমিকা দিয়ে অষ্ট্রগ্রামের কে এম আনিমুল হক বইটি শুরু করেছেন। উক্ত বই থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো : "ভৈরবে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে আমি সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং নিলাম।... আমি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় চলে এলাম। এখানে সংগঠনের অন্যতম সংগঠক ফারুক ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে আমার উন্নত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে দিলেন।... আমার ধারণা ছিল এর মধ্যে হয়তো অষ্টগ্রামে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এসে শুনলাম এখানকার অবস্থা আগের মতোই। সশস্ত্র ই, পি, আর, আওয়ামী লীগ আর বামপন্থীদের চারণভূমি এই অষ্ট্রগাম। গ্রামে আমার আসার সংবাদ ইতোমধ্যে বিদ্রোহীদের ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে এ খবর জানলাম দেলোয়ার মাস্টার অর্থাৎ দিলু ভাইয়ের চিরকুটে।... আমি তড়িঘড়ি আমার নিকট আত্মীয়দের সহযোগিতায় গোপনে নৌকাযোগে অন্যত্র সরে যাই। অষ্টগ্রামের সাবিয়ানগর থেকে কুলিয়ারচর হয়ে কিশোরগঞ্জে এসে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারপর

আমাদের সমমনা বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে আমি আলবদর বাহিনী গঠন করলাম।" (পৃঃ ২৯-৩০)

"একাত্তুরের ১৭ই ডিসেম্বর। কিশোরগঞ্জে মুক্তিবাহিনী ও হিন্দুস্তানী সেনার সম্মিলিত আক্রমণের মুখে প্রচন্ড প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজাকার, আলবদর, মুজাহিদ ও পুলিশের মৃত্যুকামী সদস্যরা। ১৬ই ডিসেম্বর হিন্দুস্থানের হাতে পাকিস্তানী বাহিনী অস্ত্র সমর্পণের পর যে বিজয় সূচিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের প্রতিরোধ যেন তার কলংকের তিলক। অসংখ্য সেল প্রতিনিয়ত এসে পড়ছে শহরের বিভিন্ন অবস্থানে।... মাগরিবের নামাজের বেশ কিছুক্ষণ পর নেজামী ইসলামী পার্টির প্রধান সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাওলানা আতাহার আলী সাহেবের টেলিফোন পেলাম। তিনি তাঁর আল হামেয়াতুল এমদাদিয়া থেকে আমাকে তলব করেছেন।... তার অশ্র"সজল সকরুণ চাওনি আমাকে বিব্রত করছিল ভয়ংকরভাবে। নীরবতা ভংগ করে বললেন, আমিন, কুদরতের ফয়সালা আমাদের স্বপক্ষে নেই।... আওয়ামী লীগ নেতারা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। আমি মনে করি রক্তক্ষরণের চাইতে অস্ত্র সংবরণই উত্তম।... ইতোমধ্যে আমরা সরকারী হাইস্কুলে এসে পৌঁছলাম।... ওদিকে আর এক দল হলের ভেতর প্রবেশ করে মওলানা আতাহার আলী সাহেবের মাথা ফাটিয়ে দিল। তিনিও নিমিষে রক্তস্নাত হয়ে উঠলেন। আর একজন নির্যাতন চালিয়ে এডভোকেট বদরুজ্জামানের হাত ভেংগে দিল। মুসলিম লীগ নেতা পৌরসভার চেয়ারম্যান সাবেক এম এনএ আবদুল আওয়াল সাহেবের উপর ভয়ংকরভাবে অত্যাচার চালানো হল।... কিছুদিন পর আমাদেরকে কিশোরগঞ্জ জেলে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হয়।...

"একদিন আমাকে একজন কনস্টেবল এসে তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি নিতে বলে এবং আমাকে জানায় এ কারাগার থেকে স্থানান্তরিত করার জন্য উপর থেকে হুকুম এসেছে। আমি তৈরী হলাম। আরও ৩ জন আমার সহগামী হলেন এমপি লোকমান হেকীম, আলী আনোয়ার খান এবং এন এস এফ নেতা আবুল কাশেম ভাই।... জেল গেটে (ময়মনসিংহ) এসে পরলাম, দাঁড়িয়ে থাকতে হল বাইরে। কেননা তখন অফিসার নেই। এখন আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা

না ঘরকা না ঘাটকা। অনেক্ষণ পরে অফিসারা আসার পর আমাদের ঢুকিয়ে দেয়া হলো। ঢুকেই দেখলাম মওলানা মুসলেহউদ্দিন। তিনিও আমাদের মত একজন কারাবন্দী তিনি পিডিপি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।... একদিন শুনলাম ঢাকা থেকে কারাগার সমূহের ডিআইজি জনাব কাজী আবদুল আওয়াল সাহেব আসবেন।... আমাকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য জমাদার মুখ খুললেন। বললেন "স্যার এই যে আমিন। এই জেলের সবচেয়ে বড় টেরর। ২টা কেসে ৪০ বছর জেল হয়েছে।"

(পৃষ্ঠা: ১/ ৩/ ৭/ ১৯/ ২৯/ ৩০/ ৩১/ ৩৪/ ৪১/ ৪১)

"আমি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকা অবস্থায় জানতে পারলাম আমার মুক্তির দিন আসন্ন। কেননা প্রেসিডেন্ট সাত্তার ঈদ উপলক্ষে যে ৬ জন বন্দী মুক্তির ঘোষণা দেন তার মধ্যে ছিলাম আমিও।".. (পৃঃ ১৪১- ১৪২)

জনাব আমিনুলক হক

লন্ডন, ৩১শে জুলাই ১৯৮৯ইং

পূর্ব তেজতরী বাজার, ঢাকা

আমার প্রিয় ভাই আমিনুল হক,

আস্সালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের কাছে অশেষ শোকরিয়া জানাই যে তিনি আপনাকে জানতে আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। আরো তার কাছে শোকরিয়া জানাই যে আল্লাহ আপনার মত একজন মর্দে মুমীনকে অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়ে শুধু আপনাকে বাঁচিয়েই রাখেন নাই বরং আপনার ঈমানকে আরো জোরদার করেছেন এবং মহা মূল্যবান 'আলবদর বলছি' বইখানা লেখা এবং প্রকাশ করার তাওফীক দিয়েছেন।

বইখানা পাবার সাথে সাথেই আমি তা অতি আগ্রহ সহকারে পড়ে ফেলেছি। এবং পড়ার পর আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। আমার অনেক উপকারের মধ্যে মনে হয় যেটি সবচেয়ে মূল্যবান সেটি হচ্ছে, আমার ঈমান আরো মজবুত হয়েছে।

বইটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ইতোমধ্যেই লন্ডনের পাক্ষিক ইমপ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল- এ গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। আমার নিজেরও ইচ্ছা আছে এটির একটি বিস্তারিত রিভিউ করার। কবে তা বলতে পারছি না আজ। কদিন আগে জনাব আশরাফকে (সেবা) লিখেছিলাম আপনার কাছে আমার মোবারকবাদ পৌঁছে দেবার জন। আমি বুঝতে পারছি না তিনি তা ইতোমধ্যেই করেছেন কিনা, বা আমার অনুরোধ সম্বলিত চিঠি তিনি মোটেই পেয়েছেন কিনা। তার কাছে এই বিষয়ে আমার নাম- ইচ্ছার কথা বলতে পারেন। ইতোমধ্যে সাতদিন আগে আপনার কয়টি বইয়ের বিক্রয়মূল্য বাবদ মাত্র তিরিশটি পাউন্ড এক বন্ধুর হাতে ঢাকা পাঠিয়েছি। তা পেয়েছেন কিনা জানি না। না পেলে অধ্যাপক সাজ্জাদ সাহেবের কাছে খোঁজ নিতে পারেন।

শুনেছি যে দাওয়াতের একজনের কাছে আপনার বইটির আরো কিছু কপি আছে। তা যদি পাই তাহলে সেসব বিক্র করেও কিছু অর্থ আপনার কাছে পাঠাতে পারি। আপনার সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগের জন্য আপনার সঠিক ডাক ঠিকানা যদি আমাকে জানাতেন তাহলে আমি উপকৃত হতাম।

আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি আমাদের সাধারণভাবে পরিচিত এক সহকর্মীর হাতে পাঠানোর জন্য। আমি আশা করছি যে তিনি এটি আপনার কাছে পৌঁছাবেন। তিনি যদি আপনার সাথে আসার আগে দেখা করেন তাহলে তার হাতে জরুরী খবরাদি জানালে আমি বাধিত হব।

জনাব আশরাফসহ অন্য সব মোজাহীদ ভাইদের কাছে আমার সালাম ও জেহাদী শুভেচ্ছা জানালে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। ফি আমানিল্লাহ।

ইতি-

আপনার এক নগণ্য তাওহীদি ভাই,

ড. মুঃ তাজাম্মুল হোসেন

পরিশিষ্ট- ৫

ইম্প্যাক্ট ইন্টারন্যাশন- এর (লন্ডন) দৃষ্টিতে ইকবাল ও জিন্নাহ এবং 'আমি আলবদর বলছি' এর মূল্যায়ন

যদিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিকড় গেড়ে বসা বামপন্থি বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতার ফলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক গতিধারা সম্বন্ধে বিশ্ব বিভ্রান্ত তথাপি সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা নিশ্চিতভাবেই প্রমান করে যে মতামতরূপী আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হয়েছে।

দুটি বাংলায় এবং একটি ইংরেজীতে সাম্প্রতিক এ তিনটি পুস্তক যথার্থই এ পরিবর্তনের চিহ্নফলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রথমটি বাংলা নাম 'আমাদের সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় কায়েদ- ই- আযম'।

পাকিস্তানের পতনের পর এটি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে সংকলিত হয়েছে নির্বাচিত সব কবিতা, বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং পূর্ণ কলেবরের বই থেকে উদ্ধৃতি। কৌতূহল উদ্দীপক যে, এর লেখক ও লেখিকারা তাঁরাই যাঁরা ১৯৭২ সালে এসে পুরোপুরি ডিগবাজি খেল এবং বাঙালী মুসলমানদের সকল দুর্ভাগ্যের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে জিন্নাহর বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ করলো। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বেকার তাঁদের যেসব অভিমত সেগুলো তারা বেমালুম ভুলে গেল। অথচ সেসবের রয়েছে জাজ্বল্যমান প্রমাণ। একটা জাতির ত্রাণকর্তা রাতারাতি কি করে বিশ্বাসঘাতকে রূপান্তরিত হলো সেটা ব্যাখ্যা করতে তাঁরা অক্ষম। সংবাদপত্রগুলোর কতক অংশ পুস্তকটির ভূয়সী প্রশংসা করেছে। এর বিক্রয়ের দিকটি লক্ষ্য করলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, জনতা কত আগ্রহ ভরেই না এ সংকলনটিকে স্বাগত জানিয়েছে। পূর্ববাংলার মানুষ কায়েদের কাছে কতইনা ঋণী বিষয়টি সেটাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় পুস্তকটির লেখক কে এম আমিনুল হক। ১৯৭১ সালে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে আলবদর নামক যে সংস্থা এবং যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে তাঁদের দলেরই একজন সদস্য হচ্ছেন লেখক। এটি তাঁর স্বীকারোক্তিমূলক পুস্তক। লেখক কে এম আমিনুল হক তথাকথিত 'দালাল আইনে' জীবনের দশটি বছর কাটিয়েছেন জেলে। এবং সামন্যের জন্য ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলা থেকে বেঁচে গেছেন। তাঁর বর্ণনায় তিনি স্বীকার করেছেন যে পঞ্চমবাহিনী ও ভারতীয় দখলদারদের বিরুদ্ধে মাতৃভূমির হেফাজতের জন্য ১৯৭১ সালে যা কিছু তিনি করেছেন সেজন্যে তিনি অনুতপ্ত নন, ক্ষমাপ্রার্থীও নন। কেবলমাত্র মুজিবুর রহমানের আমলেই নয় বরং তাঁর উত্তরসূরীদের আমলেও বাংলাদেশের জেল অভ্যন্তরে তাঁকে যে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে সেটা বিনা দ্বিধায় তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। পাঁচ বছর পূর্বে এ ধরনের একটা পুস্তক অবশ্যই তড়িঘড়ি করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতো। এর লেখককে পুনরায় কারারুদ্ধ হতে হতো। কিন্তু কোন কোন মহল থেকে আমিনুল হক বীরোচিত প্রশংসা লাভ করেছেন। তিনি যে শাস্তিভোগ করেছে সেটা ছিল দৃষ্টান্তমূলক বিষয়, এক কৌশল, যার মাধ্যমে মুসলিম দেশ হিসেবে মুসলিম বাংলার চেতনাকে অবদমিত করা হয়েছে।

তৃতীয় পুস্তকটি হচ্ছে "ইকবাল গবেষণা"। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হুসাইন, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। দালাল হিসেবে তিনিও দুটি বছর কাটিয়েছেন কারাগারে। পুস্তকটিতে ইকবাল সম্বন্ধে আজকের বাংলাদেশের অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক থেকে সাংবাদিক এবং স্বাধীন সমালোচক অনেকেই এ পুস্তকে অবদান রেখেছেন। সবাই প্রমাণ উপস্থাপিত করে এ অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, বাংলাদেশ ইকবালের কাছে বিরাটভাবে ঋণী হওয়ার কারণেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। ইকবালের স্বপ্ন ভিন্ন মুসলিম- বাংলার জন্ম সম্ভব হতো না।

ইকবাল গবেষণা সংস্থা বিগত ১লা জুনে ইকবালের ৫১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সাধারণ বৈঠক আহ্বান করেছিল। ঢাকার বিভিন্ন স্তরের জনতা,

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, ব্যাংকের প্রশাসক ও সাংবাদিক উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। দু'শতাধিক শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা সমূহে বার বার গুরুত্বসহকারে বলা হয়েছে যে, ইকবালের বাণীর রয়েছে এক শাশ্বত আবেদন যেটা আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে। উক্ত সভার অন্যতম বক্তা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন সিনিয়র এডভোকেট জনাব মুজিবর রহমান ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তির ক্ষেত্রে আল্লামা ইকবাল ও জিন্নাহর অবদান সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা রাখেন।

প্রকাশিত এসব পুস্তক, ইকবাল বার্ষিকীর সভা এবং সংবাদপত্র এসবের প্রাপ্ত প্রচারে এটাই স্পষ্টত প্রতীয়তমান হয়ে যে, ১৯৭১ সালের ভুলের সংশোধনের জন্য বাংলাদেশের একটা পথ- নির্দেশক ফলক ঘুরে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালের ঘটনাই তো বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়েছে।

মূল: সাইয়েদ নসরুল আহসান

ভাষান্তর: চোকদার আবদুস সাত্তার

পরিশিষ্ট- ৬

মন্তব্যবিহীন উদ্ধৃতি

শুধুমাত্র বগুড়ায় স্টেট ব্যাংক থেকে লুট করা হয়েছিল ৫৬ কোটি টাকার উপরে। এ সমস্ত লুটপাটের সাথে জড়িত ছিলেন রাজনৈতিক নেতারা এবং আমলাদের একটা অংশ। কোটি কোটি টাকা নিয়ে বিদেশের মাটিতে বসে ছিনিমিনি খেলার ন্যাক্কারজনক ইতিহাসের কোন জবাব আওয়ামী লীগ সরকার প্রবাসে কিংবা স্বাধীনতার পর জনগণের কাছে দেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি। লুটপাট সমিতির কার্যকলাপে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের তথা সমস্ত বাঙ্গালী জাতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছিল তার কয়েকটি বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

লুটপাট সমিতির সদস্যরা (আওয়ামী লীগাররা) তখন কোলকাতার অভিজাত পাড়াগুলোতে এবং বিশেষ করে পার্ক ষ্ট্রীটের হোটেল বার এবং রেস্তোঁরাগুলোতে তাদের বেহিসাবী খরচার জন্য জয় বাংলার শেঠ বলে পরিচিত। যেখানে তারা যান মুক্তহস্তে বেশুমার খরচ করেন। থাকেন বিলাসবহুল ফ্লাট কিংবা হোটেলে। সন্ধ্যার পর হোটেল গ্রান্ড, প্রিন্সেস, ম্যাগস, ট্রিংকাস, ব্লু ফকস, মলিন রুৎ, হিন্দুস্থান ইন্টার ন্যাশনাল প্রভৃতি বার রেষ্টুরেন্টগুলো জয় বাংলার শেঠদের ভিড়ে জমে উঠে। দামী পানীয় খাবারের সাথে সাথে পাশ্চাত্য সংগীতের আমেজে রঙিন হয়ে উঠে তাদের আয়েশী জীবন। বয় বাবুর্চিরাও তাদের আগমনে ভীষণ খুশী হয়। এমনই একজন নেতা তার দলবল নিয়ে প্রত্যেক দিন হোটেল গ্রান্ডের বারে মদ্যপান করতেন। তিনি বগুড়া ব্যাংক লুটের টাকার একটা বিরাট অংশ কবজা করেছেন কোনভাবে। তার কাছে রয়েছে প্রায় ৪ কোটি টাকা। একদিন মধ্যরাতে তিনি হোটেল বারে গিয়ে মদ পরিবেশন করার জন্য বারম্যানদের হুকুম দেন। বারম্যান্যরা কাচু মাচু জবাব দেয়, সময় শেষ হয়ে যাওযায় বার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জবাব শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন বাঙালি শেঠ। টলমল অবস্থায় চিৎকার করে বলতে থাকেন তিনি হোটেলটাই পুরো কিনে নিতে চান। বেসামাল কিন্তু শাসাল খদ্দের, তাই বারম্যানরা চুপ করে সবকিছু হজম করে যাচ্ছিল। শেঠ আবোল তাবোল বকে পরে একজন বারম্যানকে হুকুম দেন 'কাল বার খোলার সময় থেকে বন্ধ করার আগে

পর্যন্ত তিনি ও তার সংগীদের ছাড়া অন্য কাউকে মদ পরিবেশন করা যাবে না। তারাই শুধু থাকবে বারে। তার হুকুম শুনে বারম্যানরা ম্যানেজারকে ডেকে পাঠায়। ম্যানেজার এলে শেঠ তাকে প্রশ্ন করেন রোজ আপনার বারে সেল কত টাকা? ম্যানেজার একটা অংক তাকে জানায়। শেঠ তখন তাকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন পুরোদিনের সেলের টাকাই তিনি পরিশোধ করবেন, পুরো টাকার মদ খেয়ে ওরা শেষ করতে না পারলে বাকি মদ যেন তার বাথরুমের টাবে ভরে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি তাতে গোসল করবেন।' ম্যানেজার তার কথা শুনে 'থ হয়ে গিয়ে মাতালের প্রলাপ মনে করে কোন রকমে সেখানে থেকে কেটে পড়েন।

আর একদিন আর এক জন জয় বাংলার শেঠ তার পুত্রের প্রথমবারের মত জুতা পরার দিনটি উদযাপন করার জন্য ব্লু ফকস রেষ্টুরেন্টের ১০০ জনের একটি শানদার পার্টি দেন। এ ছাড়া অনেক শেঠ দিল্লী ও বোম্বেতে গিয়ে বাড়ী ঘর কিনতে থাকেন। অনেকে আবার ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাদের এ সমস্ত কীর্তি কলাপের উপর শহীদ জহির রায়হান একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার এ অভিপ্রায়ে অনেকেই ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন তার উপর, অনেকেই তার ঔদ্ধত্যে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তার রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনে এটাও একটা কারণ হতে পারে। কোন এক নায়িকার জন্মদিনে তখনকার দিনে তার এক গুণমুগ্ধ তাকে ৯ লক্ষ টাকা দামের হীরের নেকলেস উপহার দিয়েছিলেন।

দরগা রোডের বিশু বাবুর বাড়ীতে থাকতেন মন্ত্রী পরিষদের পরিবারবর্গ। প্রবাসী সরকারের টাকার প্রায় সবটাই কালো কালো ট্রাঙ্কে ভরে রাখা হয়েছিল বিশুবাবুর বাড়ীতে এবং ৩নং সোহরাওয়ার্দী এভিন্যুর তিনতলা ছাদের দুটো কামরায়। সেখানে থাকতেন অর্থ সচিব জনাব শামসুজ্জামান, তার পরিবার ও রাফিয়া আকতার ডলি। এ টাকার কোন হিসেব ছিল না।

কোলকাতার বড় বাজারের মারোয়ারিদের সাহায্যে এগুলো এক্সচেঞ্জ করা হত। এ কাজের দালালী করেও অনেকেই কোটিপতি হয়ে উঠেন রাতারাতি। কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা লোভ সম্বরণ করতে না পেরে অসৎ হয়ে উঠেন।

কোন এক সেক্টর কমান্ডার এক পাকিস্তানী সিএসপি অফিসারের অন্তসত্বা স্ত্রীকে বেয়নটের আঘাতে মেরে তার গা থেকে সোনার অলঙ্কার খুলে নিয়েছিলেন এমন ঘটনাও ঘটেছে।

যুব শিবির, শরণার্থী শিবিরগুলো নিয়ে কেলেঙ্কারি হয়েছে অনেক। তাদের জন্য সারা বিশ্ব থেকে রিলিফ সামগ্রী, যানবাহন ভারতীয় সরকারের প্রযতেœ এসেছিল। কিন্তু তার কতটুকু বা দেয়া হয়েছিল শরণার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে। এসব রিলিফ সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব ছিল যৌথভাবে ভারত ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের । বগুড়ার স্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়াও মোটা অংকের টাকা নিয়ে আসা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম ভৈরব ও পাবনার ট্রেজারী থেকে, সে টাকারও কোন সুষ্ঠু হিসাব পাওয়া যায়নি।' (যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি: রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্ণেল (অব) শরীফুল হক ডালিম, পৃঃ ২২০-২২২)

বিজয় হল ছিনতাই

নিয়াজীর আত্মসমর্পণের প্রায় ১ সপ্তাহের পরে প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে ফিরে এসে বিনা প্রশ্নে গদিতে বসে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে কেন অনুপস্থিত ছিলেন সে সত্যটি উদঘাটন করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হল না। অথচ মুক্তিযুদ্ধের এই অসহায় মহানায়ক কর্নেল ওসমানীর কতই না প্রশংসা। কেন এই মিছেমিছি প্রশংসা? এর অন্তরালে কি রহস্য? রহস্য তো নিশ্চয়ই রয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়কের কাছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অধিনায়কের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে প্রকতৃপক্ষে ১৬ই ডিসেম্বর, যাকে আমরা 'বিজয় দিবস' হিসেবে অবিহিত করি, সেই দিন থেকেই বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধকে 'বিজয় দিবস' এর পরিবর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'বিজয় দিবস' হিসেবে ইতিহাসে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এই ষড়যন্ত্রের পিছনে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্বীকার করা এবং পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের রণাঙ্গণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিজয় ঘোষণা করা।

'এই বিজয়ে বাংলাদেশের মুক্তিপিপাসু জনগণ এবং মুক্তিযোদ্ধারা ছিল নীরব দর্শক, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ছিল বিনয়ী তাঁবেদার এবং কর্ণেল ওসমানী ছিলেন অসহায় বন্দী। এ যেন ছিল ভারতের বাংলাদেশ বিজয় এবং আওয়ামী লীগ সরকার এই নববিজিত ভারতভূমির যোগ্য লীজ গ্রহণকারী সত্তা। সুতরাং যেমন সত্তা তেমনই তার শর্ত- আর যার কোথায়।'

(মেজর (অব) এম এ জলিল: অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃঃ ৩৬

স্বাধীনতার প্রশ্ন প্রভাতে ভারতের বেপরোয়া লুণ্ঠন

'দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা ১৬ ডিসেম্বরের পরে মিত্রবাহিনী হিসাবে পরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ ও মালামাল লুণ্ঠন করতে দেখেছে। সে লুণ্ঠন ছিল পরিকল্পিত লুণ্ঠন, সৈন্যদের উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ-স্বরূপ নয়। সে লুণ্ঠণের চেহারা ছিল বীভৎস-বেপরোয়া, সে লুণ্ঠন ছিল একটি সচেতন প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিক কর্মতৎপরতা।

পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত কয়েক হাজার সামরিক বেসামরিক গাড়ী, অস্ত্র, গোলাবারুদসহ আরো অনেক মূল্যবান জিনসিপত্র ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। 'প্রাইভেট কার' পর্যন্ত যখন রক্ষা পায়নি তখনই কেবল আমি খুলনা শহরের প্রাইভেট গাড়িগুলো রিকুইজিশন করে খুলনা সারকিট হাউস ময়দানে হেফাজতে রাখার চেষ্টা করি।

'এর পূর্বে যেখানে যে গাড়ী পেয়েছে সেটাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সামীন্তের ওপারে।'

যশোর সেনানিবাসের প্রত্যেকটি অফিস এবং কোয়ার্টার তন্ন তন্ন করে লুট করছে। বাথরুমের মিরর এবং অন্যান্য ফিটিংসগুলো পর্যন্ত সেই লুটতরাজ থেকে রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি নিরীহ পথযাত্রীরা। কথিত মিত্রবাহিনীর এ ধরনের আচরণ জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। (মেজর (অব) এম এ জলিল: অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃঃ ৩৭-৩৮)

আত্মঘাতী পদক্ষেপ

'অবস্থা দৃষ্টে পূর্ব পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ভারতীয় সাহায্য প্রার্থনা, বৈরী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে খণ্ড বিখণ্ড করার সুবর্ণ সুযোগ হিসেবেই- অপেক্ষমান ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারস্থ হয়।'

'আমি ভারতের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিগ্ধ ছিলাম। ভারত বৃহৎ দেশ, তাহার প্রয়োজন বৃহৎ। ছোট ছোট দেশ বড় বড় দেশের স্বার্থে উচ্ছন্নে যাইতে বাধ্য হয়।'. . .

'১৬ই ডিসেম্বর বাঙলাদেশের অভ্যুদয় হওয়া সত্ত্বেও ভারতের মাটি হইতে বাংলাদেশের সরকার ঢাকায় পদার্পণ করে ২০শে ডিসেম্বর। ইহা এক অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনা। শুধু তাই নয়, স্বদেশের মাটিতে প্রর্ত্যাবর্তন করিয়াই প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদের সরকার ১লা জানুয়ারী (১৯৭২) এক আদেশ বলে বাংলাদেশের মুদ্রামান শতকরা ৬৬ ভাগ হ্রাস করেন। উল্লেখ্য যে, এই সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের মুদ্রামান ছিল ভারতীয় মুদ্রামান হইতে বেশি। তাজুদ্দিন সরকার এক ঘোষণায় দুই মুদ্রামানের বিনীময় হারের সমতা আনিতে চাহিয়াছিলেন বটে কিন্তু ফল দাঁড়াইল অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি এবং জনজীবনে আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্য। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় ও বাংলাদেশের অর্থনীতিকদ্বয়কে পরস্পর সম্পূরক ঘোষণা করা হয় এবং এতদিন যাবত ভারতে পাঠ বিক্রির উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাজুদ্দিন সরকার ১৯৭২ এর ১লা জানুয়ারী হইতে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। তাজুদ্দিন সরকারের উক্ত ঘোষণা অর্থনীতির মূল সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।'. . .

'ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্র "অমৃতুবাজার" এর ১২ই মে ১৯৭৪ সংখ্যার রিপোর্ট অনুসারে ভারত সরকার দুই হইতে আড়াই শত রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে স্থানান্তরিত করিয়াছে। স্বর্ণের ভরি ১৭১ টাকা মানে স্থানান্তরিত অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য যদি ৪৫০ কোটি হয়, তাহা হইলে স্বর্ণভরি ১০০০ টাকা মানে উক্ত অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা হয়। তদুপরি মহাচীন কর্তৃক নির্মিত জয়দেবপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী হইতে

অস্ত্র নির্মাণ যন্ত্রপাতি ভারতে স্থানান্তরের অভিযোগ উত্থিত হয়।' (অলি আহাদ : জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, পৃঃ ৫২৮- ৫৩১) '

চোরাচালানীরা সংঘবদ্ধ

বহু ত্র"টির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ত্র"টি দশ মাইল এলাকাকে সীমান্ত আখ্যা দেওয়া। বাংলাদশে ও ভারতের মোট চৌদ্দ'শ মাইল ব্যাপী সীমান্ত রেখার দশ মাইল এলাকাকে বর্ডার ট্রেডের জন্য মুক্ত করিয়া দেওয়ার পরিণাম কি, যে কোন কান্ডজ্ঞানী লোকের চোখে তা ধরা পড়া উচিত ছিল। এর ফলে ভারত-বাংলাদেশের গোটা বর্ডার এলাকাই চোরা চালানের মুক্ত এলাকা হইয়া পড়ে।

সুখের বিষয় বছর না ঘুরিতেই এই চুক্তি বাতিল করা হইয়াছে। কিন্তু এই চুক্তি যে বিপুল আয়তনের চোরাচালান বিপুল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে তার কব্জা হইতে বাংলাদেশ আজও মুক্ত হইতে পারে নাই। (আবুল মনসুর আহমদ: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃঃ ৪৯৮)

সৌখিন দেশপ্রেমিকদের অর্থনৈতিক শোষণ

'সেই সৌখিন দেশপ্রেমিকরা যারা যুদ্ধ করার জন্য নয়, বরং প্রাণ বাঁচানোর জন্যই ভারতে গিয়েছিল তারা আজ সমাজের উচ্চাস্থানে অধিষ্ঠিত। মানুষকে প্রতারণা করার ক্ষমতা ওদের অনেক। অভিনয় নিখুঁত। ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্যে জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে ওরা কুণ্ঠাবোধ করে না। বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, মহারথীরা আজো কোন এক অজ্ঞাত কারণে অদৃশ্য প্রভুদের অঙ্গুলী নির্দেশে চলতে বাধ্য। এই ঘটনাগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির জীবনে বিপর্যয়ের মূলে অনেকাংশে আছে এই লোভী মানুষগুলোর অপরিণামদর্শী কার্যকলাপ। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা করছি। জানিনা আর কত দিন করতে হবে।'

'স্বাধীনতার পর কি হলো? এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চলল বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করার। উৎপাদন কমে গেল, বেড়ে গেল শ্রমিক অসন্তোষ। অন্তর্ঘাতমূলক

কার্যকলাপ বেড়ে গেল। বেড়ে গেল গুপ্ত হত্যা। কলকারখানা ধ্বংস হলো। কোন অদৃশ্য অশুভ শক্তি যেন বাংলার মানুষকে নিয়ে রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠল। ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হলো অনেকে। সেইসব সৌখিন দেশপ্রেমিক সবাই মিলে ছারখার করেছিল বাংলার মানুষের স্বপ্নসাধ। চোরাকারবারের লাইন তারা আগেই করে রেখেছিল। পুরো দেশ ছেয়ে গেল অবৈধ ব্যবসায়। প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হল জাঁদরেল সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী আর কিছু রাজনৈতিক কর্মী। শক্তিশালী মহলের সমর্থনপুষ্ট নাহলে এত বিরাট আকারে অবৈধ ব্যবসা সম্ভব নয়। তাহলে কি একথা বলা যায় না, কোন প্রভাবশালী মহলের প্রচেষ্টায় ধ্বংস হয়েছে এদেশের অর্থনীতি?. . . "শুধু তাই নয়, ভেজালে ছেয়ে গিয়েছিল সমস্ত দেশ।"

'পুরো দেশটাই আজ যেন একটা পরিত্যক্ত সম্পত্তি। সবার লক্ষ্য হচ্ছে যেমন করেই হোক নিজের পকেট ভর্তি করা। সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাক তাতে কার কি আসে যায়? আর শাস্তির তো কোন ভয়ই নাই।'

'দীর্ঘ তিনটি বছর আমরা এই সব কলঙ্কময় ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের চোখের সামনে ধান চাল পাট পাচার হয়ে যায় সীমান্তের ওপারে। আর বাংলার অসহায় মানুষ খাদ্যের জন্য বিশ্বের দুয়ারে সাজে ভিখারী। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা শুধু ভৌগলিক হয়ে রইল। বিশ্ব মানব সভায় যে সম্মান আমরা পেয়েছিলাম, ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে সে সম্মান স্বেচ্ছায় পদদলিত করেছি। স্বাধীনতা শুধু কিছু সংখ্যক ভাগ্যবানের জীবনে এনেছে অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য।'

(মেজর (অব) মোঃ রফিকুল ইসলাম: দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী, পৃঃ ১১৯-১২৬)

বাংলাদেশ নয় পাটের রাজা হল ভারত

আওয়ামী বাকশালীরা যাই মনে করুক বাংলার মানুষ ঠিকই বুঝে নিয়েছিল যে, এটা ছিল সেই মারাত্মক খেলারই এক অনিবার্য পরিণতিঃ যে খেলায় গোটা মাঠে একদিকে ছিলেন শেখ মুজিব এবং অন্য দিকে ছিলেন কম্যুনিষ্ট

রাশিয়ার ধুরন্ধর বরকন্দাজরা ভারতের দোসর হিসেবেই। বর্ডার চুক্তির নামে বেরুবাড়ী ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ফারাক্কা চুক্তির নামে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার কারসাজী, টাকা বদলের নামে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে 'ফোকলা' করে ফেলা হয়েছিল। বর্ডার বাণিজ্যের নামে বাংলাদেশকে পরিণত করা হয়েছিল ভারতের বস্তাপচা মালামালের বাজারে। পাটের রাজা বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল পাটহীন পক্ষান্তরে পাটহীন আগরতলায় স্থাপিত হয়েছিল গোটা পাঁচেক পাটকল। কলিকাতার পাটকলগুলি কয়েক শিফট চালিয়েও কাজ করে কুলাতে পারত না। (আখতারুল আলম : দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী, পৃ. ১১৫-১১৬)

৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার

দুইশ' বছরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যা করতে পারেনি, ২৫ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানীরা যা করবার সাহস পায়নি, মাত্র তিন বছরে হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী বঙ্গবন্ধু প্রেমিকরা (!) তা করেছে। বাংলাদেশের কি সর্বনাস তারা করেছে তার একটি হিসেবের সারসংক্ষেপ দেখুন:

১। ধান, চাউল ও গমের পাচার হয়েছে ৭০/৮০ লাখ টন।
মূল্য (গড়ে ১০০ টাকা মূল্য ধরলে) ২১৬০ কোটি টাকা।

২। পাট পঞ্চাশ লাখ বেলের উপরে ৪০০ কোটি টাকা।

৩। ত্রাণ সামগ্রী পাচার হয়েছে ১৫০০ কোটি টাকা।

৪। যুদ্ধাস্ত্র, আমদানী করা যন্ত্রাংশ,
ঔষধপত্র, মাছ, ছাগল, গরু, মহিষ,
মুরগী, ডিম, বনজ সম্পদ ইত্যাদি মিলে ১০০০ কোটি টাকা।
সর্বমোট ৫০৬০ কোটি টাকা

(জনতার মুখপত্র, ১লা নভেম্বর, ১৯৭৫)

সমকালীন প্রতিক্রিয়া

আতাউর রহমান খান: প্রদর্শনের ফলেই দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। (২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪)

ভাসানী ন্যাপ: যারা লুটপাট করে খেতে পারে না তাদের পক্ষে বাঁচার কোন উপায় নেই। (৮ এপ্রিল ১৯৭৪)

আওয়ামী লীগের সহযোগী সিপিপি: 'দেশ আজ চরম সংকট ও বিপর্যয়ের মুখে উপস্থিত। মজুতদার, মুনাফাখোর, কালোবাজারী, চোরাচালানী ও লাইসেন্স পারমিট শিকারীদের চক্রান্তের সাথে দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের যোগসাজশ, সর্বোপরি শাসকদের একাংশ উক্ত সমাজ-বিরোধীদের আশ্রয় দিচ্ছে বলেই বর্তমান সময়ে সংকট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।' (১৮ এপ্রিল, ১৯৭৪)

৭০ জন বুদ্ধিজীবির বিবৃতি: বাংলাদেশের বর্তমান খাদ্যভাব ও অর্থনৈতিক সংকট অতীতের সর্বাপেক্ষা জরুরী সংকটকেও দ্রুতগতিতে ছাড়াইয়া যাইতেছে এবং ১৯৪৩ সনের সর্বাগ্রাসী মন্বন্তরের পর্যায়ে পৌঁছাইয়া গিয়াছে।

বর্তমান পরিস্থিতিকে সরকার 'প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা' বলিয়া অভিহিত করার মাধ্যমে দুর্দশার প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। মন্বন্তরের মোকাবেলায় দেশের বিভিন্ন সামাজিক শক্তিসমূহের উপর কোন প্রকার আস্থা স্থাপন না করিয়া সরকার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছেন কতিপয় বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের উপর এবং অভ্যন্তরীণ একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ, টাউট, বদ-মতাব্বর ও অনুশোচনাহীন আত্মসাতকারীর উপর। এ দুর্ভিক্ষ মানুষ দাড়া সৃষ্ট এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর অবাধ লূণ্ঠন ও পাচারের পরিণতি। ১৭৬১ সালের মন্বন্তর, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ন্যায় ১৯৭৪ সালের এই মন্বন্তরও মনুষ্য-সৃষ্ট এবং উৎপাদনযন্ত্রের সহিত সম্পর্কবিহীন এক শ্রেণীর মজুতদার, চোরাচালানী ও রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ব্যবসায়ীরাই ইহার জন্য দায়ী।

খাদ্য ঘাটতি কখনো দুর্ভিক্ষের মূল কারণ হইতে পারে না। সামান্যতম খাদ্য ঘাটতির ক্ষেত্রে শুধু বণ্টন-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা যায়। যদি দেশের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা নিম্নতম ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রের সুবিচারকে নিশ্চিত করার সামান্যতম আন্তরিক চেষ্টাও থাকিত, তাহা হইলে যুদ্ধের তিন বছর পর এবং দুই হাজার কোটি টাকারও বেশী বৈদেশিক সাহায্যের পর ৭৪ সনের শেষার্ধে আজ, বাংলাদেশে অন্ততঃ অনাহারে মুত্যুর পরিস্থিতি হইত না। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও মন্বন্তরের মোকাবিলা কোন মানবিক প্রশ্ন নয়, ইহা একটি মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্ন।'

তিন বছরে আড়াই হাজার কোটি টাকার চাল পাচার হয় : গত তিন বছরে বাংলাদেশ থেকে পঞ্চাশ লাখ টান খাদ্যশস্য পাচার হয়েছে বলে একটি বিদেশী পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টেও এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। পশ্চিম বাংলার একটি মাসিক পত্রিকার ডিসেম্বর '৭৪ সংখ্যায় 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ!' শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয় যে, 'বাংলাদেশের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের হিসেব অনুসারে ১৯৭১ এর পরবর্তী তিন বছরে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে ৩৩৩ লাখ টন। তাছাড়া ১৯৭৪-এ আউস ধান উৎপন্ন হয়েছে ২৮ লাখ টন। অর্থাৎ মোট প্রয়োজন ৩৫১ লাখ টন। আর এই তিন বছর খাবার জন্য মোট প্রয়োজন ৩২৩ লাখ টন এবং বীজ ধানের জন্য (মোট উৎপাদনের ১০% প্রয়োজন ৩৩ লাখ টন অর্থাৎ মোট প্রয়োজন ৩৫৬ লাখ টন। এই তিন বছর (১৯৭৪-এর অক্টোবর পর্যন্ত) বিদেশ থেকে মোট খাদ্য আমদানীর পরিমাণ ৬৫ লাখ টন।

অর্থাৎ উৎপাদন ও আমদানী খাতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে, ৩৫১+৬৪ = ৪১৫ লাখ টন, মোট প্রয়োজন যেখানে ৩৫৬ লাখ টন। অর্থাৎ প্রায় ৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হবার কথা- কিন্তু তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। (আবদুল গাফফার চৌধুরী রিপোর্ট, দৈনিক জনপদ)

ভারতে জাল নোট ছেপে অর্থনীতি ধ্বংসের চক্রান্ত

'বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া ধনসম্পদের বিনিময়ে প্রতিবেশী ভারত থেকে আমাদের দেশে আরো যেসব মহামূল্যবান ধনসম্পদ আসতো তার একটি হচ্ছে ভারতে মুদ্রিত বাংলাদেশী জাল টাকা। এই জাল মুদ্রা পাচার এতটাই ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল যে, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, মুদ্রা পাচারের ফলে জাতীয় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। এক কথায়, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ তখন হয়ে পড়েছিল দেশী-বিদেশী লুণ্ঠন ক্ষেত্র। এখান থেকে খাদ্য শস্য, অর্থকরী ফসল, বৈদেশিক মুদ্রায় কোন মুল্যবান যন্ত্রপাতী ও যন্ত্রাংশ উধাও হয়ে গেছে। আর তার বিনিময়ে এসেছে ভারতে ছাপা জাল টাকার নোট, বিড়িপাতা আর গরম মসল্লা। এই চমৎকার ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়লেও ক্ষমতার স্নেহপুষ্ট এক শ্রেণীর তথাকথিত জননেতার পকেটে সাগরের জোয়ারের মত টাকা জমা হচ্ছিল এবং এত টাকা যে, সেটা তারা দেশের ব্যাংকে জমা রাখা নিরাপদ বোধ করতেন না।' (আবদুর রহিম আজাদ: একাত্তরের গণহত্যার নায়ক কে? পৃঃ ৫২)

সেনাবাহিনী ধ্বংসের ষড়যন্ত্র

২৫ মার্চ-এর গণহত্যা অভিযানের মুখে রাজনৈতিক শক্তি যখন জাতিকে অপ্রস্তুত অবস্থায় তোপের মুখে ঠেলে দিয়ে, জাতির সামনে কোন দিক-নির্দেশনা না দিয়ে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছে সে সময় এই সেনাবাহিনীর সদস্যরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, জাতিকে পথ দেখিয়েছে। চট্টগ্রাম কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ডাক দিয়েছে সেনাবাহিনীরই একজন সদস্য- মেজর জিয়াউর রহমান। সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাস প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করেছে ইপিআর-এর সদস্যরা। ১১টি সেক্টরে সশস্ত্র যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে সশস্ত্র বাহিনী। সশস্ত্র বাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সকল ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা তখন মানুষকে সাহস যুগিয়েছে, নিরাপত্তা দিয়েছে, প্রতিরোধ যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছে এবং মানুষের শ্রদ্ধা-ভালবাসা কেড়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এভাবে

জাতীয় স্বাধীনতার রক্ষা-কবচ হিসেবে জনচিত্তে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিব স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিলেন তাদের সরিয়ে দিলেন নেপথ্যে। তাদের অবস্থান, শক্তি এবং মর্যাদাকে আরো সংকুচিত করার জন্য গঠন করা হলো রক্ষীবাহিনী। অল্প দিনের মধ্যেই সাফল্যের সাথে রক্ষীবাহিনী নিজেকে সামাজিক ত্রাসরূপে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললো। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে কোন অসুবিধা হবে না। গোটা জাতি বুঝল, ৯ মাসে যে স্বাধীনতার জন্য তারা রক্ত ঝরিয়েছে সে স্বাধীনতা 'জলপাই রং'-এর হাতে বন্দী হয়ে গেছে।'

'এই জলপাই রং-এর খেলায় সীমান্ত খুলে গেল। যার পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশ পেল অত্যাশ্চর্য এক বিশ্ব পরিচিতি- 'তলাবিহীন ঝুড়ি'। (আবদুর রহিম আজাদ: 'একাত্তরের গণহত্যার নায়ক কে?' পৃঃ ৪৫)

'সেনাবাহিনীর প্রতি আওয়ামী লীগের তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা অবহেলাকে জেনারেল জিয়াউর রহমান তার এক ভাষণে স্বীকার করেছেন। ৭৫ সালে ১২ই নভেম্বর তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর ঐদিন পর্যন্ত (১৫ আগস্ট) সে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তাদের অবহেলা ছিল এতটাই যে, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল নিদারুন হতাশা।' (দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী)

পত্র-পত্রিকার প্রতিক্রিয়া

'যশোর-খুলনা-কুষ্টিয়া এই তিনটি জেলার সমস্ত সীমান্ত এলাকায় চোরাচাল নির্বিঘেœ চলিতেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ প্রভাবশালী মহলের আশীর্বাদপুষ্ট এইসব সমাজ বিরোধী ব্যক্তিকে দমনে সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িয়াছে।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট)

লাইসেন্স পারমিটের জম-জমাট ব্যবসার যাতাকলে পড়ে মানুষ খাবি খাচ্ছে। (গণকণ্ঠ, ২৯ আগস্ট, ১৯৭২)

গরীব মানুষ খাদ্য পায় না, টাউটরা মজা লুটছে। (গণকণ্ঠ, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)

'বাংলাদেশ রাইফেলস-এর জোয়ানগণ গত দুইদিন সীমান্ত এলাকা হইতে ভারতে ছাপা বিভিন্ন মানের মোট ২ হাজার ৭শ' ৬২ টাকার বাংলাদেশী কাগজী মুদ্রা আটক করিয়াছেন।' (ইত্তেফাক, ১০ই এপ্রিল ১৯৭৩)

ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র ইসলামপুর, মৌলভীবাজার, চকবাজার হইতে ব্যবসায়ী নামধারী এক শ্রেণীর লোক হাজার হাজার মন চাল, ডাল, প্রভৃতি ক্রয় করিতে শুরু করিয়াছে। ব্যবসায়ী মহলও জিনিসপত্র কেনার এই ধুম দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে ভাবিতেছেন যে, এই মালপত্র যাইতেছে কোথায়?. . .

'কোন একটি মহলের খবরে প্রকাশ, সীমান্তের ওপার এক শ্রেনীর অসাধু ব্যবসায়ী সীমান্ত এলাকায় গুদাম নির্মাণ করিয়া এই সব জিনিসপত্র কিনিয়া গোদামজাত করিতেছে।' (ইত্তেফাক, ১৬ এপ্রিল ১৯৭৩)

'দুষ্কৃতিকারী দমনের নামে চরম সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম: পাবনার যুবতী মেয়েরা ইজ্জতের ভয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।' (ইত্তেফাক, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)

'গত হপ্তার রাজনীতি: রক্ষীবাহিনীর রুদ্র মূর্তির সামনে ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়েছিল।' (ইত্তেফাক, ২৭ জানুয়ারী, ১৯৯৪)

খাদ্যোদ্বৃত্ত দিনাজপুর জেলাতেও দুর্ভিক্ষ নিষ্ঠুর থাবা ফেলিয়াছে। ফলে দিনমজুর জেলা সদরেই প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০জন অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে। রেল স্টেশন ও ইহার আশেপাশে বুভূক্ষ মানুষের ভিড় ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে। ক্ষুধার তাড়নায় রংপুর হইতে হাজার হাজার অসহায় পরিবার দিনাজপুরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।' (ইত্তেফাক, ২৫ অক্টোবর, ১৯৭৪)

'স্মাগলিং হয় সীমান্ত এলাকা হইতে এ খবর সবারই জানা কিন্তু সরকারী খাদ্য গুদামেও যে এই 'কারবার হইয়া থাকে তাহার খোঁজ কেহ রাখেন কি?' (ইত্তেফাক, ১ নভেম্বর, ১৯৭৪)

'এক মুঠু নুন দ্যাও।' (ইত্তেফাক, ১ আগস্ট, ১৯৭৪)

'দুঃখিনী বাংলাকে বাঁচাও। (ইত্তেফাক, ১০ আগস্ট, ১৯৭৪)

'ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তচিৎকারে ঘুম ভাংগে।' (ইত্তেফাক, ২৩ সেপ্টম্বর, ১৯৭৪)

'ওরা বুভূক্ষ মানুষের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে' ঐ

'বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ জন শিক্ষকের বিবৃতি: দেশ মন্বন্তরের করালগ্রাস।' (ইত্তেফাক, ৩০ সেপ্টেম্বর- ১৯৭৪)

'ক্ষুদার আগুন জ্বলিতেছে।' (ইত্তেফাক, ১ অক্টোবর, ১৯৭৪)

'ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে ৮৪ জনের লাশ দাফন।' (ইত্তেফাক, ১৩ অক্টোবর, ১৯৭৪)

'উত্তরাঞ্চলে অনাহারে ও কলেরায় দৈনিক দেড় সহস্র লোকের মৃত্যু।' (ইত্তেফাক, ৯ নভেম্বর, ১৯৭৪)

'গত কয় বছরে ৪ হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যের জাহাজ চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া ডুবিয়া গিয়েছে। অন্যূন ৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার হইয়া গিয়াছে, (এবং) শেখ মুজিব দেশব্যাপী ৫৭০০ লঙ্গরখানা খুলিবার নির্দেশ দিয়াছেন।' (ইত্তেফাক ২৭ মার্চ ১৯৭৫)

'১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এর আগে সাড়ে তিন বছর ধরে ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী সরকার এ দেশে শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের এক ভয়াবহ রাজত্ব কায়েম করেছিলো। এই সময়ে বাংলাদেশে ঘটেছে ভয়াবহ মন্বন্তর।'

'সরকারী হিসেবে বলা হয়েছে, এই মন্বন্তরে সাড়ে সাতাশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারীভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সূত্রে জানা গেছে '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষেরও বেশী।'

'এই দুর্ভিক্ষের সূচনা ঠিক চুয়াত্তরে হয়নি, হয়েছে আরো আগে থেকে। বলা যেতে পারে '৭২ সালেই দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল। গ্রামবাংলায় যখন চালের দর প্রতিদিন ধাপে ধাপে বাড়ছিলো, সেই সংগে বাড়ছিলো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর এবং ক্রমশ সেগুলো চলে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। হাজার হাজার কোটি টাকার ধান ও পাট বিদেশে পাচার হয়েছে চোরা পথে। রাষ্ট্রয়ত্ত কল-কারখানায় দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসকরা, যারা ছিলেন ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতিনিধি তারা শুরু করলেন অবাধ লুণ্ঠন, বিক্রি করে দিলেন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল ও অন্যান্য শিল্প সামগ্রী।'

'জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লো। বিদেশ থেকে আমদানী করা কয়েক হাজার কোটি ডলারও সেই ঘাটতি পূরণ হলো না, বরং বিদেশী ত্রাণ সামগ্রীও পাচার হয়ে গেলে সীমান্তের ওপারে।'

ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের স্বীকারোক্তি

কামরুজ্জামান

'গত মঙ্গলবার ঢাকা নগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় বিশেষ অতিথির ভাষণে জনাব কামরুজ্জামান বলেন যে, জাতি সংকটের মধ্যে অবস্থান করিতেছে এবং আমরা সমস্যার সমাধান করিতে পারি নাই- এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে।' (দৈনিক ইত্তেফাক ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭৪)

তাজুদ্দিন

'বাংলাদেশের কতিপয় নেতার বিদেশে ব্যাংক ব্যালান্স রয়েছে, তারা অনবরত দেশ থেকে মুদ্রা পাচার করে দিচ্ছে, ফলে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। দেশের মানুষ কাপড়ের অভাবে মরছে আর

এক শ্রেণীর শিল্পপতি নামধারী লন্ডনে কাপড়ের কল চালু করছে।' (জনপদ, ১১ মার্চ, ১৯৭৪)

এম এ মোহাইমেন

দু'দিনেই আরম্ভ হল লুট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এডমিনিস্ট্রেটার, পারচেজ অফিসার, ম্যানেজারগণ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নেতাদের যোগ সাজসে প্রায় প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানেই লুট করতে আরম্ভ করল। ফলে দফায় দফায় জিনিসের দাম বাড়তে লাগল। এক একটি পাটকল ও বস্ত্র কলে দ্বিগুণ আড়াই গুণ শ্রমিক নিয়োজিত হলো। শ্রমিক ভাতার ব্যাপারে কারচুপির অন্ত রইল না। বহুস্থানে অস্তিত্বহীন শ্রমিকের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা মাহিনা নেয়া হতে লাগল। পাটকলগুলিতে পাট এবং খুচরা যন্ত্রাংশ কেনার প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি টাকা অপচয় হতে লাগল। সার্বিক অব্যবস্থার ফলে পাটের দর অসম্ভব কমে গেল। কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অল্পদিনেই বুঝা গেল ভারতের যেখানে পাটকলগুলি দক্ষ মোড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের হাতে রয়েছে সেখানে বাংলাদেশে পাটকলগুলি জাতীয়করণ করে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য পরিচালকদের দ্বারা পরিচলনা করা মস্তবড় ভুল হয়েছে। বিশ্ব বাজারে আমরা বাজার হারাতে লাগলাম আর সে স্থান দখল করল ভারত। পাটকল জাতীয়করণ করার সময় এটা মোটেই খেয়াল করা হয়নি যে, পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র পাট উৎপাদনকারী দেশ নই।

'বস্ত্রশিল্পের ব্যাপারেও একই ব্যাপার ঘটেছে। তুলা ও সূতা বিক্রির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুট হলো। জাতীয়করণকৃত বস্ত্র কলের একেক জন ম্যানেজারের গড়ে মাসিক আয় পঞ্চাশ হাজারে এসে দাঁড়ায়। অধিকাংশ সূতা কালো বাজারের মারফৎ সরকারী মূল্যের উপর বেল প্রতি দেড় থেকে দুই হাজার টাকার অধিক মূল্যে তাঁতীদের হাতে পৌঁছাতে লাগল। বাড়লো তাঁতীদের দুর্গতি, জাতীয়করণ করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতি লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হলো।' (এম এ মোহাইমেন: 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ,' পৃঃ ১৪)

'১৯৭২ সনে অবাঙ্গালীদের পরিত্যক্ত শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে কোন প্রকার ইনভেন্ট্রি তৈরী না করেই যাকে তাকে

পরিচালক বানিয়ে সেগুলো চালাতে দেওয়া হলো। ইনভেন্ট্রি তৈরী না করে চালাতে দেওয়ার দরুন কারখানা চালু করার সময় তৈরী মালের স্টক কত ছিল তা আর কারও জানবার উপায় রইল না। ফলে আরম্ভ হলো যথেচ্ছ লুট। তখন এক একটি কল-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোটি কোটি টাকার তৈরি মাল ছিল। একাত্তরের স্বাধীনতার সংগ্রামের সময় দেশবাসীর যুদ্ধ চলার দরুন উৎপন্ন দ্রবাদি বিক্রি সম্ভব না হওয়ায় বহু কারখানাতেই প্রচুর উৎপাদিত মাল জমা হয়েছিল। '৭২ এর প্রথম থেকেই ঐ সমস্ত মাল লুট হতে আরম্ভ হলো। ১৬ ডিভিশন নামে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা। তারপর আরম্ভ করল পরিচালনায় যারা নিয়োজিত হয়েছিল তারা এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গোরা। এত সম্পদ বাঙ্গালী যুবকেরা কখনও এক সংগে চোখে দেখেনি। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই লুটের একটা সর্বগ্রাসী বন্যায় দেশ তলিয়ে গেল। সে বন্যায় কোথায় ভেসে গেল বাঙ্গালী যুবকদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ, স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা। তারপর আরম্ভ হলো লূণ্ঠত অর্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি।' (এম এ মোহাইমেন : বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, পৃঃ ৪৪)

'এদেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিল যে, ভারত মনেপ্রাণে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের মুসলমানদের মঙ্গল কোনদিন চায়নি। শুধু পাকিস্তানকে ভাঙ্গবার লক্ষ্যেই তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে এত সাহায্য করেছিল, এদেশের লোকের সত্যিকার মুক্তির জন্য সাহায্য করেনি। তাদের এ ধারণা সত্য কি মিথ্যা সে আর এক স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তবে যখন বাংলাদেশ হয় তখন দেশের অধিকাংশ লোকের মনোভাবই এরূপ ছিল। ঠিক এসময়ে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এ ধরনের বক্তব্য ও আচরণে অধিকাংশ প্রবীণ ও বুদ্ধিজীবী মহলের ধারণা হলো আওয়ামী লীগ ভারতীয় চিন্তা ও প্রভাবে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। ধীলে ধীরে কার্যকারণে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে লাগল যে ভারতীয় স্বার্থ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস আওয়ামী লীগের নেই।'

'ভারত ও বাংলাদেশ এর মধ্যকার কতগুলো বিরোধের বিষয়, যেমন ফারাক্কা, দহগ্রাম, আঙ্গুরপোতা ও তালপট্টির ব্যাপারে আওয়ামী লীগের একান্ত নীরবতা,

যেটা জনমনের এ দলের একনিষ্ঠ দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করেছে।' (এম মোহাইমেন: 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ', পৃঃ ৪৪)

'তাই গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য গত কয়েক বৎসর যাবত বাংলাদেশ বলে আসছে নেপালের সঙ্গে মিলে নেপালের পার্বত্য এলাকায় বাঁধ দিলে প্রচুর পানি সংরক্ষণ করা যাবে যা দিয়ে খরা মওসুমে ভারতের ও বাংলাদেশের উভয়ের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। এটি একটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত পরিকল্পনা এবং ভারত ও নেপাল রাজি হলে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে দিতে ওয়ার্লড ব্যাংক সম্মতি জানিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত নেপালের সহযোগিতায় ফারাক্কার পানি সমস্যার মত গুরুতর একটি সমস্যার সমাধানে রাজি হচ্ছে না। ভারতের এ মনোভাবকে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে করে। বাংলাদেশকে দুর্বল প্রতিবেশী পেয়ে ভারত ইচ্ছামত যাচ্ছে তাই ব্যবহার করছে মনে করে বাংলাদেশের লোক অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ। মানুষ সাধারণভাবেই আশা করেছিল সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে একটা বক্তব্য রাখবে এবং বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য ভারতকে অনুরোধ জানাবে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আওয়ামী লীগ আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে মুখ খুলেনি।;' (এম এ মোহাইমেন : 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওযামী লীগ', (পৃঃ ৪৫)

বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের চিত্র

'আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম সমিতি ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে ২৯৩৪টি লাশ কুড়িয়েছে- সবগুলিই বেওয়ারিশ। এগুলোর মধ্যে দেড় হাজারেরও বেশী রাস্তা থেকে কুড়ান।' ডিসেম্বরের মৃতের সংখ্যা জুলাইয়ের সংখ্যার ৭ গুণ এবং অক্টোবরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় কুড়ান সংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ।

'গ্রাম-বাংলার ছিন্নমূল হতাশ মানুষেরা আজ ঢাকার পেশাদার ভিখারীদের স্থান নিয়েছে। পিতা শিশুদের নিয়ে রাস্তার চত্তরে নির্জীবের মত বসে আছে আর

ফুঁফিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।' (পিটার গিল, ডেইলী টেলিগ্রাফ, লন্ডন, ৬ জানুয়ারী, ১৯৭৫)

স্পষ্টতঃই বাংলাদেশের পরাজয়ের সংগ্রাম চলেছে। দিনে দিনে বাংলাদেশ আরো গরীব হচ্ছে। কল্পনা করা শক্ত কিন্ত বাস্তব এটাই যে, আজকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাধীনতার সময়ের অবস্থা থেকে অনেক শোচনীয়। খাদ্য খাটতি আগের চেয়ে অনেক বেশী। শতকরা ৮০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাট-এর উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ কমে গেছে। শিল্প উৎপাদন এখনো ১৯৬৯-৭০-এর মাত্রায় পৌঁছায়নি- যদিও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক মিলিয়ন।

'সুবিস্তৃত ইউএন 'এইড অপারেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ টনী হেগেন হিসেব করে দেখেছেন যে, রিলিফ সামগ্রীর ৭ ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রকৃত দুঃস্থ লোকদের হাতে পৌঁছেছে।' (কেভিন বিফাটি, ফিনান্সিয়াল টাইম, লন্ডন, লন্ড, ৬ জানুয়ারী, ১৯৭৫)

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান তার দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন।

'অনেকটা নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দল দাবী করেছিল, এই ধরনের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে তিন দিন সময় দেওয়া উচিত। জবাবে সরকার এক প্রস্তাব পাশ করলেন যে, এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক চলবে না।' (পিটার গিল, ডেইলী টেলিগ্রাম, লন্ডন, ১৯৭৫)

'কিন্তু বাংলাদেশের শাসক ও নব্যশাসকরা অধিকতর অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ এবং লোভী- এরা রাতারাতি বড় হতে চায়। ধুরন্ধর ব্যক্তিরা উচ্চাশার টোপ ফেলেছিল যে, ''স্বাধীন'' বাংলাদেশ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং সরল মানুষেরা তা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ভারতীয় হস্তক্ষেপের ফলে যারা বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসীন হ'ল তাদের মত স্বার্থপর নেতৃত্ব কোন দেশ সত্যিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর আর দেখা যায়নি। দেশটি যে অর্থনৈতিক ধ্বংসের

দিকে এগিয়ে যাবে, তা অবশ্যম্ভাবী ছিল।' (ফ্রন্টিয়ার কোলকাতা, ১ ফেব্র"য়ারী, ১৯৭৫)

'আওয়ামী লীগের উপর তলায় যারা আছেন, তারা আরো জঘন্য যাদের মুক্ত করেছেন, সেই জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে তারা আজ ফুলে ফেঁপে উঠছেন।' (জনাথন ডিম্বলবী, নিউ স্টেটম্যান, লন্ডন, ২৭ সেপ্টম্বর, ১৯৭৪)

'বেসরকারী হিসেবে বাংলাদশের দুর্ভিক্ষে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারাইয়াছে। লন্ডনের একটি পত্রিকার সংবাদদাতা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা রংপুর গিয়াছিলেন। তিনি জানান যে, শুধু এ এলাকায়ই ২৫ হাজার লোক মারা গিয়াছে।' - বিবিসি (ইত্তেফাক, ২ নভেম্বর, ১৯৭৪)

'রিপোর্টে বলা হয়, প্রতি বছর ১০ লাখ থেকে ২০ লাখ টন চাল বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার হয়। এর সবটুকু সরকারের হাতে এলে সরকারের বণ্টন ব্যবস্থার ঘাটতি পূরণের জন্য যথেষ্ঠ হবে। খাদ্য উৎপাদন ও আমদানী বাবদ প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের কেবল উদ্বৃত্ত অংশ প্রায় ৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য পাচার হয়েছে।' (গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৪)

'এ দুর্ভিক্ষে আর একটি ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান এই যে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ডঐঙ) - এর হিসেব মতে ৫০ লাখ মহিলা আজ নগ্নদেহ। পরিধেয় বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে।' ডঃ আব্দুল ওয়াহিদ জানালেন, 'স্বাভাবিক সময়ে আমরা হয়তো কয়েক ডজন ভিখারীর মৃতদেহ কুড়িয়ে থাকি, কিন্তু এখন মাসে অন্ততঃ ৬০০ লাশ কুড়াচ্ছি- সবই অনাহারজনিত মৃত্যু।'

'যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু কঙ্কাল আর কঙ্কাল- বোধ করি হাজার হাজার। প্রথমে লক্ষ্য করিনি। পরে বুঝতে পারলাম অধিকাংশ কঙ্কালই শিশুদের।' (জন পিলজার, ডেইলী মেইল, লন্ডন, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪)

'জরুরী অবস্থা বলবৎ করতে গিয়ে শেখ মুজিব সেই পুরানো জুজুর ভয়ই দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে 'প্রো-পাকিস্তানীরা' এখন সক্রিয়, কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষক একমত যে, যেহেতু আওয়ামী সরকার যে সরকার ১৯৭১ সালে

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্ম থেকে শাসন করে আসছে- ব্যর্থ হয়েছে- সেজন্যই জরুরী অবস্থা চালু করা হয়েছে। সরকার যে ওয়াদা পালনে ব্যর্থ হয়েছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখা যায় গ্রামবাংলায়- যেখানে দুর্ভিক্ষ ও পুষ্টিহীনতায় হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে, আর যারা বেঁচে আছে তারা সরকারের গুন্ডাবাহিনীর ভয়ে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত।' ডেভিট হার্ট, ফারইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, হংকং, ১০ জানুয়ারী, ১৯৭৫।)

গণ জিজ্ঞাসা

শেখ মুজিব তার মনিব রুশ- ভারত অক্ষ শক্তির মদদে পুষ্ট হয়ে এই জাতির স্কন্ধে যে নির্মম স্বৈরতন্ত্রের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তার অবসান ঘটানো ছিল অসম্ভব এবং অকল্পনীয়। বাংলার অমিত তেজী, চির জাগ্রত ও মুক্তিপাগল মানুষ যখন একদিকে রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছিল এবং অন্যদিকে এই শাসরুদ্ধকর অবস্থার হাত থেকে মুক্তির আকুতি নিয়ে আল্লাহর দরবারে আহাজারি করছিল, ঠিক তখনি ইতিহাসে মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়। সূচিত হয় ইতিহাসের নবতর অধ্যায়। কিন্তু তারপর, তারপরও গণ মানুষের অন্তরে বয়ে গেল অনন্ত জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার জবাব হয়তো কেউ পেয়েছেন অথবা পাননি। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলের জিজ্ঞাসা, একটি গণ জিজ্ঞাসা এ জিজ্ঞাসার জবাব দেবে কে?

"স্বাধীনতার ১৭ বছর পরেও আমার মত একজন সাধারণ লড়াকু মুক্তিযোদ্ধার মনে এ প্রশ্নগুলো নিভৃতে উঁকি-ঝুঁকি মারে এ কারণেই যে, ২৫ মার্চ সেই ভয়াল রাতের হিংস্র ছোবলের সাথে সাথেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী এবং পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবর্গ কি করে পাকিস্তানের শত্র" হিসেবে পরিচিত ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটে যেতে পারল? কোন সাহসে, কিংবা কোন আস্তার উপর ভর করেই বা তারা দলে দলে ভারতের মাটিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল? তাহলে কি গোটা ব্যাপারটিই ছিল পূর্ব পরিকল্পীত? তাহলে কি স্বাধীনতা বিরোধী বলে পরিচিত ইসলামপন্থী দলগুলোর শঙ্কা এবং অনুমান সত্য ছিল? তাদের শঙ্কা এবং অনুমান যদি সত্যই হয়ে থাকে তাহলে দেশেপ্রেমিক কারা? আমরা মুক্তিযোদ্ধারা না

রাজাকার- আলবদর হিসেবে পরিচিত তারা? এ প্রশ্নের মীমাংসা আমার হাতে নয়, সত্যের উৎঘাটনই কেবল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ধারণ করবে। (মেজর (অবঃ) এম এ জলিল: অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃঃ ৭- ৮)

পূর্ব পাকিস্তানের বিয়োগান্তক পরিণতি

পশ্চিমাদের অনেকের নিকটই বার শ' মাইল ভারতীয় ভূ-খণ্ড দ্বারা বিভক্ত একটি বিশাল ও ঘনবসতিসম্পন্ন দেশের দুটি প্রদেশের অস্তিত্বের দিকটি বড়ই কঠিন বলে বিবেচিত হয়েছে। অতঃপর ১৯৭০ সাল থেকে একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীপ্রয়াস লক্ষ্য করছেন যা' লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের ভারতে গমনে বাধ্য করেছে।

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস যা' ১৯৭১ সালে ভয়াবহ সংঘর্ষ ও রক্তপাতের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে সেটা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক দেশটি কায়েমের পর ১৯৪৭ সালে যখন পশ্চিম পাকিস্তানের নতুন দেশটির রাজধানী স্থাপিত হয় তখন থেকেই বিরাজ করছে।

এসব ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অনেক নায়কের সঙ্গেই প্রফেসর রুশব্রক উইলিয়ামস ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। পশ্চিমাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অনন্য। উপরন্ত পাক-ভারত উপমহাদেশ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন গভীর অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তিনি তাঁর THE EAST PAKISTAN CRISIS পুস্তকে পাকিস্তানের জাতীয় সংকটের উদ্ভব, বিস্তার ও অন্যান্য বিষয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ। প্রমাণ্যতাসম্বলিত ও অত্যাবশ্যকীয় ঘটনাবলী তুলে ধরেছেন। প্রফেসর উইলিয়ামের বিশ্বাস মতে, তিনি স্বয়ং পূর্ব পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কের এমন অনেক দিকের আলোকপাত করেছেন সেগুলো সেইসব লোক ব্যাপকতর আবেগপ্রসূত আবেদনের ফলে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যাঁরা নিজেদের সর্বাধিক স্বার্থে বিপরীত কিছু চেয়েছে চেয়েছে স্বাধীন পূর্বপাকিস্তানকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে।

অনুচ্ছেদ: ১. ঢাকা ও এর পরিবেশ পরিস্থিতি সাময়িকভাবে ১লা মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকাতে একটি হরতাল আহ্বান করলেন। আওয়ামী লীগ কর্মীরা অস্ত্রের জন্য নায়ারয়নগঞ্জ রাইফেল ক্লাব ঘেরাও পূর্বক লুট করে এবং সংগ্রামী ছাত্ররা সেসব রাইফেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে সংরক্ষিত রাখে। এ দু'টি

কেন্দ্র থেকে সশস্ত্র দলগুলো আরও অস্ত্র ও যন্ত্রচালিত যান সংগ্রহ করে এবং বলপূর্বক আদায়কৃত অর্থ সংগৃহীত হয়। রাঁতের সময় ব্যাপক আকারে লুণ্ঠন কর্ম ও সম্পত্তি ধ্বংসের যজ্ঞ চলে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেনা ব্যারাকেই নিয়োজিত ছিল।

সারা দেশব্যাপী শেখ মুজিবুর রহমান এক সপ্তাহের জন্য হরতাল ডাকেন।

২রা মার্চ দুটি অস্ত্রের দোকান ঘেরাও করে লুণ্ঠিত হওয়ার পর লুণ্ঠিত অস্ত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেয়া হয়। সারা দিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরে প্রশিক্ষণমূলক অস্ত্রচালনার আওয়াজ শ্র“ত হয়।

সংঘবদ্ধ জনতা অস্ত্র ও লৌহর শিকসহ জিন্নাহ এ্যাভেনিউ ও বায়তুল মোকাররমের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ আক্রমন করে। (ফার্ম) গেটস্থ দুটি ব্যক্তি মালিকাধীন গৃহের মত হোটেল শালিমার ও গুলিস্তান সিনেমা হলও আক্রান্ত হয় এবং জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রদের বিভিন্ন অংশ পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দেয়। পুলিশ কর্মকর্তারা জানান। তাঁরা তাঁদের লোকদের গণ-উত্থান প্রতিহত করণের প্রশ্নে বিশ্বাস করতে পারছিল না বলে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সামরিক বাহিনীর সহায়তা কামনা করছিল। সান্ধ্য আইন জারী হলো এবং সেনাবাহিনীকে ময়দানে নামান হ'ল। সদর ঘাটে একটি সামরিক ট্রাক আক্রান্ত হলে গুলিতে ছয়জন দাংগকারী নিহত হলো। অপর এক সংঘবদ্ধ জনতা টেলিভিশন কেন্দ্র আক্রমণ করল এবং অনুরূপভাবে সামরিক বাহিনীর গোলাগুলিতে অপর একজন মুত্যুবরণ করল। ব্যাপকভাবে সান্ধ্যআইন ভঙ্গ হতে লাগল। সারারাত চলল আগ্নিসংযোগ ও লুট-পাট।

৩রা মার্চ: সংঘবদ্ধ জনতার আইন ভঙ্গ ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ইসলামপুর, পাটুয়াটুলি ও নওয়াবপুরসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন উপশহরে ছড়িয়ে পড়লো দোকান-পাট, বাণিজ্যিক কার্যালয়সমূহ এবং বিভিন্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন বাড়ীঘর লুণ্ঠিত ও অগ্নিসংযোজিত হওয়ার সঙ্গে ৫ জন হলেন নিহত ৬২ জন হলেন আহত। শেখ মুজিবুর রমহান "বাংলাদেশের গণমানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি বেসামরিক বা গণ অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন। স্কুল-

কলেজসমূহ সব বন্ধ হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ কর্মচারী ও ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করল এবং থাকল কেবল বেশ কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগের যুদ্ধ বাজকর্মী (বস্তুতঃ এরা অধিকাংশই ছিল বামপন্থী এবং কেউ কেউ ছিল আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসবাদী কর্মী)। নবতর বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গিত প্রচারের জন্য বাধ্য করা হল।

৪ঠা মার্চ: নওয়াবপুর ও ধানমন্ডিতে লুণ্ঠন চলল। অপর একটি অস্ত্রের দোকানও লুণ্ঠিত হ'ল। (চট্টগ্রাম ও খুলনায় নতুন করে মারাত্মক সব হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড শুরু হলো- নিচে দেখুন)

৫ই মার্চ: টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্মীরা যারা বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানের মধ্যে এবং পশ্চিম পাকিস্তানসহ বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ পরিচালনার কাজ করেন তাঁরা আওয়ামী লীগের নির্দেশে কর্ম বিরতি পালন করে চলল্। যুদ্ধ বাজ ছাত্ররা ব্রিটিশ কাউন্সিল আক্রমণ করলে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা যথাসময়ে সেখানে পৌঁছে আক্রমণকারীদের তাঁড়িয়ে দিল।

৬ই মার্চ: কেন্দ্রীয় কারাগার ভেংগে কয়েদীরা জেল থেকে পালিয়ে গেল। কারারক্ষীদের গুলিতে সাতজন মারা গেল। সার্জেন্ট ও ছয়জন কারারক্ষী আহত হলেন। পলাতক কয়েদীরা ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা একত্রে শোভাযাত্রা করে ঢাকাময় রাষ্ট্র বিরোধী শ্লোগান দিতে দেখা গেল। সরকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার আক্রমণ করে সকল বিস্ফোরক দ্রব্য ও মারাত্মক ধরনের এসিডসমূহ লুণ্ঠন করল। অনুরূপভাবে একই উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ জনতা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের উপর চড়াও হলো। কিন্তু সামরিক বাহিনীর সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে তারা কেটে পড়ে।

৭ই মার্চ: একটি সমান্তরাল সরকার পরিচালনার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন এবং ট্যাক্স পরিশোধ না করার জন্য নির্দেশ দেন, নির্দেশ দেন সকল সরকারী অফিস ও আদালত বন্ধ রাখার জন্য এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে; সকল সংবাদপত্র, টি. ভি, রেডিও স্টেশনকে আওয়ামী লীগের নির্দেশে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করতে বলা

হয়, পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাখা সমূহে অর্থস্থানান্তর বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয় এবং আওয়ামী লীগের স্থানীয় কার্যালয়ের নেতৃত্বাধীনে ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, সাব-ডিভিশন ও জেলা বিপ্লবী কাউন্সিল সংগঠিত করণের আদেশজারী করা হল। রেডিও পাকিস্তান ভবনের উপর বিস্ফোরক নিক্ষেপ করা হল। ছাত্রদের বিভিন্ন দল সাধারণ মটর যান, জিপ, পিক-আপ, ট্রাক ও মাইক্রোবাস ইত্যাদি বলপূর্বক বাজেয়াপ্ত করতে দেখা গেল।

৮ই মার্চ: সরকারী অফিস হতে আওয়ামী লীগাররা লাইসেন্স ধারীদের নাম সংগৃহীত হওয়ার পর তাঁদের নিকট হতে সকল অস্ত্রশস্ত্র বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগের যুদ্ধবাজ কর্মীদের সমন্বয়ে নানা সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেল। বাংলাদেশের বাহিরে অর্থ স্থানান্তরের বিষয়াদিসহ পূর্বদিনের ঘোষিত নির্দেশনাসমূহের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুদ্দিন আহমেদ কর্তৃক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিষয় জনসম্মুখে অবগত করেন।

মার্চ-৯: ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগাররা চেক-পয়েন্ট সৃষ্টি করল, পথিকদের দেহ/তল্লাসী করতে লাগল এবং অর্থ কেড়ে নেয়া হচ্ছিল। এই প্রক্রিয়া পরবর্তী কিছুদিন চলল এবং মুসলিম লীগ পাকিস্তান সমর্থক বলে সন্দেহ হয় এমন ব্যক্তিদের প্রতি লাঞ্ছনা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের স্তর পর্যন্ত পৌঁছলো। পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্রদের বিপ্লবী কাউন্সিল স্বীকার করেছেন যে, অনেক অ-অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যক্তিগত বাসা-ভাড়ী ঘেরাও করে অর্থ আদায় করছিল। একটা অনিশ্চিত বিচ্ছৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস ঢাকা শহরময় ছিল বিরাজমান। যেসব জনতা ঢাকা শহর ত্যাগ করার চেষ্টা করছিল তাঁদেরকে বাঁধা দেওয়া হলো এবং তাঁরা হলো নিপীড়নের শিকার। কাকরাইলের নিকটে এক সরকারী অফিসে এ্যাসিড নিক্ষেপ করা হয়। রেলওয়ে ট্রেন থেকে যাত্রীদেরকে রেল ষ্টেশনে নামিয়ে তাঁদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানের সমর্থক অভিযুক্ত করা হয়েছে।

১৪ই মার্চ: শেখ মুজিবুর রহমান নতুন যে সব নির্দেশজারী করেন। এসবের একটি ছিল ডিপুটি কমিশনার ও মহকুমা হাকীমকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ

বিপ্লবী কাউন্সিলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। দেয় বিভিন্ন কাষ্টম ডিউটি কেন্দ্রীয় সরকাররের পক্ষে জমা না করে দুটি প্রাইভেট ব্যাংকের নামে জমা করতে বলা হল।

১৫ই মার্চ: ঢাকাস্থ আওয়ামী লীগ এ্যাকশন কমিটি বরারবর ট্যাক্স জমা দেয়ার জন্য বলা হল। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র- শহরে ও শহরে এ্যাকশন কমিটি গঠিত হয়েছিল এজন্য যে, যাতে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সামরিক বাহিনীর প্রয়াসে বাঁধা দেয়া যায়।

১৭ই মার্চ: সন্ত্রাস, এ্যাসিড নিক্ষেপ ও লুণ্ঠন অব্যাহত চলল। ব্যাপক সন্ত্রাস ও হুমকী- ধমকীর ভয়ে অনেক বেসামরিক নাগরিক নিজ নিজ বাড়ী- ঘর ত্যাগ করতে লাগল। ঢাকার আজিমপুর সরকারী অফিসের ভেতরে দুটি এ্যাসিডের বোতল নিক্ষিপ্ত হল। মতিঝিলের সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট হাইস্কুলে দলবদ্ধভাবে প্রবেশ করে তথাকার এ্যাসিড ও রাসায়ন পদার্থসমূহ নিয়ে নেয়া হয়।

মার্চ: ১৯ একটি সামরিক যান যা, ময়মনসিংহ হতে নিয়মিত সফর কালে একটি রেলক্রসিং এর নিকট গোপনে রাখা হয়েছিল সেটিকে তাঁর ছয়জন যাত্রী ও অস্ত্রসহ গুম করে।

মার্চ- ২৩: পাকিস্তান দিবসে পালিত হয়েছে প্রতিরোধ দিবস যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধা- সামরিক বাহিনী ও প্রাক্তন কর্মচারীরা প্যারেডে ও মার্চফাষ্ট- এ অংশগ্রহণ করেছে। ইমারতসমূহ হতে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন করা হয়। তখন আওয়ামী লীগারদের যারা বিরোধী তাঁদের সঙ্গে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। একটি সশস্ত্র কুচকাওয়াজ শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ীর বাহিরে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিনি অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং "বাংলাদেশের পতাকা" আনুষ্ঠানিক ভাবে উত্তোলন করেন। বিভিন্ন ছাত্র গ্র"প ব্যবসায়ীদের অপহরণ করার পর পনের অর্থ আদায়ের পরে ছেড়ে দিতে দেখা গেছে। বহির্গমনকারী যাত্রীদের প্রতি ঢাকা বিমান বন্ধরে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখাগেছে।

২৪শে মার্চ: সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরকে প্রতিহত করার জন্য জনতাকে অস্ত্র ধরতে এবং সশস্ত্র সংগ্রামে ঘরে ঘরে প্রতিরোধের প্রয়োজনে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দেয়ার প্রয়োজনে সারা ঢাকায় লেখিত ও সাইক্লোস্টাইল পোস্টার ও লিফলেট প্রচারিত হয়।

২৫ শে মার্চ: ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল ও জগন্নাথ হলে ব্যাপক সংখ্যায় এ্যাসিডবম্ব প্রস্তুত হতে লাগল। শহরের অনেক অংশেই ব্যরিকেড রচনা ও সড়ক বন্ধ করে দেয়া হ'ল। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অন্যান্য কর্মকর্তা সহ প্রধান সেনাপতি ও নিয়োগ করলেন।

২৫- ২৬শে মার্চ: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিলেন।

অনুচ্ছেদ: ২ ঢাকার বাহিরে: যশোর

৩রা মার্চ: মোটা লাঠিশোটা ও বল্লমসহ সজ্জিত সংঘবদ্ধ জনতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করে। কিন্তু গার্ডদের গুলিতে দুইজন মৃত্যুবরণ করে এবং নয়জন আহত হয়।

৪ঠা মার্চ: ডিপুটি কমিশনার অফিস ঘেরাও করা হয়। পাকিস্তানী পতাকা ছিন্ন ভিন্ন করা হয় নিক্ষেপ করা হয় হ্যান্ড গ্রেনেড খুলনা হতে আগত একটি ট্রেনকে রেলচ্যুত করা হয় এবং যাত্রীদেরকে বের করে হত্যা করা হয়।

১৬ই মার্চ: চলছিল সন্ত্রাসের রাজত্ব। অনেক বোমা ও গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হয়। রাজন্দ্র কলেজ ও. টিসি- এর অস্ত্র ভান্ডার আক্রমণ করে দশটি রাইফেল ও ১৫টি ব্যায়নেট বলপূর্বক কেড়ে নেয়া হয়। বরগুনাতে পাকিস্তানী পতাকা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগররা পরিস্থিতি তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাংলাদেশের পতাকা' সকল সরকারী ইমারতে উড্ডীন করে।

১৭- ১৯ই মার্চ: বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ধ্বংস করা হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়, যশোর- খুলনা রোডের কতক স্থানে সৃষ্টি করা হয় প্রতিবন্ধকতা।

ভারত থেকে বিরাট সংখ্যক অস্ত্রের চালান সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে। সামরিক বাহিনীর আগমন প্রতিহত করার জন্য সক্রিয় প্রস্তুতি নেয়া হয়।

খুলনা

৪ঠা মার্চ: একটি সশস্ত্র সংঘবন্ধ জনতা দ্বারা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রান্ত হয় এবং অবাঙ্গালী কর্মচারীদেরকে বর্বরতার সঙ্গে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

৫ই মার্চ: বল্লম, গ্রেনেড ও লাঠি-শোঠা সজ্জিত সংঘবদ্ধ জনতা ৫৭জন অবাঙ্গালীকে হত্যা করে যাদের কর্তিত দেহাবশেষ দৃষ্ট হয়। অনেক দোকান লুণ্ঠিত হয় হোটেল হয় অগ্নিদগদ্ধ। সংবদ্ধ জনতা অস্ত্রের দোকান লুট করতে গেলে গুলি চালিয়ে অবাঙ্গালী মালিক সেটা ব্যর্থ করে দেয়। মৃত্যুমুখে পতিত হয় ১জন আহত হয় ৫জন দাংগাকারী।

১৭ই মার্চ: ৫ই মার্চের হত্যাকাণ্ড থেকে যেসব অবাঙ্গালীরা অব্যাহতি পেয়েছিল এবং পালাতে পারে নাই তাদেরকে পুনরায় আক্রমণ করা হল।

১৮ই মার্চ: স্থানীয় আর্মি ক্যাম্পে দুটি গ্রেনেড ছুড়া হয়।

চট্টগ্রাম

১লা মার্চ-অন্যান্য সময়: পূর্ব পাকিস্তানের এই একমাত্র গভীর সমুদ্রগামী সমুদ্র বন্দরটি যা ছিল ইস্টব্যাঙ্গল রেজিমেন্টের কেন্দ্র সেটাই সশস্ত্র প্রতিরোধের বড় কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।

৩-৪ই মার্চ: সশস্ত্র সংবদ্ধ জনতা ওয়ারল্যাস কলোনী ও ফেরোজশাহ কলোনী আক্রমণ করে। ৭০০ বাস গৃহ আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে যারা ছিল সবাই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে ও সকল হতভাগ্য শিক্ষকরা ছাড়া বাহিরে আরও ৩০০ জন অবাঙ্গালী হয় মৃত্যুবরণ করেছে না আহত হয়েছে।

৫ই মার্চ: অবাঙ্গালীদের ছুড়ি মারা ও তাঁদের গৃহাদি পুড়িয়ে দেয়া অব্যাহত রইল। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এপ্রিলের দিকে যখন আইন-শৃঙ্খলা

পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল ঠিক তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মহানগরীটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল আওয়ামী লীগারদের হাতে। তখন অবাঙ্গালী নিধন চলেছে নিয়মিত। স্থানীয় গ্যারিসনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের যোগান দেয়ার জন্য এম. ভি. সোয়াত ২০শে মার্চ পূর্বের মত নিয়মিত ভাবে আগমন করল সে আগমনটাই- মালামাল খালাসে প্রতিহত করণের জন্য সংবদ্ধ আক্রমণের একটা অযুহাত হল। কতক মারাত্মক সংঘর্ষ ও ঘটলো।

২৫শে মার্চ: এপ্রিলে : গনহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লূণ্ঠন অব্যাহত রইল। ২৫-২৮শে মার্চের রাতে প্রদর্শিত 'ডি-ডে' হতেই বন্দর বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা হচ্ছিল/ মহিলা, পুরুষ ও শিশুসহ ১০০০ এরও বেশী অবাঙ্গালী শহীদ হয়েছেন বলে হিসাব থেকে পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা মাথায় অবাঙ্গালী বন্দর শ্রমিকদের হত্যা করা হয়েছিল। ইস্পাহানী জুট মিল্স বিনোদন ক্লাবে ১৫২জন মহিলা ও শিশুকে মস্তকচ্যুত করা হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা দেখেছে তাদের রক্তাক্ত বস্ত্র এবং 'রক্ত দ্বারা তাদের বাচ্চাদের খেলনাসমূহ ও মৃতদেহ একাকার হয়ে যেতে।

রংপুর, দিনাজপুর, কুমিল্লা, সৈয়দপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া ও রাজশাহী

উপরোক্ত সকল স্থানে মার্চের সারাটা সময়ে অবাঙ্গালীদের প্রতি বোমাবাজি, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছিল ব্যাপকভাবে। সৈয়দপুর সেনানিবাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। বগুরা জেলার সান্তাহারে ১৫০০০-এরও অধিক অবাঙ্গালীকে একত্রিত করে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাদের মহিলাদেরকে উলঙ্গ করে রাজপথ সমূহে হাটতে বাধ্য করা হয়েছে। ময়মনসিংহের শানকীপাড়ায় অবাঙ্গালী পরিবারের ২০০০ পুরুষকে গৃহ থেকে নিয়ে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাঁদের জন্য কবর খননে তাঁদের মহিলাদের বাধ্য করা হয়েছে। একজন সাহসী আলেম ১৫০০-এর অধিক বিধবা ও

এয়াতীম অবাঙ্গালীকে এক মসজিদে আশ্রয় দিয়ে ছিলেন এবং তিনি সংঘবদ্ধ উত্তেজিত জনতাকে তিরস্কার করেছেন যাদের মধ্যে খুন চড়েছিল। রাজশাহীতে মহানগরীর ম্যাজিস্ট্রেট অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং টাউন হলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ভাইস চ্যান্সলর সাহেব ও অন্যান্য বাঙ্গালী শিক্ষকরা এই লেখিত মুচলেকা দিয়ে রক্ষা করেছিলেন যে তাদের সহকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরের বাহিরে যাবে না। এসব সাহসী পদক্ষেপ প্রশংসনীয়, অবাঙ্গালীদের জীবনের উপর হুমকী আসা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মচারী নিহত হন নাই।

পরিশিষ্ট-৭:

আওয়ামী লীগ চেয়েছিল কতক গুরুত্বপূর্ণ দফা ঘোষণা করতে এই দলিলের পূর্ণ বক্তব্য ৫ই আগস্টের শ্বেতপত্রের ৪৭-৬৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

এর লক্ষ্য ছিল সরকার কর্তৃক সংখ্যাগুরু দলের উপদেশ অনুযায়ী গভর্নর নিযুক্ত হলে এবং গভর্নর তাঁর অফিসের দায়িত্বভার গ্রহণ করলে সে তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে এবং পাকিস্তানের বাকী অংশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হবে। সাময়িকভাবে ঘোষণা মতে সংশোধিত পূর্বতন শাসনতন্ত্র দ্বারা পাকিস্তান শাসিত হবে। বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধিরা ঢাকাতে একটি শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনে বসবেন এবং বাংলাদেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। অনুরূপ ভাবে পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্র হতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ইসলামাবাদে পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্রসমূহের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনায় বসবেন। ব্যতিক্রম ছিল করের বিষয়টি যেটা বড়ই সতর্কতার সঙ্গে এমনভাবে করা হত যাতে কেন্দ্রীয় সরকার খুব সামান্য সুযোগ পায় এবং 'বাংলাদেশ' পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে যাতে বাংলাদেশ শুধু চ্যাক্স-আরোপ, বৈদেশিক মুদ্রা, ব্যাংকসমূহ নিয়ন্ত্রের ক্ষমতাই লাভ না করে বরং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি ততটুকু ট্যাক্সই দিতে বাধ্য হয় যতটুকু দিতে স্বীকার করা হবে। যখন বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্রসমূহের শাসনতন্ত্রসমূহের খসড়া রচিত ও গৃহীত হবে তখন 'বাংলাদেশ' ও পশ্চিম পাকিস্তানে রাষ্ট্রসমূহ হতে জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা 'পাকিস্তান কনফেডারেশনের' জন্য শাসনতন্ত্র রচনায় অভিপ্রায়ে একত্রিত হবে।

বাস্তবে যদি এসব পদক্ষেপ প্রয়োগ করা হত, তবে কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অবদান পাকিস্তান এর অস্তিত্ব হারা'ত।

এই ঘোষণাপত্র রচনা করে এবং সেটা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জারী করার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃবর্গ:

১। আইনগত অবকাঠামো আদেশের বিধানাবলী হতে সরতে চাচ্ছিল যেটার উপরে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের বৈধতা নির্ভরশীল ছিল।

২। সরে যাচ্ছিল ছয়দফা হতে যেটাকে তারা নিজেরাই তাঁদের নতুন শাসনতন্ত্রের ভীত্তি হবে বলে নির্ধারণ করেছিলেন।

৩। নির্বাচকমন্ডলী তাদের প্রতি আস্থাকে প্রতারিত করছিল, কারণ, তাঁরা ছয় দফার ভিত্তিতেই আওয়ামী লীগারদের নির্বাচিত করেছিলেন এবং সর্বাধিক শ্বায়ত্বশাসনের বিষয়টিও ছিল পাকিস্তানের সংহতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।

পরিশিষ্ট- ৮:

আওয়ামী লীগারদের দ্বারা ঘটান ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চের উত্তর কালের বড়ধরনের বর্বরতাসমূহ (শ্বেতপত্র, পৃষ্ঠা, ৬৪- ৬৯)

জেলা	তারিখ	ঘটনা
চট্টগ্রাম	২৮- ৩০ মার্চ (১৯৭১) এলাকা: চট্টগ্রাম শহর	ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট (ই. বি. আর) ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ই. পি. আ) ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের মত বিদ্রোহীদের দ্বারা শহর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। তারা যত্রতত্র লুট, ধ্বংস ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে শহরের সর্বত্র এবং শহরতলীগুলো তান্ডব লীলা চালিয়েছে। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সম্মুখে একটিসহ অনেক বধ্যভূমি বানান হয়েছিল যেখানে নর, নারী ও বাচ্চাদের পরিকল্পিত উপায়ে হত্যা করা হচ্ছিল। অনেক ক্ষেত্রে দেহ দ্বিখন্ডিত করার পূর্বে দেহ থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বের করে নেয়া হত (১০, ০০০- ১২, ০০০) নিহত হয়।
	২৭শে মার্চ উসমানীয়া গ্লাস ওয়ার্কস	পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক কর্মচারী নির্যাতিত ও নিহত হয় (১৭ জন)।
	১৯ই এপ্রিল ইস্পহানী জুট মিলস ও আশেপাশে	মহিলা ও শিশুদের বর্বরোচিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মকর্তা ও শ্রমিক গুম ও অপহৃত হয়েছে। (হতাহত প্রায় ১০০০ জন)
	২৭/ ২৮ এপ্রিল হাফিজ জুট মিল্স	মিল চত্তর আক্রান্ত হয় এবং বেশ কিছুসংখ্যক কর্মচারী নিহত হয়। মালিকের বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সকল পারিবারিক সদস্য ইন্দনে পরিণত হয় বেচে ছিল একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু। ধারণা করা হয় এখানে নিহত হয়েছে ১৫০ জন।

	তারিখ ২৬-৩০ এপ্রিল (১৯৭১) এলাকা কর্ণফুলি পেপার ও রেওন মিল্স চন্দ্রঘোনা ও আশেপাশে	এসব অঞ্চলে ব্যাপক আকারে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও হত্যা চালান হয়। মহিলাদের বিভিন্ন বাড়ীতে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, পরবর্তীতে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। ধর্ষণ ও বর্বরতার অবর্ননীয় কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে নিহত হয় ২০০০ জন।
	২৭-৩০ এপ্রিল রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামটিস্থ সকল পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে একত্রিত করে অত্যাচার করার পর হত্যা করা হয়। দু'একজন জীবনের রক্ষা পায়। এখানে নিহতের সংখ্যা ৫০০।
জেলা যশোর	২৯-৩০ মার্চ ঝুমঝুমপুর কলোনী	বিদ্রোহী ই. পি. আর. বাহিনীর সদস্যরা সকল বিহারী জনতাকে সাধারণভাবে হত্যা করে। মহিলা ও শিশুদের নরাইলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় ৪০০-৫০০ মহিলাকে অপহরণ করে নদী পথে ভারতেও পাচার করা হয়েছিল। মনুষ্য মাথার থুলি ও অন্যান্য অংশ সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এখানে ৩০০০ অবাঙালীকে হত্যা করা হয় এবং গুম করা হয় ২০০০ জনকে।
	২৯-৩০ মার্চ রাম নগর কলোনী	ঝুমপুর কলোনীর মানুষ এই কলোনীতে আশ্রয় নিয়েছিল। এটাতেও অগ্নিসংযোজিত করা হয়। (১৫০ এরও অধিক সংখ্যক অবাঙালীকে হত্যা করা হয় এবং আশ্রয় নেয় ৪৪৮ জন দুস্ত শিবিরে)
	৩০ মার্চ তারাগঞ্জ কলোনী	আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক ও বিদ্রোহী ই. পি. আর এর সদস্যরা সম্পূর্ণ কলোনীটাকেই ধ্বংস করে। সামান্য কয়েকজনই বেচেছিল।

		সকল বাড়ী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। (প্রায় ৫০০ নিহত ৪০০ গুম)
	৩০ মার্চ-৫ এপ্রিল হামিদপুর আমবাগন, বাচাচর এবং পুরান কসবা, যশোর শহর	এলাকাটির প্রায় সকল জনসংখ্যা উচ্ছেদকৃত হয়। গৃহগুলো প্রথমতঃ লুণ্ঠিত অতঃপর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নিহত ও গুম হয় ১০০০, হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয় ১৭৫ এবং দুস্ত শিবিরসমূহে স্থানান্তরিত হয় ১৭২ জন।
	৩০ মার্চ- ৫ এপ্রিল মোবারকগঞ্জ	নর, নারী ও শিশুরা নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়। তাঁদের গৃহসমূহ হয় লুণ্ঠিত এবং অগ্নিসংযোজিত। এখানে নিহতের সংখ্যা ২০০ এবং স্থানান্তরিতের সংখ্যা অধিক হাসপাতালে-১০ এবং দুস্ত শিবিরসমূহে ২৭ জন।
	৩০ মার্চ-৫ এপ্রিল কালীগঞ্জ	এখানে বেশ কিছু এলাকা আক্রান্ত, মহিলারা ধর্ষিত শিশু ও পুরুষরা নিহত হয়। সংঘটিত হয় ব্যাপক লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ। এখানে নিহত ৩০০ এবং ত্রাণ শিবিরে-১৩২ স্থানান্তরিত হয়।
	৩০ মার্চ-১০ এপ্রিল কোটচানপুর	যত্রতত্র হত্যা ও অগ্নিসংযোগ। এখানে নিহত-২০০, আহত-৫, ত্রাণ শিবিরে-৫৫ স্থানান্তরিত হয়।
	৩০ মার্চ তসবিডাঙ্গা	বিপ্লবী কাউন্সিলের স্বেচ্ছাসেবকরা পূর্ব নির্ধারিত কিছু বাড়ী আক্রমণ করে পুরুষ ও বৃদ্ধ মহিলাদের হত্যা করে যুবতীদের হরণ করে। এখানে নিহতের সংখ্যা প্রায়-২০০, ত্রাণ শিবিরে-৭২ স্থানান্তরিত হয়।
	৩০ মার্চ-১০ এপ্রিল নড়াইল	পাঠানরা ছিলেন বর্বরতার প্রধান লক্ষ্য। নরাইলের সর্বত্র হতে তাদেরকে একত্রিত করে বর্বরতার সঙ্গে হত্যা করা হয়। মহিলা নিহত ও শিশুসহ নিহত পাঠানদের সংখ্যা ৬০-৭০ জন।

	২৫ মার্চ- ৪ এপ্রিল জিনায়দহ মহকুমা	আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকরা অনেক বাড়ীঘর আক্রমণ করে লূণ্ঠন করে এবং অগ্নিসংযোগ ঘটায়। যান ও মালের বড় ধরণের ক্ষতি ঘটে। এখানে নিহত হয় ২৫০ এর অধিক, গুম- ৫০ ও হাসপাতালে ১০।
জেলা খুলনা	২৮- ২৯ মার্চ খুলনা শহর/ ক্রিসেন্ট জুট মিল্স, খালিশপুর, ষ্টার জুট মিল্স চাঁদ মহল	আধাসামরিক বাহিনীর সকল প্রশিক্ষণ খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। তথাকথিত পশ্চিম পাকিস্তানের দালালদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হত্যা ও অগ্নিসংযোগ ঘটান হয়। গৃহসমূহ ধ্বংস করা হয় এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালান হয়। প্রথমতঃ তাদের অত্যাচার করার পর মস্তকচ্যুত করা হত। নিষ্পাপ শিশুও মহিলাদের রাস্তায় টেনে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। যারা বেচে গেছেন বলে ভাসমান দেখা যাচ্ছিল তাদের অনেকের যকৃত দেহ থেকে বের হয়ে পড়েছিল মাছেরা সেগুলো খাচ্ছিল, সেগুলোকেই আবার গভীর নদীর জলের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যেগুলো হতে তখন লালখুন বের হয়ে পানি লালে লাল হয়ে চলছিল। মিলসমূহের সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়। কিছু অফিসার অর্থের বিনিময়ে আত্মরক্ষা করে। নিহতের সংখ্যা ৫০০০।
	২৮/ ২৯ মার্চ নিউ কলোনী খালিসপুর খুলনা	দশ হাজার প্রায় আওয়ামী লীগকর্মীদের দ্বারা কালোনীটি ঘেরাওকৃত হয়। তাদের সঙ্গে বিদ্রোহী পুলিশরাও অংশগ্রহণ করে। ছয় ঘণ্টারও অধিক সময় ধরে গোলাগুলি চলে। এখানে নিহত ৩০০।
	৩০ এপ্রিল সাতক্ষীরা মহাকুমা খুলনা	পশ্চিম পাকিস্তানী মহকুমা হাকীমকে গ্রেফতার করে বন্দি হিসাবে নেওয়া হয়। এলাকাটিতে ব্যাপক হত্যযজ্ঞ চলে, চলে বর্বরতা ও লূণ্ঠন। শহরটিতেও ব্যাপক লূণ্ঠন চলে। এখানে নিহতের সংখ্যা ১০০০।

	২৯ মার্চ- ১০ এপ্রিল কুষ্টিয়া শহর	বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রতি বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি চলে। দীর্ঘ ১৩ দিন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম ছিল। এখানে নিহতের সংখ্যা ১০০০- ১৫০০।
	২৬ মার্চ- ১লা এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া	বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে জড়ো করে এনে হত্যা করা হয়। মহিলারা হয়েছিল অমানসিক নির্যাতনের শিকার। পশ্চিম পাকিস্তানী মহকুমা হাকীম সাহেবকে নির্যাতন করা হয় এবং তাঁর স্ত্রীকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পেটান হয়। এখানে নিহতের সংখ্যা ৫০০ এবং ১০০ জনকে গুম করা হয়।
	২৩ এপ্রিল জাফর কান্দি, কুষ্টিয়া	স্থানীয় অপরাধীচক্র ও বিদ্রোহী ই. পি. আর- রা বিহারী কলোনী আক্রমন করে। ব্যাপক ভাবে লুণ্ঠননের পর কলোনীটিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কেউই বাঁচতে পারেন নাই। মহিলাদের ধর্ষণ করে শেষে হত্যা করা হয়। কার্তিত স্তন ও বের হওয়া উদরসহ তাঁদের মৃত দেহকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এখানে নিহতে সংখ্যা ৫০০।
	৩০ মার্চ- ১৩ এপ্রিল মেহেরপুর, কুষ্টিয়া	দীর্ঘ দুই সপ্তাহ ধরে মেহেরপুরে ঘটেছে জিঘাংসাপূর্ণ নর হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও বলাৎকার। এখানে নিহত হয় ৬০০, গুম হয় ২০০ এবং হাসপাতালে নীত হয় ১০।
জেলা বগুড়া	২৬ মার্চ- ২৩ এপ্রিল বগুড়া শহর	আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা জেল ভাংগে এবং কয়েদীদের পলায়নের সুযোগ করে দেয় যাতে তারা সন্ত্রাসী ও লূণ্ঠন কর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে। ৭০০০ নর, নারী ও শিশুকে জেল চত্তরে গুরু- ছাগলের মত পূর্ণ করা হয়। কথা ছিল ডিনামাইট দিয়ে তাঁদেরকে উড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেনাবাহিনী সময় মত উপস্থিত হওয়ায় তাঁরা মুক্তি পান। প্রত্যক্ষদর্শীরা ব্যাপক

		হত্যা, ধর্ষন ও অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছে বলে জানিয়েছেন। এখানে নিহত হয় ২০০০।
	তারিখ ২৬ মার্চ- ২২ এপ্রিল (১৯৭১) এলাকা নওগা/ সান্তাহার	আওয়ামী সাঙাতরা বিহারীদের যাতায়াতে বাঁধা দেওয়ার জন্য পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ব্যাংকগুলোকে করে লুট। গুলি করে মারার পূর্বে যুবর্তী নারীদের ধর্ষন করা হয়েছে এবং উলঙ্গ করে কুঁচকাওয়াজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁদের মৃত দেহসমূহ শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। অনেককে জীবন্ত পোড়ান হয়। কিছুসংখ্যক মানুষকে লোহার পেরেক দ্বারা গেথে পরে গুলি করে হত্যা করা হয়। একজন আহত যে বেঁচেছিল সে বর্ণনা করে মা'কে তাঁর বাচ্চাদের খুনপান করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিহারী জনসংখ্যার প্রায় সকলকেই উচ্ছেদ করা হয়েছে। (নিহত- ১৫০০০)
জেলা পাবনা	২৩মার্চ- ১০ এপ্রিল পাবনা শহর	সেনাবাহিনীর সদস্যরা শহর দখল না করা পর্যন্ত দীর্ঘ দুই সপ্তাহ ধরে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের রাজত্ব চলে। (নিহত- ২০০)
	২৩ মার্চ- ১০ এপ্রিল সিরাজগঞ্জ	দুষ্কৃতিকারীরা ৩৫০ জন নর, নারী ও শিশুকে একটি দালানে ডুকিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাঁরা সবাই নিহত হন।
	১০ এপ্রিল পাকসী	রেলওয়ে কলোনীর বসবাসকারীদের শান্তি কমিটি গঠনের কথা বলে এক স্কুলে আবদ্ধ করে স্কুল ইমারতটিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। নিহত প্রায়- ২০০০।
রংপুর	তারিখ ২৩- ৩১ মার্চ (১৯৭১) এলাকা: সৈয়দপুর	বসবাসকারীদের সহ শত শত বাড়ীঘর ইন্দনে পরিণত করা হয়েছে। (নিহত : ১০০ ও অধিক)

	২৩ মার্চ- ১ এপ্রিল নীলফামারী	তথাকার শরণার্থী জনসংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক প্রায় ৫০০০ কে বর্বরোচিত ভাবে ধ্বংস করা হয়। এখানে নিহতের সংখ্যা ২৭০০ প্রায়।
দিনাজপুর	তারিখ ২৮ মার্চ - ১ এপ্রিল (১৯৭১) এলাকা: দিনাজপুর শহর	ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে বর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। নর, নারী ও শিশুদের নির্দয় ভাবে খুন করা হয়। সামান্য সংখ্যক যারা বেঁচে যান তাঁরা ছিলেন বৃদ্ধা মহিলা ও শিশুরা। ঘটনার শিকারদের মস্তকগুলো গাছের অগ্রভাগে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রায় ৪০০ বালিকা অপহরণ করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। (নিহত- প্রায় ৫০০০)
	২৮ মার্চ- ১৩ এপ্রিল ঠাকুরগাঁও	ই. পি. আর বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিহারী জনতাকে উৎখাত করা হয়। যুবতী বালিকাদের অপহৃত হতে হয়। মহিলারা ধর্ষিত হয় এবং অন্তস্বত্ত্বা মহিলাদের ব্যয়ানটের খোঁচিয়ে খোঁচিয়ে হত্যা করা হয়। মায়ের জড়ায়ুতে অবস্থিত বাচ্চাদেরকেও টুকরা টুকরা করা হয়েছে। মৃতদেহ গুলোকে উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তা দিয়ে টেনে নেওয়া হয়েছে। এখানে নিহত হয় ৩০০০।
	পাবর্তীপুর, পঞ্চগ্রাম চরকাই ফুলবাড়ী ও হিলি	বিদ্রোহী ই. পি. আর- দের ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল রেলওয়ে কলোনী। জঘন্য বলাৎকার ও হত্যাকান্ড শুরু করার পূর্বে তারা অধিবাসীদের সন্ত্রস্ত করার জন্য গ্রেনেড, হাল্কা মেসিনগান ও ছোট্র ছোট অস্ত্র ব্যবহার করে। যারা বেঁচে আছেন তাঁদের হিসাবে নিহত- ৫০০০।
জেলা রাজশাহী	১৮ মার্চ - ১৬ এপ্রিল রাজশাহী শহর	পুলিশ ও ই. পি. আর বিদ্রোহ করেছেন। ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল সেনাবাহিনীর লোকরা শহরটিকে নিরাপদ না করা পর্যন্ত পুলিশ ও ই. পি. আর- দের সঙ্গে ভারতীয় অনুপ্রেবেশকারীরা

		যত্রতত্র হত্যাকাণ্ড চালায়। নাটোর ও সারদা হতেও ধ্বংস যজ্ঞের খবর আসতে লাগল। (নিহত প্রায়- ২০০০)
	২৭ মার্চ- ১৮ এপ্রিল নওয়াবগঞ্জ	বিদ্রোহী ই. পি. আর- সদস্যরা ভারতের অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থনে প্রকাশ্যে নওয়াবগঞ্জ জেল ভাংগে এবং কয়েদীদের মুক্ত করে দেয় তাদেরকে সন্ত্রাসের কর্মকাণ্ডের ও অগ্নিসংযোগের জন্য উস্কানী দেওয়া হয়। একজন কেরাণিকে কোমার পর্যন্ত পোতে ফেলা হয়। কারণ তিনি বাংলাদেশকে মেনে নেন নাই। তাঁকে মোটা লাঠি দ্বারা পেটানো হয়। (মোট হতাহত ১০০০)
জেলা কুমিল্লা	তারিখ ১৪ মার্চ - ১৮ এপ্রিল (১৯৭১) এলাকা: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	বিহারী নর, নারী ও শিশুদের একত্রিত করে একটি জেলে আটক করা হয় এবং অটোমেটিক রাইফেল দ্বারা বুলেট বিদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করা হয। ১৯৭১ সালের ১৩ই এপ্রিল জনৈক বিদ্রোহী কোম্পানী কমান্ডারের নির্দেশে তদরূপ করা হয়। এখানে নিহত ৫০০।
ময়মনসিংহ	২৭ মার্চ ময়মনসিংহ সেনানিবাস	ই. বি. আর ও ই. পি. আর- রা বিদ্রোহ করে এবং তাঁরা তাঁদের পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীদেরও বাসগৃহ ও ব্যারাকে অবস্থান-কারীদেরকে (অফিসার সহ) হত্যা করে।
	১৬/ ১৭ এপ্রিল ময়মনসিংহ	প্রাক্তন ই. পি. আর- রা ম্যাসিনগান সজ্জিত হয়ে ময়মনসিংহ জেলখানা ঘেরাও করে এবং ১৭ জন বহিরাগত যাদেরকে সেখানে হেফাজততের জন্য রাখা হয়েছিল তাঁদেরকে গুলি করে মারেন।
	১৭- ২০ এপ্রিল শানকীপাড়া ও অন্যান্য কলোনী	ত্রাশ সৃষ্টিকারী সংবদ্ধজনতা রাইফেলসমূহ তরবারী, বল্লম, ছুড়ি ও কাস্তেসহ শানকীপাড়া এবং ময়মনসিংহ শহরের নিকটস্থ আরও নয়টি কলোনী আক্রমণ করে সেসব এলাকার

		অধিকাংশ মানুষ হত্যা করে। রিপোর্ট অনুযায়ী নিহত হয়েছে ৫০০০। মহিলাদের একত্রিত করে একটি মসজিদে ও স্কুল বিল্ডিং- এ হেফাজতের জন্য রাখা হয়েছিল তাদেরকে পরবর্তীতে ১৯৭১ এর ২১ এপ্রিল সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশ করে মুক্ত করে।

পরিশিষ্ট- ৯

শেখ মুজিব ও মীরজাফরের চুক্তির সাদৃশ্য

মুজিব-ইন্দিরার গোপন চুক্তি

(১) বাংলাদেশে ভারত তার ইচ্ছামত, তার পছন্দসই লোক দিয়ে পছন্দসই নেতৃত্ব পাঠিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করবে, যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধাসামরিক বলে পরিচিত হবে, কিন্তু এদেরকে গুরুত্বের দিক থেকে ও সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী থেকে বড় তাৎপর্যপূর্ণ রাখা হবে।

(ধারণা করা হচ্ছে, এই বাহিনীই হচ্ছে রক্ষীবাহিনী। ভারতীয় সৈন্যের পোষাক, ভারতীয় সেনানী মন্ডলীর নেতৃত্ব ও ভারতের অভিরুচি অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণীর লোককে শতকরা ৮০ জন এবং 'বিশেষ বাদ'-এর সমর্থক ২০ জন করে নিয়ে এই বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। অস্ত্র, গাড়ী, পোষাক, সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে এই বাহিনীটি মূল বাহিনীকে ছাড়িয়ে গেছে। এ বাহিনীকে ব্যবহার করা হইবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। ভারত বিরোধী কোন সরকার ঢাকায় ক্ষমতায় বসলেও এ বাহিনী দিয়ে তাকে উৎখাত করা হবে। বাংলাদশের অভ্যন্তরে ভারত-বিরোধী রাজনীতির সমর্থকদের এই বাহিনী দিয়েই দমন করা হবে। এই বাহিনীর মধ্যে ভারতপ্রেমিক বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় কোন দিন এদেরকে ভাতের বিরুদ্ধে লাগানো যাবে না। এদেশের জনগণ কোন দিন বিপ্লবে অবতীর্ণ হলে, রক্ষীবাহিনীর পোষাক গুণে ভারতীয় সৈন্যরা লাখে লাখে রক্ষীবাহিনী সেজে এদেশের অভ্যন্তরে জনগণকে দমন করতে পারবে।)

(২) বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে যে সামরিক সাহায্য নিয়েছে তা পরিশোধ করতে হবে বিভিন্ন ভাবেঃ (ক) ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশের কাছ থেকে বাংলাদেশ অস্ত্র কিনতে পারবে না। মাঝে মাঝে ঘোষণা করতে হবে ভারত থেকে এত কোটি টাকার অস্ত্র কেনা হলো। এর দাম ভারতই ঠিক করে

দেবে। সরবরাহ দেওয়া হবে অর্ধেক অস্ত্র। সবরাহকৃত অস্ত্র ও ভারত ইচ্ছামত নিজ দেশে নিয়ে যেতে পারবে।

(অর্থাৎ একই অস্ত্র বারবার দেখিয়ে ১৯৭১-এর পাওনা এবং ভারতের সম্পূর্ণ যুদ্ধ খরচ আদায় করা হবে। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের জন্য সাধারণ অস্ত্র ছাড়া কোন ভারী অস্ত্র, সাজোয়া গাড়ী বা ট্যাংক বাংলাদেশকে দেওয়া হবে না।)

(৩) বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ভারতের অনুমতি ছাড়া কোন পণ্য বিদেশে রফতানী করা যাবে না। কোন পণ্য কত দরে বাইরে রফতানী করতে হবে ভারত সেই দর বেঁধে দেবে। এইসব পণ্য ভারত নিজেই কিনতে চাইলে বাংলাদেশ আর কারো সাথে সে পণ্য বিক্রির কথা আলোচনা করতে পারবে না। বাংলাদেশের আমদানী তালিকা ভারতের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(বাংলাদেশে বিদেশী পণ্য আমদানীর ব্যাপারে ভারত উদার থাকবে, যে সব পণ্য ভারতকেও আমদানী করতে হয়- সেগুলি আমদানী করানো হবে বাংলাদেশকে দিয়ে। বাংলাদেশ তার বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ভেঙ্গে বিদেশ থেকে যেসব সামগ্রী আমদানী করবে সেগুলি ভারত নিজে আমদানী করবে না। চোরাচালানের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশ থেকে সেই মালগুলি ভারতীয় টাকায় যোগাড় করবে। বিলাতের সেভেন-ও-ক্লক ব্লেডের বেলায় এবার এটা ঘটেছে। ভারত সেভেন-ও-ক্লক আমদানী করেনি। বাংলাদেশকে দিয়ে বিপুল পরিমাণে অর্থাৎ দেড় কোটি ব্লেড আমদানী করিয়েছে। এখন ভারত বিনা খরচায় সেই ব্লেড পেয়ে গেছে)।

(৪) বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি ভারতকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(বাংলাদেশ যেন স্বাবলম্বী হতে না পারে ভারত সেভাবে পরিকল্পনাগুলি কেটে ছিঁড়ে ঠিক করবে। আইয়ূবী আমলে বাংলাদেশে পকিল্পনার অর্থ ব্যয় হয়েছে উৎপাদনশীল খাতে। ভারত বাংলাদেশের উন্নয়নকে অনুৎপাদনশীল

রেখে দিতে চায়। ইতোমধ্যে সরকার কৃর্তক ঘোষিত বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাজেটে একই অবস্থা দেখা গেছে। আগামী মহাপরিকল্পনা এখন ভারতের কাছে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাতেও অনুৎপাদনশীল খাত প্রাধান্য পাবে।)

(৫) বাংলাদেশের পর-রাষ্ট্রনীতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অনুবর্তী রাখতে হবে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

(৬) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার চুক্তিগুলি বাংলাদেশে একতরফাভাবে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে ভারত এ চুক্তিগুলির কার্যকারিতা অস্বীকার না করলে বৎসর বৎসরান্তে এ চুক্তিমালা বলবৎ থাকবে।

(৭) ডিসেম্বর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তিটিতে বলা হয়েছিল যে, ভারতীয় সৈন্যরা যে কোন সংখ্যায়, যেকোন সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং বাধা প্রদানকারী কোন মহলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে। ভারতীয় বাহিনীর এ ধরনের অভিযানের প্রতি বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছে। ভারত চুক্তিটি নাকচ না করলে বৎসর বৎসরান্তে এ চুক্তি বলবৎ থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ভারত মোটামুটি এ ধরনের চুক্তিগুলি সম্পাদন করে। এ চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তাজুদ্দিন আহমদরা। বাংলাদেশকে বেকায়দা অবস্থায় পেয়ে এমনি ঠগ ও শঠতাপূর্ণ চুক্তিতে বাঁধা হয়েছিল।

মীর জাফরের চুক্তি

সেই সর্বনাশী পলাশির কথা। সবাই জানেন, পলাশীর যুদ্ধটা ছিল একটা ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধ। নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে জগৎশেঠ, রাজবল্লবদের নেতৃত্বে সুবে বাঙলার হিন্দু প্রধানেরা এবং রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে বিদেশী বেনিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরকে সমানে রেখে যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তারই পরিণামে সংঘটিত হয়েছিল ওই পলাশীর যুদ্ধ। ষড়যন্ত্র ছিল ভিতরে ভিতরে, বাইরে ছিল নবাব সিরাজের অত্যাচার অবিচার থেকে সুবে বাঙলার 'মুক্তি'র

বুলি। বলাবাহুল্য, ওই তথাকথিত 'মুক্তির জন্য ইংরেজ বেনীয়াদের সঙ্গে মীরজাফরের চুক্তিও হয়েছিল। ওই চুক্তিতে দুয়ের মধ্যে লেন-দেন এর কথাও ছিল। এটা ১৭৫৭ সালের কথা। এই চুক্তির ২১৪ বছর পর ১৯৭১ সালে এই বাংলায়ই আর একটি যুদ্ধ হয়েছিল যা 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে পরিচিত। ব্যাপারটা সবারই জানা। পাকিস্তানীদের অত্যাচার-অবিচার থেকে বাংলাদেশের মানুষকে 'মুক্তি' দেয়ার জন্যই সংঘটিত হয়েছিল ওই 'মুক্তিযুদ্ধ' এই যুদ্ধে ইংরেজ বেনিয়াদের স্থানে ছিল ভারতের বেনিয়ারা আর মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক নেতা ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। তখনকার জগৎশেঠ-রাজবল্লভদের স্থানে ১৯৭১ সালে কারা ছিল, পাঠকবৃন্দ তা আন্দাজ করে নিবেন। তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা, যে ১৯৭১ সালের 'মুক্তিযুদ্ধ'কে কেন্দ্র করেও চুক্তি হয়েছিল ভারত সরকারের সঙ্গে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের এবং এসব চুক্তিতেও নানা কথার আড়ালে লেনদেনের ব্যাপারটাও ছিল। ১৭৫৭ সালের লেন-দেন এতই বিপুল আকারের ছিল যে তার মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সুবে বাঙলায় এসেছিল 'ছিয়াত্তরের মন্তন্তর' নামক সেই মহামন্বন্তর যাতে এদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারিয়েছিল। এবং সবাই জানেন না ১৯৭১ সালের লেন-দেনও এত ভয়ঙ্কর রকমের বিপুল আকারের ছিল যে তা কয়েক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশে এসেছিল আর একটি মহামন্বন্তর যাতে কলাপাতার কাফন পরিয়েও মরা মানুষকে দাফন করতে হয়েছিল। আমরা এবার ওই দুটি সময়ের গোপন চুক্তিও তার লেন-দেনের কথা নীচে প্রকাশ করলাম। আর প্রকাশ করলাম পলাশী কালের সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র কথায় এবং বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধ' কালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর 'হক-কথা'র কথায়। আশা করি, এর ফলে পাঠকবৃন্দের মনে কোন সুবা-সন্দেহ থাকবে না। মীরজাফর আর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে গোপন চুক্তিটি ছিল নিম্নরূপ (উহা শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত 'মীর কাসিম' নামক গ্রন্থের ২২৩ এবং ২২৪ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট (ক) হইতে অনুবাদরূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে)

"আমি আল্লাহর নামে ও আল্লাহর রাসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার জীবনকালে আমি এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মানিয়া চলিব।

ধারা- ১: নবাব সিরাজউদৌলার সঙ্গে শান্তিচুক্তির যেইসব ধারা সম্মতি লাভ করিয়াছিল, আমি সেইসব ধারা মানিয়া চলিতে সম্মত হইলাম।

ধারা- ২: ইংরেজদের দুশমন আমারও দুশমন, তারা ভারতবাসী হোক অথবা ইউরোপীয়।

ধারা- ৩: জাতিসমূহের স্বর্গ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ফরাসীদের সকল সম্পত্তি এবং ফ্যাক্টরীগুলি ইংরেজদের দখলে থাকিবে এবং আমি কখনো তাহাদিগকে (ফরাসীদেরকে) এই তিনটি প্রদেশে আর কোন স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করিতে দিব না।

ধারা- ৪: নবাব সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা দখল ও লুণ্ঠনের ফলে ইংরেজ কোম্পানী যেইসব ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে তাহার বিবেচনায় এবং তন্নিমিত্ত মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ আমি তাহাদিগকে এক ক্রোড় তঙ্কা প্রদান করিবো।

ধারা- ৫: কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য আমি তাহাদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ তঙ্কা প্রদান করিতে সম্মত হইলাম।

ধারা- ৬: কলিকাতার জেন্টু (হিন্দু) মূর (মুসলমান) এবং অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদান করা হইবে বিশ লক্ষ তঙ্কা। (ইংরেজরা হিন্দুদেরকে 'জেন্টু' এবং মুসলমানদেরকে 'মূর' ও 'মোহামেডান' বলে চিহ্নিত করত।)

ধারা- ৭: কলিকাতার আর্মেনীয় অধিবাসীদের মালামাল লুণ্ঠণের জন্য তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে সাত লক্ষ তঙ্কা। ইংরেজ, জেন্টু, মূর এবং কলিকাতার অন্যান্য অধিবাসীদের প্রদেয় তঙ্কার বিতরণ- ভার ন্যস্ত রহিল এডমিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ক্লাইভ, রজার ড্রেক, ইউলিয়াম ওয়াটস, জেমস কিলপ্যাট্রিক এবং রিচার্ড বীচার মহোদয়গণের উপর। তাঁহারা নিজেদের বিবেচনায় যাহার যেমন প্রাপ্য তাহা প্রদান করিবেন।

ধারা- ৮: কলিকাতার বর্ডার বেষ্টনকারী মারাঠা ডিচের মধ্যে পড়িয়াছে কতিপয় জমিদারের কিছু জমি; ওই জমি ছাড়াও আমি মারাঠা ডিচের বাইরে ৬০০ গজ জমি ইংরেজ কোম্পানীকে দান করিব।

ধারা- ৯: কল্পি পর্যন্ত কলিকাতার দক্ষিণস্থ সব জমি ইংরেজ কোম্পানীর জমিদারীর অধীনে থাকিবে এবং তাহাতে অবস্থিত যাবতীয় অফিসাদি কোম্পানীর আইনগত অধিকারে থাকিবে।

ধারা- ১০: আমি যখনই কোম্পানীর সাহায্য দাবি করিব, তখনই তাহাদের বাহিনীর যাবতীয় খরচ বহনে বাধ্য থাকিব।

ধারা- ১১: হুগলীর সন্নিকট গঙ্গা নদীর নিকটে আমি কোন নতুন দুর্গ নির্মাণ করিব না।

ধারা- ১২: তিনটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইবা মাত্র আমি উপরিউক্ত সকল তঙ্কা বিশ্বস্তভাবে পরিশোধ করিবো।

পল্টন ময়দানে কাদের সিদ্দিকীর তাণ্ডব

দিল্লীর আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য দেশপ্রেমিক তরুণ যারা স্বেচ্চাপ্রনধিত হয়ে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল। ঢাকা পতনের পর সেই সব তরুণ (রেজাকার) সেচ্চাসেবিদের নির্ম্মমভাবে হাত পা বেঁধে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করেছে দিল্লীর ক্রিড়নক ও দুষররা। পল্টন ময়দানে এমন একটি দৃর্শ্যে দেখা যাচ্ছে রক্তপিপাসু কসাই যে ঢাকা স্টেডিয়ামে হত্যাযজ্ঞ করেছিল সেই আব্দুল কাদের সিদ্দিকী

(গামচা কাদের) বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করছে বেশ কিছু সম্ভাবনাময় তরুণকে।

দিল্লীর আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য দেশপ্রেমিক তরুণ যারা স্বেচ্চাপ্রনধিত হয়ে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল। ঢাকা পতনের পর সেই সব তরুণ (রেজাকার) সেচ্চাসেবিদের নির্ম্মমভাবে হাত পা বেঁধে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করেছে দিল্লীর

ক্রিড়নক ও দুষররা। পল্টন ময়দানে এমন একটি দৃর্শ্যে দেখা যাচ্ছে রক্তপিপাসু কসাই যে ঢাকা স্টেডিয়ামে হত্যাযজ্ঞ করেছিল সেই আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (গামচা কাদের) বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করছে বেশ কিছু সম্ভাবনাময় তরুণকে।

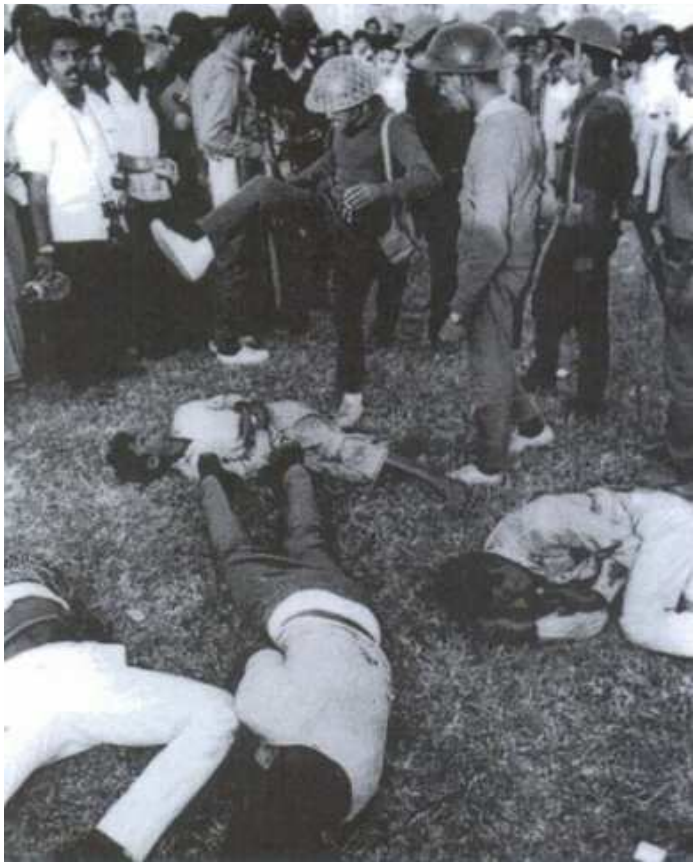

দিল্লীর আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য দেশপ্রেমিক তরুণ যারা স্বেচ্চাপ্রনধিত হয়ে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল। ঢাকা পতনের পর সেই সব তরুণ (রেজাকার) সেচ্চাসেবিদের নির্ম্মমভাবে হাত পা বেঁধে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করেছে দিল্লীর

ক্রিড়নক ও দুষররা। পল্টন ময়দানে এমন একটি দৃর্শ্যে দেখা যাচ্ছে রক্তপিপাসু কসাই যে ঢাকা স্টেডিয়ামে হত্যাযজ্ঞ করেছিল সেই আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (গামচা কাদের) বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করছে বেশ কিছু সম্ভাবনাময় তরুণকে।

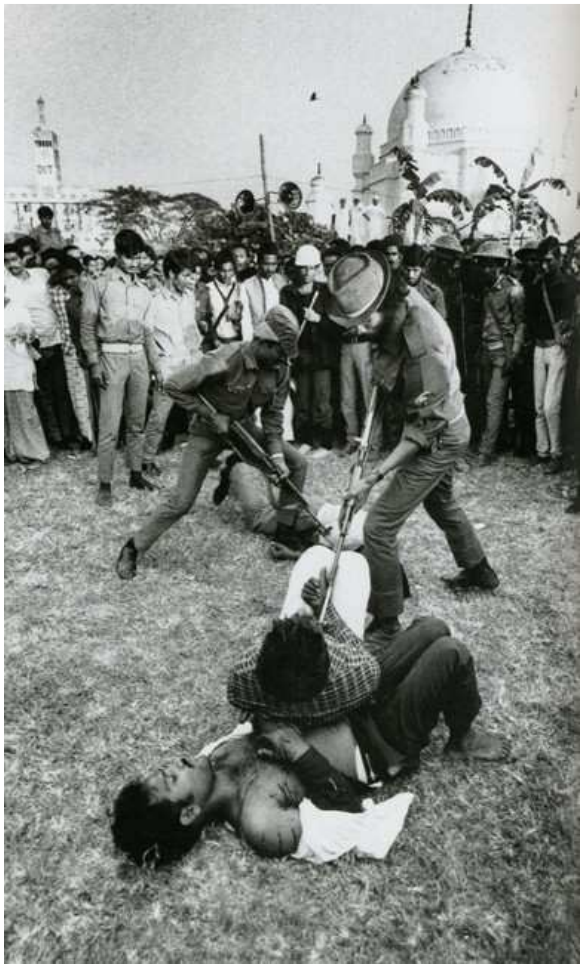

দিল্লীর আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য দেশপ্রেমিক তরুণ যারা স্বেচ্চাপ্রনধিত হয়ে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল। ঢাকা পতনের পর সেই সব তরুণ (রেজাকার) সেচ্চাসেবিদের নির্ম্মমভাবে হাত পা বেঁধে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করেছে দিল্লীর ক্রিড়নক ও দুষররা। পল্টন ময়দানে এমন একটি দৃর্শ্যে দেখা যাচ্ছে রক্তপিপাসু কসাই যে ঢাকা স্টেডিয়ামে হত্যাযজ্ঞ করেছিল সেই আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (গামছা কাদের) বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করছে বেশ কিছু সম্ভাবনাময় তরুণকে।

আওয়ামী বাকশালী দুঃশাসনের খতিয়ান

(১৯৭২-১৯৭৫)

কালবাজারী	৫ হাজার কোটি টাকার মালামাল
পাচার	২ হাজার কোটি টাকার মালামাল
জালিয়াতী	১৫ হাজার কোটি টাকার মালামাল
ব্যাংক লুট	৫ হাজারের বেশী
অস্ত্র লুট	দেড় শতাধিক (রাইফেল, এস এল আর, প্রভৃতিসহ প্রায় ১৫ হাজার)
ধর্ষণ	প্রায় ১৫ হাজার
সরকারী মিথ্যা আশ্বাস	প্রায় ১২ হাজার
অবৈধ দখল	শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ঘড়-বাড়ি মিলে প্রায় ১৩ হাজার, জমি ৫০ হাজার একর

সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়	৪ শতাধিক
দুর্ভিক্ষে মৃত্যু	১০ লক্ষ লোক
পুষ্টিহীনতায় মৃত্যু	২ লাখ লোক
বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু	১ লাখ লোক
জেলখানায় মৃত্যু	৯ হাজার লোক
আওয়ামী-বাকশালী গুন্ডা ও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনে মৃত্যু	২৭ হাজার লোক
রাজনৈতিক হত্যা	১৯ হাজার লোক
গুম/ খুন	১ লাখের উপর লোক
পিটিয়ে হত্যা	৭ হাজার লোক
আওয়ামী গুন্ডা ও রক্ষী বাহিনীর নির্যাতনে পঙ্গ	২৬ শত লোক
গ্রেফতার ও নির্যাতন	২ লাখ লোক
চুরি-ডাকাতি/ রাহাজানি/ লুটপাট আগুন লাগানো হয়েছে	৭২টি পাটের গুদাম

পরিশিষ্ট- ১০

শেখ মুজিবুর রহমান

(ইন্টারভিউ উইথ হিস্টরী ওরিয়ানী ফালাচি)

রোববার সন্ধ্যাঃ আমি কোলকাতা হয়ে ঢাকার পথে যাত্রা করেছি। সত্যি বলতে কি, ১৮ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী তাদের বেয়োনেট দিয়ে যে যজ্ঞ চালিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করার পর পৃথিবীতে আমার অন্তিম ইচ্ছা এটাই ছিল যে, এই ঘৃণ্য নগরীতে আমি আর পা ফেলবো না- এরকম সিদ্ধান্ত আমি নিয়েই ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার সম্পাদকের ইচ্ছা যে, আমি মুজিবের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। ভুট্টো তাকে মুক্তি দেবার পর আমার সম্পাদকের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল। তিনি কি ধরণের মানুষ? আমার সহকর্মীরা স্বীকৃতি দিলো, তিনি মহান ব্যক্তি, সুপারম্যান। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দেশকে সমস্যামুক্ত করে গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

আমার স্মরণ হলো, ১৮ই ডিসেম্বর আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, তখন লোকজন বলছিল, "মুজিব থাকলে সেই নির্মম, ভয়ংকর ঘটনা কখনোই ঘটতো না। মুজিব প্রত্যাবর্তন করলে এ ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটবে না" কিন্তু গতকাল মুক্তিবাহিনী কেন আরো ৫০ জন নিরীহ বিহারীকে হত্যা করেছে? 'টাইম' ম্যাগাজিন কেন তাকে নিয়ে বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে হেডলাইন করেছে? আমি বিস্মিত হয়েছি যে, এই ব্যক্তিটি ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে সাংবাদিক অ্যালডো শানতিনিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমার দেশে আমি সবচেয়ে সাহসী এবং নির্ভীক মানুষ, আমি বাংলার বাঘ, দিকপাল. . . এখানে যুক্তির কোন স্থান নেই. . . ।" আমি বুঝে উঠতে পারিনি, আমার কি ভাবা উচিত।

সোমবার বিকেলঃ আমি হোটেল ইন্টাকন্টিমেন্টালে এবং আমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব দ্বিগুণের অধিক। ঘটনাটা হলো, আমি মুজিবকে দেখেছি। যদিও মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। সাক্ষাৎকার নেয়ার পূর্বে তাকে এক নজর দেখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এই কয়েকটা মুহূর্তই আমার চিত্তকে দ্বিধা ও সংশয়ে পূর্ণ করতে যথেষ্ট ছিল?

যখন ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করি, কার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি আর কেউ নন, মি. সরকার। আমার শেষবার ঢাকা অবস্থানকালে এই বাঙ্গালি ভদ্রলোক আমার দোঁভাষী ছিলেন। তাঁকে দেখলাম রানওয়ের মাঝখানে। আমি ভাবিনি, কেন? সম্ভবত এর চেয়ে ভালো কিছু তার করার ছিল না। আমাকে দেখামাত্র জানতে চাইলেন যে, আমার জন্যে তিনি কিছু করতে পারেন কিনা? তাকে জানালাম যে, তিনি আমাকে মুজিবের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি সোজা আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং পনের মিনিটের মধ্যে আমরা একটা গেট দিয়ে প্রবেশ করলাম। গেটে মেশিনগানধারী মুক্তিবাহিনীর কড়া প্রহরা। আমরা রান্নাঘরে প্রবেশ করে দেখলাম মুজিবের স্ত্রী খাচ্ছেন। সাথে খাচ্ছে তার ভাগনে ও মামাত ভাইবোনেরা। একটা গামলায় ভাত-তরকারী মাখিয়ে আঙ্গুল দিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছে সবাই। এদেশে খাওয়ার পদ্ধতি এরকমই। মুজিবের স্ত্রী আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন।

ঠিক তখনই মুজিব এলেন। সহসা রান্নাঘরের মুখে তার আবির্ভাব হলো। তার পরনে এক ধরনের সাদা পোশাক, যাতে আমার কাছে তাকে মনে হয়েছিল একজন প্রাচীন রোমান হিসেবে। পোশাকের কারণে তাকে দীর্ঘ ও ঋজু মনে হচ্ছিল। তার বয়স একান্ন হলেও তিনি সুপুরুষ। ককেশীয় ধরনের সন্দুর চেহারা। চশমা ও গোঁফে সে চেহারা হয়েছে আরো বুদ্ধিদীপ্ত। যে কারো মনে হবে, তিনি বিপুল জনতাকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি স্বাস্থ্যের অধিকারী।

আমি সোজা তার কাছে গিয়ে পরিচয় পেশ করলাম এবং আমার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করলাম। মি. সরকার ভূমিতে পতিত হয়ে মুজিবের পদচুম্বন করলেন। আমি মুজিবের হাতটা আমার হাতে নিয়ে বললাম, "এই নগরীতে আপনি ফিরে এসেছেন দেখে আমি আনন্দিত, যে নগরী আশঙ্কা করছিল যে, আপনি আর কোনদিন এখানে ফিরবেন না।" তিনি আমার দিকে তাকালেন একটু উষ্মার সাথে। একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, "আমার সেক্রেটারীর সাথে কথা বল।"

আমার দ্বিধা ও সন্দেহের কারণ উপলব্ধি করা সহজ। মুজিবকে আমি জেনে এসেছি একজন গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী হিসেবে। যখন আমি দম নিচ্ছিলাম, একজন যুবক আমার কাছে এসে বললো, সে ভাইস সেক্রেটারী। বিনয়ের সাথে সে প্রতিশ্র"তি দিলো, বিকেল চারটার সময় আমি 'সরকারী বাসভবনে' হাজির থাকতে পারলে আমাকে দশ মিনিট সময় দেয়া হবে। তাঁর সাথে যারা সাক্ষাৎ করতে চায় তাদের সাথে সেখানেই তিনি কথা বলেন। বিকেল সাড়ে তিনটায় নগরী ক্লান্ত, নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত মধ্যাহ্নের বিশ্রাম নিচ্ছে। রাস্তায় কাঁধে রাইফেল ঝুলানো মুক্তিবাহিনী টহল দিচ্ছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে একমাসেরও বেশি সময় আগে। কিন্তু এখনো তাদের হাতে অস্ত্র আছে। তারা রাতদিন টহল দেয়। এলোপাথাড়ি বাতাসে গুলী ছুঁড়ে এবং মানুষ হত্যা করে। হত্যা না করলে দোকানপাট লুট করে। কেউ তাদের থামাতে পারে না- এমন কি মুজিবও না। সম্ভবত তিনি তাদের থামাতে সক্ষম নন। তিনি সন্তুষ্ট এজন্যে যে, নগরীর প্রাচীর তার পোস্টার সাইজের ছবিতে একাকার। মুজিবকে আমি আগে যেভাবে জেনেছিলাম, তার সাথে আমার দেখা মুজিবকে মিলাতে পারছি না।

সোমবার সন্ধ্যাঃ আমি যে তার সাক্ষাৎকার নিয়েছি এটা ছিল একটা দুর্বিপাক। তার মানসিক যোগ্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল। এমন কি হতে পারে যে, কারাগার এবং মৃত্যু সম্পর্কে ভীতি আর মস্তিষ্ককে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে? তার ভারসাম্যহীনতাকে আমি আর কোনভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারি না। একই সময়ে আমি বলতে চাচ্ছি, কারাগার এবং মৃত্যুর ভয় ইত্যাদি. . . সম্পর্কে কাহিনীগুলো. . . আমার কাছে এখনো খুব স্পষ্ট নয়। এটা কি করে হতে পারে যে, তাকে যে রাতে গ্রেফতার করা হলো সে রাতে সকল পর্যায়ের লোককে হত্যা করা হলো? কি করে কি করে এটা হতে পারে যে তাকে কারাগারে এটি প্রকোষ্ট থেকে পলায়ন করতে দেয়া হলো, যেটি তার সমাধি সৌধ হতো? তিনি কি গোপনে ভুট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন? আমি যত তাকে পর্যবেক্ষণ করেছি, তত মনে হয়েছে, তিনি কিছু একটা লুকোচ্ছেন। এমন কি তার মধ্যে যে সর্বাক্ষণিক আক্রমণাত্মক ভাব, সেটাকে আমার মনে হয়েছে আত্মরক্ষার কৌশল বলে।

ঠিক চারটায় আমি সেখানে ছিলাম। ভাইস সেক্রেটারী আমাকে করিডোরে বসতে বললেন, যেখানে কমপক্ষে পঞ্চাশজন লোকে ঠাসাঠাসি ছিল। তিনি অফিসে প্রবশ করে মুজিবকে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে জানালেন। আমি একটা ভয়ংকর গর্জন শুনলাম এবং নিরীহ লোকটি কম্পিতভাবে পুনরায় আবির্ভুত হয়ে আমাকে প্রতীক্ষা করতে বললেন। আমি প্রতীক্ষা করলাম- এক ঘণ্টা, দুই ঘন্টা, তিন ঘন্টা, চার ঘন্টা- রাত আটটা যখন বাজলো, তখনো আমি সেই অপরিসর করিডোরে অপেক্ষামান। রাত সাড়ে আটটায় আমাকে প্রবেশ করতে বলা হলো। আমি বিশাল এক কক্ষে প্রবেশ করলাম। একটি সোফা ও দুটো চেয়ার সে কক্ষে। মুজিব সোফার পুরোটায় নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং দু'জন মোটা মন্ত্রী চেয়ার দুটো দখল করে বসে আছেন। কেউ দাঁড়ালো না। কেউ আমাকে অভ্যর্থনা জানালো না। কেউ আমার উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করলো না। মুজিব আমাকে বসতে বলার সৌজন্য প্রদর্শন না করা পর্যন্ত সুদীর্ঘক্ষণ নীরবতা বিরাজ করছিল। আমি সোফার ক্ষুদ্র প্রান্তে বসে টেপ রেকর্ডার খুলে প্রথম প্রশ্ন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু আমার সে সময়ও ছিল না। মুজিব চিৎকার শুরু করলেন, 'হ্যারি আপ, কুইক, আন্ডারষ্ট্যান্ড? নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?. . . পাকিস্তানীরা ত্রিশ লক্ষ লোক হত্যা করেছে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার- আমি বললাম, "মি. প্রাইম মিনিস্টার . . . ।"

মুজিব আবার চিৎকার শুরু করলেন, "ওরা আমার নারীদেরকে তাদের স্বামী ও সন্তানদের সামনে হত্যা করেছে। স্বামীদের হত্যা করেছে তাদের ছেলে ও স্ত্রীর সামনে। মা বাপের সামনে ছেলেকে ভাইবোনের সামনে ভাইবোনকে. . . "মি. প্রাইম মিনিস্টার . . . . আমি বলতে চাই. . . ।"

"তোমার কোন কিছু চাওয়ার অধিকার নেই, ইজ দ্যাট রাইট?

"আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো। কিন্তু একটা বিষয় সম্পর্কে আমি আরো কিছু জানতে চাই।" বিষয়টা আমি বুঝতে পারছিলাম না। "মি. প্রাইম মিনিস্টার, গ্রেফতারের সময় কি আপনার উপরে নির্যাতন করা হয়েছিল?

"নো, ম্যাডাম নো। তারা জানতো, ওতে কিছু হবে না। তারা আমার বৈশিষ্ট্য, আমার শক্তি, আমার সম্মান, আমার মূল্য, বীরত্ব সম্পর্কে জানতো, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?"

"তা বুঝলাম। কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন যে তারা আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলাবে? ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়?

"নো, নো ডেথ সেন্টেন্স।"

এই পর্যায়ে তাকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো এবং তিনি গল্প বলতে শুরু করলেন, "আমি এটা জানতাম। কারণ ১৫ই ডিসেম্বর ওরা আমাকে কবর দেয়ার জন্য একটা গর্ত খনন করে।"

"কোথায় খনন করা হয়েছিল সেটা?"

"আমার সেলের ভিতরে।"

"আমাকে কি বুঝে নিতে হবে যে গর্তটা ছিল আপনার সেলের ভিতরে?"

'ইউ মিস আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।"

"আপনার প্রতি কেমন আচরণ করা হয়েছে মি. প্রাইম মিনিস্টার?"

"আমাকে একটা নির্জন প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছিল। এমনকি আমাকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেয়া হতো না, সংবাদপত্র পাঠ করতে বা চিঠিপত্রও দেয়া হতো না, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?"

"তাহলে আপনি কি করেছেন?"

"আমি অনেক চিন্তা করেছি।"

"আপনি কি পড়েছেন?"

"বই এবং অন্যান্য জিনিস।"

"তাহলে আপনি কিছু পড়েছেন।"

"হ্যাঁ কিছু পড়েছি।"

"কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল, আপনাকে কোনকিছুই পড়তে দেয়া হয়নি।"

"ইউ মিস আণ্ডারষ্টুড।"

"তা বটে মি. প্রাইম মিনিস্টার। কিন্তু এটা কি করে হলো যে, শেষ পর্যন্ত ওরা আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলালো না।"

"জেলার আমাকে সেল থেকে পালাতে সহায়তা করেছেন এবং তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন।"

"কেন, তিনি কি কোন নির্দেশ পেয়েছিলেন?"

"আমি জানি না। এ ব্যাপারে তার সাথে আমি কোন কথা বলিনি এবং তিনিও আমার সাথে কিছু বলেননি।"

"নিরবতা সত্ত্বেও কি আপনারা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আমাকে সাহায্য করতে চান।"

"তাহলে আপনি তার সাথে কথা বলেছেন?"

"হ্যাঁ, আমি তার সাথে কথা বলেছি।"

"আমি ভেবেছিলাম, আপনি কারো সাথেই কথা বলেননি।"

'ইউ মিস আণ্ডারস্টুড।"

"তা হবে মি. প্রাইম মিনিস্টার। যে লোকটি আপনার জীবন রক্ষা করলো আপনি কি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন না।?" এটা ছিল ভাগ্য আমি ভাগ্য বিশ্বাস করি।

এরপর তিনি ভুট্টো সম্পর্কে কথা বললেন। এ সময় তার কথায় কোন স্ববিরোধিতা ছিল না। বেশ সতর্কতার সাথেই বললেন তার সম্পর্কে। আমাকে

মুজিব জানালেন যে, ২৬ শে ডিসেম্বর ভুট্টো তাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য তাকে রাওয়ালপিণ্ডিতে নেয়া। তার ভাষায়, "ভুট্টো একজন ভদ্রলোকের মতই ব্যবহার করলেন। তিনি সত্যিই ভদ্রলোক।" ভূট্টো তাকে বলেছিলেন যে, একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য মুজিব ব্লাক 'আউট ও যুদ্ধ বিমানের গর্জন থেকে বরাবরই যুদ্ধ সম্পর্কে আঁচ করেছেন। ভূট্টো তার কাছে আরো ব্যাখ্যা করলেন যে, এখন তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং তার কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করতে চান।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, "কি প্রস্তাব মি. প্রাইম মিনিস্টার?" তিনি উত্তর দিলেন "হোয়াই শুড আই টেল ইউ? এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রাইভেট অ্যাফেয়ার।"

"আমার কাছে বলার প্রয়োজন নেই মি. প্রাইম মিনিস্টার, আপনি বলবেন ইতিহাসের কাছে।"

মুজিব বললেন, "আমিই ইতিহাস। আমি ভূট্টোকে থামিয়ে বললাম, যদি আমাকে মুক্তি দেয়া না হয়, তাহলে আমি আলাপ করবো না। ভূট্টো অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উত্তর দিলেন, আপনি মুক্ত যদিও আপনাকে শীঘ্র ছেড়ে দিচ্ছি না। আমাকে আরো দুই বা তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপর ভূট্টো পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সম্পর্কে তার পরিকল্পনা তৈরী করতে শুরু করলেন। কিন্তু আমি অহংকারের সাথেই জানালাম, দেশবাসীর সাথে আলোচনা না করে আমি কোন পরিকল্পনা করতে পারি না।" এই পর্যায়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, "তাহলে তো কেউই বলতেই পারে যে, আপনাদের আলোচনা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হয়েছিল।"

"তা তো বটেই। আমরা পরস্পরকে ভালোভাবে জানি। খুব বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল। কিন্তু তা হয়েছিল আমার জানার আগে যে, পাকিস্তানীরা আমার জনগণের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত নিপীড়ন করেছে। আমি জানতাম না যে, তারা বর্বরোচিতভাবে আমার মা- বোনকে হত্যা করেছে।

আমি তাকে থামিয়ে বললাম, "আমি জানি মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি জানি।" তিনি গর্জে উঠলেন, "তুমি কিছুই জানো না; আমি তখন জানতাম না যে, তারা আমার স্থপতি, আইনবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, আমার চাকরকে হত্যা করেছে এবং আমার বাড়ি, জমি, সম্পত্তি ধ্বংস করেছে, আমার. . . ।"

তিনি যখন তার সম্পত্তির অংশে পৌঁছলেন, তার মধ্যে এমন একটা ভাব দেখা গেল, যা থেকে তাকে এই প্রশ্নটা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম যে, তিনি সত্যিই সমাজতন্ত্রী কি না? তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ. . . ।" তার কণ্ঠে দ্বিধা। তাকে আবার বললাম যে, সমাজতন্ত্র বলতে তিনি কি বুঝেন? তিনি উত্তর দিলেন, "সমাজতন্ত্র।" তাতে আমার মনে হলো, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার যথার্থ ধারণা নেই।

এরপর ১৮ই ডিসেম্বর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি রাগে ফেটে পড়েন। নিচের অংশটুকু আমার টেপ থেকে নেয়া :

"ম্যাসাকার? হোয়াট ম্যাসাকার?"

"ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটি।"

"ঢাকা স্টেডিয়ামে কোন ম্যাসাকার হয়নি। তুমি মিথ্যে বলছো।"

"মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি মিথ্যাবাদী নই। সেখানে আরো সাংবাদিক ও পনের হাজার লোকের সাথে আমি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছি। আপনি চাইলে আমি আপানকে তার ছবিও দেখাবো। আমার পত্রিকায় সে ছবি প্রকাশিত হয়েছে।"

"মিথ্যেবাদী, ওরা মুক্তিবাহিনী নয়।"

"মি. প্রাইম মিনিস্টার, দয়া করে 'মিথ্যেবাদী" শব্দটি আর উচ্চারণ করবেন না। তারা মুক্তিবাহিনী। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবদুল কাদের সিদ্দিকী এবং তারা ইউনির্ফর্ম পরা ছিল।"

"তাহলে হয়তো ওরা রাজাকার ছিল যারা প্রতিরোধের বিরোধিতা করেছিল এবং কাদেরসিদ্দিকী তাদের নির্মূল করতে বাধ্য হয়েছে।"

"মি. প্রাইম মিনিস্টার, কেউ প্রমাণ করেনি যে, লোকগুলো রাজাকার ছিল এবং কেউই প্রতিরোধের বিরোধিতা করেনি। তারা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। হাত পা বাঁধা থাকায় তারা নড়াচড়াও করতে পারছিল না।"

"মিথ্যেবাদী।"

"শেষবারের মতো বলছি, আমাকে "মিথ্যেবাদী" বলার অনুমতি আপনাকে দেবো না।"

"আচ্ছা সে অবস্থায় তুমি কি করতে?"

"আমি নিশ্চিত হতাম যে, ওরা রাজাকার ও অপরাধী। ফায়ারিং স্কোয়াডে দিতাম এবং এইভাবেই এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড এড়াতাম।"

"ওরা ওভাবে করেনি। হয়তো আমার লোকদের কাছে বুলেট ছিল না।"

"হ্যাঁ তাদের কাছে বুলেট ছিল। প্রচুর বুলেট ছিল। এখনো তাদের কাছে প্রচুর বুলেট রয়েছে। তা দিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গুলী ছোঁড়ে। ওরা গাছে, মেঘে, আকাশে, মানুষের প্রতি গুলী ছোঁড়ে শুধু আনন্দ করার জন্য।

এরপর কি ঘটলো: যে দুই মোটা মন্ত্রী ঘুমুচ্ছিলেন গোটা সাক্ষাৎকারের সময়টায়, সহসা তারা জেগে উঠলেন, আমি বুঝতে পারলাম না মুজিব কি বলে চিৎকার করেছেন। কারণ কথাগুলো ছিল বাংলায়।

সোমবার রাত : গোটা ঢাকা নগরী জেনে গেছে যে মুজিব ও আমার মধ্যে কি ঘটেছে। শমশের ওয়াদুদ নামে একজন লোক ছাড়া আমার পক্ষে আর কেউ নেই। লোকটি মুজিবের বড় বোনের ছেলে। এই যুবক নিউইয়র্ক থেকে এসেছে তার মামার কাছে। তার মতে মুজিব ক্ষমতালোভী এবং নিজের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা সম্পন্ন অহংকারী ব্যক্তি। তার মামা খুব মেধাসম্পন্ন নয়। বাইশ বছর বয়সে মুজিব হাইস্কুলের পড়াশুনা শেষ করেছেন। আওয়ামী লীগ

সভাপতির সচিব হিসেবে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এছাড়া আর কিছু করেননি তিনি। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে মুজিব একদিন প্রধানমন্ত্রী হবেন। ওয়াদুদের মতে, আত্মীয়স্বজনের সাথে দুর্ব্যবহারের কারণ এটা নয়। আসলে একমাত্র ওয়াদুদের মাকেই মুজিব ভয় করেন। এই দুঃখজনক আচরণের জন্য তিনি পারিবারিকভাবে প্রতিবাদ জানাবেন। সে আরো জানালো যে, আমার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা সে তার মাকে জানাবে, যাতে তিনি এ ব্যাপারে মুজিবের সাথে কথা বলেন। সে আমাকে আরো বললো যে, সরকারী দফতরে গিয়ে এ ব্যাপারে আমার প্রতিবাদ করা উচিত এবং প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলা উচিত। কারণ প্রেসিডেন্ট খাঁটি ভদ্রলোক।

মুজিব সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাবলী তার জন্যে বিপর্যয়কর। ১৯৭১ এর মার্চে পাকিস্তানীদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন পূর্বে ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টো ঢাকায় এসেছিলেন। ইয়াহিয়া খান যথাশীঘ্র ফিরে যান। কিন্তু ভূট্টো ঢাকায় রয়ে যান। তাকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রাখা হয়। তার অ্যাপার্টনমেন্ট ছিল ৯১১- ৯১৩।

ইন্টারকন্টিনেন্টালের সর্বোচ্চ তলায় তখন ভূট্টোর ভূমিকা ছিল নিরোর মতো। নগরী যখন জ্বলছিল এবং এলোপাথারি গুলীবর্ষণ চলছিল, ভূট্টো তখন মদপান করছিলেন আর হাসছিলেন। পরদিন সকাল ৭টায় তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। আমি দেখেছি, যারা একসময় পাকিস্তানীদের ভয়ে ভীত ছিল, তারা এখন মুজিবকেই ভয় করে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রচুর কথাবার্তা চলে এদেশে। কিন্তু সবসময়ই তা বলা হয় ফিসিফিসিয়ে, ভয়ের সঙ্গে। লোকজন বলাবলি করে যে, এই সংঘাতে মুজিব খুব সামান্যই হারিয়েছেন। তিনি ধনী ব্যক্তি। অত্যন্ত ধনবান। তার প্রত্যাবর্তনের পরদিন তিনি সাংবাদিকদেরকে হেলিকপ্টার দিয়েছিলেন। কেউ কি জানে কেন? যাতে তারা নিজেরা গিয়ে মুজিবের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি অবলোকন করে আসতে পারে। এখনো তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, জাতীয়তাবাদের কথা বলেন। তিনি কি তার জমিজমা, বাড়ি, বিলাসবহুল ভিলা, মার্সিডিজ গাড়ি জাতীয়করণ করবেন?

ভূট্টোর সাথে মুজিবের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৬৫ সালে, যখন তিনি ভারতের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তকে অক্ষরিত রাখার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করেন। একজন নেতা হিসেবে তার মূল্য ছিল খুবই কম। তার একমাত্র মেধা ছিল মূর্খ লোকদের উত্তেজিত করে তোলার ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন কথামালার যাদুকর ও মিথ্যের যাদুকর- কিছুদিন আগে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেছিলেন, করাচীর রাস্তা গুলো সোনা দিয়ে মোড়া। তা দিয়ে হাটলে চোখ ধাঁধিঁয়ে যায়। অর্থনীতির কিছুই বুঝতেন না তিনি। কৃষি ছিল তার কাছে রহস্যের মতো। রাজনীতি ছিল প্রস্তুতিবিহীন। কেউ কি জানে ১৯৭০ এর নির্বাচনে তিনি কেন বিজয়ী হয়েছিলেন? কারণ সব মাওবাদীরা তাকে ভোট দিয়েছিল। সাইক্লোনে মাওবাদীদের অফিস বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং তাদের নেতা ভাসানী আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জনগণকে যদি পুনরায় ভোট দিতে বলা হয়, তাহলে মুজিবের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে, যদি তিনি বন্দুকের সাহায্যে তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে নিতে না চান। সেজন্যেই তিনি মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিচ্ছেন না এবং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, রক্তপিপাসু কসাই, যে ঢাকা স্টেডিয়ামে হত্যাযজ্ঞ করেছিল, সেই আবদুল কাদের সিদ্দিকী তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা। ভারতীয়রা তাকে গ্রেফতার করেছিল; কিন্তু মুজিব তাকে মুক্ত করেন।

এখন আমরা গণতন্ত্রের কথায় আসতে পারি। একজন মানুষ কি গণতন্ত্রী হতে পারে, যদি সে বিরোধিতা সহ্য করতে না পারে? কেউ যদি তার সাথে একমত না হয়, তিনি তাকে "রাজাকার" বলেন। বিরোধিতার ফল হতে পারে ভিন্নমত পোষনকারীকে কারাগারে প্রেরণ। তার চরিত্র একজন একনায়কের, অসহায় বাঙ্গালীরা উত্তপ্ত পাত্র থেকে গনগনে অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়েছে। বাঙ্গালী রমণীদের প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি, তাদের সম্পর্কে কথা না বলা উত্তম। তিনি নারীদের পাত্তাই দেন না. . . ।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আমাকে আবার মুজিবের সাথে দেখা করতে বললেন। সব ব্যবস্থা পাকা। প্রেসিডেন্ট যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা খুব একটা সফল হয়নি। তিনি দু'জন কর্মকর্তাকে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তার নির্দেশ পালন করা

হয়। মুজিবের কাছে একটা হুংকার ছাড়া তারা আর কিছু পায়নি। তবে এবার একটা করিডোরের বদলে একটা কক্ষে অপেক্ষা করার অনুমতি পেলাম। আমি বিকেল ৪টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। একজন বয় আমার চায়ের কাপ পূর্ণ করে দিচ্ছিল এবং এভাবে আমি আঠার কাপ চা নিঃশেষ করলাম। উনিশ কাপের সময় আমি চা ফ্লোরে ছুঁড়ে ফেলে হেঁটে বেরিয়ে এলাম। আমাকে অনুসরণ করে হোটেলে এলো মুজিবের সেক্রেটারী ও ভাইস সেক্রেটারী। তারা বললো, মুজিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটায় আমার সাথে দেখা করতে চান।

পরদিন সকালে ঠিক সাতটায় আমি হাজির হলাম এবং সকাল সাড়ে নটায় মার্সিডিজ যোগে মুজিবের আগমন পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো। একটা কাথাও না বলে তিনি অফিসে প্রবেশ করলেন। আমিও অফিসে ঢুকলাম। আমার দিকে ফিরে তিনি উচ্চারণ করলেন, "গেট আউট"। আমি কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত। তিনি বললেন, "গেট ইন হিয়ার।" আমি ফিরলাম এবং তখনই তিনজন লোক পোস্টার আকৃতির একটি ছবি নিয়ে এলো দেখে তিনি বললেন, "চমৎকার।" এরপর তিনি বললেন, এই মহিলা সাংবাদিককে দেখাও। আমি 'চমৎকার' শব্দটি উচ্চারণ করলাম। এ ছিল এক মারাত্মক ভুল। তিনি বজ্রের মতো ফেটে পড়লেন। তিনি ক্ষিপ্ত। ছবিটি ফ্লোরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এটা চমৎকার নয়।" আমি কিছু না বুঝে নিঃশ্চুপ থাকলাম।

আমি তার উত্তেজনা হ্রাস করতে সক্ষম হলাম। যেহেতু আমি ভূট্টোর সাথে তার সত্যিকার সম্পর্কটা খুঁজে পেতে চাই, সেজন্য ভূট্টো সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। নামটা বলার মুহূর্তেই তিনি জ্বলে উঠলেন এবং বললেন যে, তিনি শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে চান। আমি প্রশ্ন করলাম, "বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গকে যুক্ত করার সম্ভাবনা আছে কিনা?" খানিকটা দ্বিধান্বিত হয়ে তিনি বললেন, "এ সময়ে, আমার আর কোন আগ্রহ নেই।" এই বক্তব্যে ইন্দিরা গান্ধীকেও বিস্মিত হতে হবে যে, মুজিব কোলকাতা করায়ত্ত করতে চায়। আমি বললাম, তার মানে আপনি বলতে চান, অতীতে আপনার আগ্রহ ছিল এবং ভবিষ্যতে পুনঃবিবেচনা করার সম্ভাবনা আছে।"

ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, আমি তাকে একটা ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছি। নিজের ভুল সংশোধন করার বদলে তিনি টেবিলে মুষ্টাঘাত করে বলতে শুরু করলেন যে, আমি সাংবাদিক নই বরং সরকারী মন্ত্রী। আমি তাকে প্রশ্ন করছি না দোষারোপ করছি। আমাকে এখনই বের হয়ে যেতে হবে এবং পুনরায় আমি যেন এদেশে পা না দেই।

এই পর্যায়ে আমি নিজের উপর সকল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম এবং আমার মাঝে উত্তেজনার যে স্তূপ গড়ে উঠেছিল তা বিস্ফোরিত হলো। আমি বললাম যে, তার সবকিছু মেকি, ভুয়া। তার পরণতি হবে খুবই শোচনীয়। যখন তিনি মুখ ব্যাদান করে দাঁড়ালেন আমি দৌড়ে বেরিয়ে এলাম এবং রাস্তায় প্রথম রিকশাটায় চাপলাম। হোটেলে গিয়ে বিল পরিশোধ করলাম। সুটকেসটা হাতে নিয়ে যখন বেরুতে যাচ্ছি, তখন দেখলাম মুক্তিবাহিনী নিচে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারা একথা বলতে বলতে আমার কাছে এলো যে, আমি দেশের পিতাকে অপমান করেছি এবং সেজন্য আমাকে চরম মূল্য দিতে হবে। তাদের এই গোলযোগের মধ্যে পাঁচজন অস্ট্রেলিয়ানের সাহায্যে পালাতে সক্ষম হলাম। তারা এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে প্রবেশ করছিল। এয়ারপোর্টে দু'জন ভারতীয় কর্মকর্তা আমাকে বিমানে উঠিয়ে নিলেন এবং আমি নিরাপদ হলাম। (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)।

"১৯৭২ সালে নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তিনি তখন সাড়ে সাতকোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা।

গত সপ্তাহে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হয়েছেন।

দু'টি ঘটনার মাঝখানের ক'বছরে তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে।. . . .

মুজিবের ট্রাজেডি এই যে, চার বছরেরও কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চ মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গ দুশমনে পরিণত

এন্থনী মাসকারেন হাস, সানডে টাইমস,
লন্ডন, ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫

॥ সমাপ্ত ॥

A memoir by Aminul Hoque on the independence war of 1971 and the creation of Bangladesh. Majority of the books on this subject are written by the winning side which is often blighted by distortion, deception, overemphasizing myths and lies, this book provides a rare glimpses of the story from the other side. It is a brave effort by the author and provides lots of details which is often suppressed by the government.